প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নবম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় : সমাজকর্ম **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম ঃ MSW - 13

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক - 1, 3	বাদল চন্দ্র দাস	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি
একক - 2, 5, 6, 7	অধ্যাপক অশেষ মুস্তাফি	
একক - 4	ভীষ্মপ্রতীম অধিকারী	

পাঠক্রম ঃ MSW - 14

একক - 1, 3, 4, 6, 7, 8	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি	অধ্যাপক অজিত কুমার পতি
একক - 2	শ্রী নির্মাল্য মুখার্জী	
একক - 5	শ্রী অমিতাভ খান্দাইত	

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MSW – 13 & 14

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

MSW - 13

একক 1	আইনের ধারণা, নীতি ও আইন প্রণয়ন। সমাজকল্যাণে ও সামাজিক নিরপত্তায় আইনের ভূমিকা	7-18
একক 2	ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মহিলা ও শিশু, তফশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উদ্বাস্তুদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের প্রতিবিধান	19-36
একক 3	সামাজিক আইন প্রণয়ন, সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার : লিগ্যাল এইড, পারিবারিক আদালত, জনস্বার্থ রক্ষা আইন, জাতীয় ও রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, লোক আদালত	37-48
একক 4	বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, পতি/পত্নী ও শিশুর ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, আইনগত প্রতিবিধান ও তার নানান বৈশিষ্ট্য	49-61
একক 5	মহিলা ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষার আইন	62-88
একক 6	বার্ধক্যভাতা, প্রসূতিকালীন সুবিধা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও বেকারদের সহায়তাদানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ক্ষতিপূরণ ও সুবিধাদানের বিন্যাস	89-115
একক 7	তফসিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের উপায় পর্যালোচনা	116-132

MSW - 14

একক	1	প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা	133-140
একক	2	শিশু বিকাশ ও শিশু সুরক্ষা	141-173
একক	3	বার্ধক্যের যত্ন	174-180
একক	4	নারী উন্নয়ন	181-191
একক	5	যুব কল্যাণ	192-202
একক	6	অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ	203-221
একক	7	শ্রম কল্যাণ	222-233
একক	8	কাউন্সেলিং পরিসেবা-গুরুত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল	234-243

একক ১ ❑ আইনের ধারণা, নীতি ও আইন প্রণয়ন। সমাজ-কল্যাণে ও সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের ভূমিকা

গঠন

১.১ আইনের ধারণা ও নীতিসমূহ
১.২ আইন প্রণয়ন
১.৩ সমাজকল্যাণে ও সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের ভূমিকা
১.৪ অনুশীলনী

১.১ ❑ আইনের ধারণা ও নীতিসমূহ

● **আইনের ধারণা**

সমাজে বাস করার জন্য আমাদের সবাইকে কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। এই বিধি নিষেধ বা নিয়মকানুনের উৎস হল বিভিন্ন সময় প্রবর্তিত বিভিন্ন ধরনের আইন ও দেশের সংবিধান। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হল দেশের সংবিধান। নাগরিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার জন্য সংবিধানে নানান ধরনের অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে দেশের নাগরিক হিসাবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ধরনের বৈষম্য না করার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার আইনে বলবৎযোগ্য বলে, স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র বা অন্য কেউ নাগরিকের অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আদালতে দ্বারস্থ হতে পারেন। অন্যদিকে আবার নির্দেশাত্মক নীতি না মেনে চললে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা যায় না। কারণ, নির্দেশত্মক নীতিকে আইনে বলবৎযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়নি। আইন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দেশের বিচার ব্যবস্থার মানদন্ডে বিচার্য কিছু বিধি-নিষেধ। যার সুরক্ষায় দন্ডবিধির বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্বলিত নানান ধরনের শাস্তি বা দন্ডদানের প্রতিবিধান সংযোজিত হয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত দেশের নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বা নিত্যনতুন সমস্যার মোকাবিলার জন্য বহুদিনের মানুষের দাবিকে বলবৎযোগ্য ও বিচারাধীন বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা আইন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের কথা বলা হয়ে থাকে, ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সেইসব অধিকারের ক্ষেত্রগুলো হল এইরূপ :

—অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)
—সামাজিক অধিকার (Social Rights)
—সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights)
—নাগরিক অধিকার (Civil Rights)]
—রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

সামাজিক অধিকার রক্ষার বিষয়টির সাথে অন্যান্য অধিকার সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলের অঙ্গীভূত যে কোনো অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রে উপরেই বর্তায়। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে প্রত্যেকটি মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মূলত মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এবং জীবনের গুণগত মান বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রনয়ন ও রাষ্ট্রীয় আইন মন্ত্রকের উদ্যোগে অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা (Criminal procedare code) ও ভারতীয় দন্ডবিধি (Indian Penal code)-র মতো উল্লেখযোগ্য দুইটি বিধির বিভিন্ন ধারা-উপধারায় অপরাধের বিচার, বিচার পদ্ধতি এবং অপরাধের শাস্তি বা দণ্ডবিধানের বিভিন্ন দিকগুলো খতিয়ে দেখা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এমনকি সমাজে সকলের জন্য সমান সুবিধার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৮ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৩১নং ধারা বিলুপ্ত হলেও মূল সংবিধানের সঙ্গে ৩১ক, ৩১খ ও ৩১গ নামে নতুন তিনটি ধারাযুক্ত হয়। যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন ও আইন প্রণয়নের প্রভূত সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ৩১ক ও ৩১খ ধারার সদ্ব্যবহারে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

● **আইনের নীতিসমূহ :**

দেশের আইন ব্যবস্থার রূপায়ন করা হয় মূলত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং আইন ভঙ্গাকারীকে শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সমাজকে অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। ভারতের দন্ডবিধি ও ফৌজদারী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একদিকে শাস্তি বিধানের ধরণ, অন্যদিকে অপরাধের মামলা চালানোর প্রকৃতি (Procedure) কি হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে আবার মৌলিক অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে কোনো ধরনের অনিয়ন বা রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব ঘটলে তা আদালতের কাছে বলবৎযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে নির্দেশ মূলকনীতির অবমাননার কারণে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যায় না। অর্থাৎ দেশের আইন এবং সংবিধান স্বীকৃত নানান রকমের অধিকার সুরক্ষার বিষয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে বিশেষ কিছু নীতির কথা মাথায় রেখেই তৎকালীন আইন প্রণেতাগণ দেশের নাগরিকদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থানের মতো অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা নির্দিষ্ট করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জেরিমি বেন্‌থাম আইন প্রনয়ন ও দেশের বেশির ভাগ মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে গেলে যে ধরনের নীতি মেনে চলার কথা বলেছেন তা হল নিম্নরূপ :—

১। উপযোগিতার নীতি (Principle of Utility)।
২। সহানুভূতিশীলতার নীতি/বিরোধমূলক নীতি (Sympathy/antipathy)।
৩। সংস্কারমূলক নীতি (Reformative)।
৪। ন্যায়পরায়ণতার নীতি (Morality)।

উপযুক্ত জীবন ধারণের মান বজায় রাখা, পরিবারে মা ও শিশুর অধিকার সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপরোক্ত নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিটি নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—

(১) উপযোগিতার নীতি :

যে দুটো মূল বিষয়ের উপর আইনের উপযোগিতার নীতির সার্থকতা জড়িয়ে আছে তার একটি হল সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের ফলে মানুষের কতটা ভালো হলো তা জানা এবং অন্যটি হল অনুভবের ক্ষমতা অর্জন যা মানুষের ভালো হওয়ার কারণে 'আত্মতৃপ্তির' সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের উপযোগিতার নীতি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে গৃহিত হয়েছে। কারণ, মানুষের চাহিদা বা ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে সেই চাহিদা পূরণের জন্য গৃহিত আইনগত ব্যবস্থাসমূহ। মানুষের ন্যুনতম আইনগত নিরাপত্তার চাহিদা পূরণে উপযোগিতা নীতির বিষয়টি বিবেচনা করেই আইন প্রণেতাগণ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংশোধন সাধন করে থাকেন। জেরিমি বেনথাম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপযোগিতার নীতি বিশ্লেষণ করার কথা বলেছেন। তাঁর ভাবনায় দর্শনের যেমন কিছু ভুল ধারণাগত বিষয় থাকে, উপযোগিতার নীতির মধ্যেও আইন প্রণয়নের ধারণাগত ত্রুটি থাকতে পারে। তবুও পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা আইনের উপযোগিতার নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের নানান বাধা ও অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন ধরনের আইনগত ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তার উপযোগিতার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়।

(২) সহানুভূতিশীলতা/বিরোধমূলক নীতি :

আইনের এই নীতিকে কেউ কেউ একদিকে আনন্দের অন্যদিকে বেদনার নীতি বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার কেউবা বিধি বহির্ভূত নীতি হিসাবেও বলে থাকেন। অর্থাৎ কোন একটি আইন প্রণয়নের ফলে বা সংশোধনের ফলে এক শ্রেণির মানুষ খুশী হয়ে থাকেন। তাদের প্রতি আইনের সহানুভূতি সুলভ আচরণ প্রকাশ পায়। অন্য শ্রেণির মানুষের কাছে তা বিরূপ মানসিক অবস্থার সঞ্চার করে। উদাহরণ সহ বলা যায়, পণ প্রথা (নিবারণ) আইন প্রণয়নের ফলে যেমন অসহায়, অস্বচ্ছল পরিবার পণের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ফেললেন। তাদের দারিদ্রাতা ও অসহায়তার প্রতি আইন সহানুভূতিশীল হল। অন্যদিকে যারা মোটা পণের বিনিময়ে তাদের ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেন তাদের কাছে বিরোধমূলক আচরণের প্রকাশ পেল। অন্য আরেকটি আইনগত উদ্যোগ যেমন মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য নির্যাতন (নিবারণ) আইন প্রণয়ন করে মহিলার একটি বড় অংশকে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া গেল। অর্থাৎ এই শ্রেণির মহিলাদের কাছে তা খুশীর খবর। অন্যদিকে অত্যাচারী লোকজন বা পরিবারের সদস্যা/সদস্যবৃন্দ এই ধরনের আইনগত উদ্যোগে অসন্তুষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি, কারণ এই নির্যাতন বা অত্যাচারের অপরাধে দণ্ডদানের বিধান রয়েছে। এই নীতির অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা হল আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারও ভালো বা কারও খারাপ লাগতেই পারে। তবু আইন তার নিজের পথেই চলবে। এই সহজ সরল সত্যের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দানের জন্যই আইনগত নানান উদ্যোগ গৃহিত হয়ে থাকে।

(৩) সংস্কারমূলক নীতি (Reformative Principle) :

দেশীয় ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি একদিকে যেমন— মানুষে মানুষে সদ্‌ভাব, সুসম্পর্ক ও সংহতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমন বহুদিনের চলে আসা কু-অভ্যাস বা কু-সংস্কার সমাজকে কলুষিত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আইন প্রণয়নকারীদের কাছে

সমাজ কল্যাণমূলক উদ্যোগের জন্য আইনগত সুরক্ষা বিধানের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারমূলক উদ্যোগের প্রতি সমানভাবে আইনগত সুরক্ষা বিধানের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। যে ধরনের প্রচলিত সংস্কার মানুষের সাথে মানুষের ব্যবধান গড়ে দেয়, যার ফলে এক শ্রেণির মানুষ চিরকাল সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে থেকে যায় সেই ধরনের সামাজিক চর্চা বা কুসংস্কারের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার ভাবনা চিন্তাই আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে তার স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নিষ্ঠুর অত্যাচার বা কুসংস্কারের হাত থেকে সমাজকে তথা, তৎকালীন নারী সমাজের মুক্তির জন্য ১৮২৯ খ্রিঃ সতীদাহ প্রথা (বিলোপ) আইন পাশ হল। অর্থাৎ সমাজের সংস্কারমূলক কাজকর্মের প্রতি গভীর মনোসংযোগ দেওয়া এবং সংস্কারমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা মাথায় রেখে আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করাই এই নীতির মূল বিবেচনার বিষয়, আইন প্রণয়ন করার জন্য বা প্রয়োজনীয় আইনগত বিধি নিয়মের সংশোধনের জন্য আইন প্রণেতাগণ সমাজের সংস্কারমূলক বিষয়গুলো মাথায় রেখেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সেই মর্মে এই নীতিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সামাজিক বৈষম্য, জাত-পাতের বিচার এবং উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার সংস্থান করে দিতে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করতে সংস্কারমূলক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(৪) ন্যায় পরায়ণতার নীতি :

মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সময় সময়ে দেশের উচ্চ আদলত কর্তৃক এবং সর্বোচ্চ আদাল কর্তৃক অসংখ্য বিচারের রায় ঘোষিত হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আইন প্রণেতাগণ দেশের নাগরিকদের উচ্চ-নীচ, জাত-পাতের ভেদাভেদ ভুলে তাদের মৌলিক অধিকার এবং আত্মমর্যাদার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এবং আদালতের মাধ্যমে গণতন্ত্র, মুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হবেন, যাতে আইনের চোখে সকলে সমান সেই ভাব প্রতিফলিত হয়। ন্যায় পরায়ণতার নীতি কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতা বা অধিক্ষার সুরক্ষার মধ্যেই সীমিত এমনটা ভাবনার অবকাশ নেই। ব্যক্তি তথা গোষ্ঠী বা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ তাদের সমাজবন্ধ চেতনা, পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা বিনিময়ের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদা রক্ষা এবং কোন ধরনের বৈষম্যমূলক বিচার বা পক্ষপাতমূলক বিচারের আইনগত পরিবেশ তৈরি যাতে না হয় সেদিকে সচেতন থাকার বিষয়টিও এই নীতির মূল বিবেচ্য বিষয়। নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় যা মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নকারীগণ বলবৎযোগ্য আইনগত উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। এটা বলা হয় যে কোন অপরাধের বিচার আছে। তার উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থাও আছে। ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে উপযুক্ত বিচার ও অপরাধীর সংশোধনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হবে।

উল্লিখিত কয়েকটি নীতি মাথায় রেখে দেশের আইন প্রণয়ন, সংশোধন বা বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলেও দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রের আইনকানুন বা আইনগত বিধিনিষেধের সর্বোচ্চ শিখরে ভারতীয় সংবিধানের অবস্থান। দেশের সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি (৩৬→৫১নং ধারায় বর্ণিত) প্রসঙ্গে দু-এক কথা এখানে আলোচনা করা দরকার। নির্দেশাত্মক নীতির তিনটি মূল ধারায় সাজানো যেতে পারে। যেমন—

(১) সমাজতান্ত্রিক নীতি :

এর মধ্যে যে ধরনের বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হল—

— সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত জীবন ধারণের উপায় পরিবেশন করা।
— উৎপাদনের মাধ্যম এবং সম্পদের একত্রীকরণ প্রতিরোধ করা।
— সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠুভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা।
— সমান কাজের জন্য সবাইকে সমান মজুরী প্রদান করা।
— কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা।
— শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা করা।
— বার্ধক্য, বেকারত্ব ও অসুস্থতার জন্য কাজ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া এবং সরকারি সাহায্য দান করা।
— উপযুক্ত ও মানুষের কাজের উপযোগী কর্মক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করা।
— শিশুদের বিকাশে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া।
— শিল্প ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের যোগদান।
— আইন ব্যবস্থার প্রচলন ও আইনী সহায়তার সুযোগ বিস্তার।

(২) গান্ধীবাদী নীতি :

এই নীতির মধ্যে যে ধরনের বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে তা হল—

— কৃষি ও পশুপালন এর কাজ করা।
— কুটির শিল্প স্থাপন।
— গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলন।
— দেশের সকলের জন্য জীবনের মান বৃদ্ধি, পুষ্টির মান উন্নয়ন ও জন স্বাস্থ্যের বিকাশ।
— নেশা যুক্ত পানীয় বা মাদকদ্রব্য বা ওই জাতীয় অন্য কোন দ্রব্য/পানীয় সেবন নিষিদ্ধকরণ।
— পরিবেশ সুরক্ষা মূলত গাছপালা ও বন্যপ্রাণী রক্ষার বন্দোবস্ত।

(৩) উদারনীতি :

এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উদার অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কার ও উৎপাদনশীল কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই নীতিগুলোর কিছু পরিবর্তন ঘটানো হলেও পরবর্তীকালে তা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পৃথিবীর সব দেশের মতো ভারতবর্ষেও আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় আইন প্রণেতাগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। সারা বিত্তবান, ক্ষমতাবান, যাদের অনেক আছে, তাদের কাছে ন্যায় বিচার বা আইনগত উদ্যোগের সদ্ব্যবহার যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমন অসহায়, দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কাছে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার ও আইনের সঠিক রূপায়ন সমানভাবেই প্রযোজ্য। সেই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে আইন ব্যবস্থার অন্যতম কয়েকটি নীতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ ❑ আইন প্রণয়ন

আইন প্রণয়নের ধারণা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো বলা যায় যে এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে—সমাজের প্রয়োজন বা চাহিদার কথা ভেবে আইন তৈরি, বলবৎকরণ ও প্রণয়ন করা হয়। অর্থাৎ জীবন ধারণের সূত্র ধরেই আইনের সূত্রপাত। সমাজ জীবনের নানান সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার বিষয় বিবেচনা করেই আইন প্রণয়ন করা হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূর করার জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বলা হয় সংবিধান কতৃক স্বীকৃত নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং নির্দেশাত্মক নীতির অনুসরণে বিভিন্ন সময় আইনগত যে ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার প্রত্যেকটি বিষয়ই আইন প্রণয়নের ভঙ্গা বলেই বিবেচিত।

১.৩ ❑ সমাজকল্যাণে ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে আইনের ভূমিকা

সমাজকল্যাণ সম্পর্কে বলা হয় যে, বিশেষ ধরনের পরিষেবা বা কল্যাণমূলক উদ্যোগ যা কিনা সমাজের পিছিয়ে পড়া, অসহায়, দরিদ্র, শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার এখন মানুষের মূলস্রোতে ফিরে আসার সুযোগ বাড়ায়। সাধারণত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহিত বিশেষ কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে এই শ্রেণির মানুষকে জীবন ধারনের ন্যুনতম মান থেকে উপযুক্ত যান বজায় রাখার স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করে থাকে। যেমন— গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি, দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য চাল ও গম দেওয়ার কর্মসূচি, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিষেবা প্রভৃতি।

অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, কোনো ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো ঘটনার কারণে নিজের বা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপার্জন করার শক্তির হারিয়ে যাওয়ার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে যে ধরনের নিরাপত্তা সমাজ দিয়ে থাকে। যেমন— দুর্ঘটনা বীমা।

সমাজকল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দেশের আইনকানুন ও সংবিধান। এখানে আইন ও ভারতীয় সংবিধানের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নলিখিত উপায়ে তুলে ধরা হল—

(ক) নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে :

● **নির্যাতন :** নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অত্যাচার বা নির্যাতন আইনত অপরাধ। শারীরিকভাবে যেমন মারধর করা, খেতে না দেওয়া, অস্বাভাবিক যৌন আচরণ করা আটকে রাখা ইত্যাদি। মানসিকভাবেও যেমন সন্তানের কাছে যেতে না দেওয়া, মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য শিশুকে অত্যাচার করা প্রভৃতি। এই ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(ক) ধারা অনুযায়ী জেল বা জরিমানা, উভয়ই হতে পারে। অন্যদিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখাও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ থেকে ৩৪৮ ধারা অনুযায়ী শস্তি বিধানযোগ্য অপরাধ। এই ধরনের আইনগত প্রতিবিধানের ফলে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বলবৎ করার জন্য মহিলাদের উপয অত্যাচারের প্রবণতা কমেছে।

● **শ্লীলতাহানি :** সমাজে মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য শ্লীলতা হানি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইনী প্রতিবিধান রচিত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা ও ভারতীয় দন্ডবিধির শাস্তি বিধানের মাধ্যমে মহিলাদের উপর ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা তাদের রক্ষা ও সমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

● **অপহরণ ও অবৈধবৃত্তি :** কোনো নাবালিকা, নাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলাকে লোভ দেখিয়ে বা প্রতারণা করে অসৎ উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং আটকে রাখাই হল অপহরণ। এর জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩ ও ৩৬৩ (ক) ধারায় অপরাধীর শাস্তি বিধান যোগ্য। ওই দন্ডবিধির ৩৬৪, ৩৬৬ থেকে ৩৭১ ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সাজার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অনৈতিকভাবে লোক পাবার (নিবারন) আইন-প্রনয়ন করে এই অপরাধের প্রতিবিধান ও অপরাধীর শাস্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

● **বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভরণপোষণ :** এক এক সম্প্রদায়ের মানুষের এক এক রকমের বিবাহের পদ্ধতি চালু আছে। কোনো কোনো পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হলেও আইনগত নিশ্চয়তার জন্য নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন করানো হয়ে থাকে। বিবাহ সংক্রান্ত প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে কিছু পরিবর্তন বা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। পাত্র ও পাত্রী ভিন্ন ধর্মের হলে তাদের বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪) অনুসারে বিবাহের আয়োজন করা হয়। আইনগত বৈধ্যতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভরণপোষণের সঠিক দিশা দানের জন্য হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ মুসলিম বিবাহ আইন যা সাধারণত শরিয়তী আইনে হয়ে থাকে ও খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২ প্রবর্তিত হয়। এইসব আইনে পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বয়স, জাতি, ধর্ম, বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক নানান ধরনের নিয়ম-নীতি ও আইন লঙ্ঘনকারীর সাজার ধরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। এমনকি সন্তানের দায় দায়িত্ব কার হেফাজতে থাকবে তার খুঁটিনাটি বিষয়েরও সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় উপরোক্ত আইনগুলোতে। বিবাহ বিচ্ছেদ কখন হতে পারে, তার কী কী শর্ত থাকা দরকার এবং ভরণপোষণের কি বন্দোবস্ত আছে সে সম্পর্কে আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মা ও শিশুর ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের প্রবণতা বাড়ছে। আইনগত সুরক্ষার বিষয়ে অবগত না থাকার কারণে এবং সামাজিকভাবে পশ্চাদ্পদ শ্রেণিভুক্ত হওয়ার দরুন তাদের জন্য প্রদত্ত আইনগত সুযোগ সুবিধা মহিলারা গ্রহণ করতে পারেন নি। ধীরে ধীরে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্যদের মতো মহিলাদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যেও সংঘবদ্ধ ভাব জন্মেছে। ফলে আজকাল মহিলারা দলবদ্ধভাবে তাদের জন্য গৃহিত আইনকানুন এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে যাবতীয় বঞ্চনা ও অবহেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছেন।

● **শিশুর কল্যাণে :** অন্যদিকে শিশুদের দত্তক, অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণের ও সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধান ও অন্যান্য আইনগত প্রতিকার বিষয়ে আইন প্রণেতাগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধান রচনা করেছেন। সারা দেশে শিশুশ্রম প্রথা প্রতিরোধ করার জন্য চৌদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিভিন্ন রকমের কাজে যুক্ত করার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া শিশু অপরাধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ আইন (অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচার বিষয়ক আইন ১৯৮৬) অনুসারে বিশেষ আদালতে বিচার

করার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রসঙ্গাত শিশু শ্রমিক আইন (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন)—১৯৮৬ এবং শিশুদের শ্রমবন্ধক আইন ১৯৩৩ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। উভয় ক্ষেত্রেই শিশুদের কাজে যুক্ত করার বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে। অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য আইন (বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯) অনুসারে ছেলেদের ২১ ও মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের নীচে বিবাহ হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। এমনকি এই ধরনের অবৈধভাবে কম বয়সের কিশোর-কিশোরীদের বিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্ত উভয়পক্ষের অভিভাবক সহ অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তিদের জেল, জরিমানা বা উভয় সাজাই প্রযুক্ত হতে পারে।

দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু ও মহিলাদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিবিধান বলবৎ হওয়ার ফলে দেশের একটি বড় অংশের মহিলা ও শিশুকে সমাজের স্বাভাবিক জীবন-যাপন প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর দন্ডদানের জন্য সমাজে ওই জাতীয় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমেছে।

(খ) শ্রমিক, কর্মচারীর ক্ষেত্রে :

ভারতবর্ষের মতো অর্থনৈতিক পরিকাঠমোতে সবচেয়ে বেশি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। যেখানে নিয়োগ কর্তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাই শেষ কথা বলে বিবেচিত হয়। যেমন, কৃষিকার্য, চা-বাগানে, বিড়ি বাঁধায়, পাথর ভাঙা ও নির্মাণ শিল্পে, রাস্তা তৈরির কাজে, কয়লাখনিতে কাজ, কলকারখানার কাজে, তাঁত বস্ত্রে বুননে প্রভৃতি নানান ধরনের কাজে দেশের বেশিরভাগ মানুষ যুক্ত। তাছাড়া এই ধরনের কাজে শ্রম দিতে তেমন কোন লেখাপড়ার দরকার হয় না বলে দেশের অবহেলিত, নিরক্ষর, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের একটি বড় অংশ খুব সহজে যোগ দেন। এই ধরনের শ্রমিক বা কর্মচারীদের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার হাত থেকে উদ্ধার ও ন্যায্য মজুরী আদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ন ও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি এখানে খুব সংক্ষেপে আলেকপাত করা যেতে পারে।

● **ন্যূনতম মজুরী :** সরকার দ্বারা নির্দ্ধারিত হারে মজুরী প্রদানের জন্য ১৯৪৮ সালে ন্যূনতম মজুরী আইন পাশ হয়। যে আইনের বিভিন্ন ধারায় শিশুকর্মী, কিশোর-কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক কর্মী প্রভৃতি অনুসারে পৃথক পৃথক হারে সরকার কর্তৃক স্থির করা মজুরী না দেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এমনকি স্বেচ্ছায় কেউ কম মজুরীতে যোগ দিলেও তার জন্য নির্দ্ধারিত মজুরীর পুরোটাই নিয়োগ কর্তা দিতে বাধ্য। অন্য আরও একটি আইন (সমান কাজের জন্য সমান মজুরী আইন ১৯৭৬) অনুসারে একই ধরনের কাজ বা সমান কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এর আলাদা আলাদা মজুরী দেওয়া আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও পুরুষ-নারী ভেদে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যায় না। নির্দিষ্ট কাজের বাইরে অতিরিক্ত কাজ এর জন্য নিয়োগকর্তা দ্বিগুণ হারে মজুরী দিতে বাধ্য। এর জন্য প্রতিটি ব্লক অফিসে একজন ন্যূনতম মজুরী পরিদর্শক থাকেন। যার কাছে মজুরী সংক্রান্ত যে কোন বঞ্চনা বা অবহেলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়। শ্রম-ঠিকাদারের কাজকর্মেও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ আইন অনুসারে ২০ জনের বেশি শ্রমিক

সরবরাহকারী ঠিকাদারকে সরকারি লাইসেন্স নিতে হবে। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় জল, শৌচাগার, স্নানঘর, প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপদ আচ্ছাদন যুক্ত থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ঠিকাদার দায়বদ্ধ। বাস্তবে এসবের বন্দোবস্ত সব জায়গায় সমানভাবে না থাকলেও অভিযুক্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এই ধরনের আইনগত সুযোগ সুবিধার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহুশ্রমিকের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করতে উদ্যোগ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

● **দুর্ঘটনা মোকাবিলা :** প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারী কোনো না কোনো পরিবার থেকে উঠে আসা একজন মানুষ। তার রোজগারের উপর নির্ভরশীল তার পরিবারের বয়স্ক মানুষ জন, শিশু ও অন্যান্য সদস্য থাকতে পারেন। এই ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা অঙ্গাহানির কারণে রোজগারের পথ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৯২৩ সালে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতিপূরণ আইন প্রণীত হয়। যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনা বা অসুখের কারণে মারা গেলে তার পরিবারের লোকজন যারা তার উপর নির্ভরশীল বা আত্মীয়েরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে শ্রমিক কর্মচারীদের যখন-তখন ছাটাই বা কাজ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না বলে যে প্রতিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে শ্রমজীবী মানুষের একটি বড় অংশ অনেকটা আশার আলো দেখছেন। এমনকি ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত শ্রমিক ও এই ধরনের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ যেমন ডাক্তারের সার্টিফিকেট নেওয়া, পুলিশের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট দাখিল করা, নিয়োগ কর্তার কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানানো এবং স্থানীয় জেলা শ্রম আধিকারিক বা এসিস্ট্যান্ড লেবার কমিশনারের কাছে যাবতীয় দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণের স্বপক্ষে কাগজপত্র/নথীপত্র দাখিল করার ব্যবস্থা করতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য নিয়োগকর্তা দায়ী থাক বা না থাক সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পেতে কোনো বাধা থাকে না।

● **শ্রমিক সংঘ :** শ্রমিকদের প্রতি অবিচার, শোষণ ও নানান ধরনের বঞ্চনার প্রতিবাদে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে যে কোনো সাতজন শ্রমিক বা কর্মী সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করতে পারেন। উক্ত আইনের নিয়ম অনুসারে সাত সদস্যের কর্মী ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করবেন এবং নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র সংগ্রহ করবেন। এই মর্মে উক্ত ইউনিয়নের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক মামলায় বা মালিক-শ্রমিক চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাবে না বলে ট্রেড ইউনিয়ন আইন নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আইনে শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব যেহেতু শ্রমিকদের স্বার্থে মতামত বিনিময় বা বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে মালিক-শ্রমিক বিষয়ক আলোচনা যুক্ত হয় এবং কখনও কখনও আন্দোলনের পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

● **শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা :** বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের সূত্রপাত হয়। কখনো ছুটি-ছাটা, কখনো বিভিন্ন রকমের দাবি-দাওয়া আবার কখনও ছাটাই

বা বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে এই ধরনের বিরোধ বাধে। শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ ছাড়াও কোন শ্রমিক বছরে ৩০ দিনের বেশি কাজ করলে মালিক সেই বছরে তাকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হারে বোনাস দিতে বাধ্য বলে ১৯৬৫ সালে আরও একটি বোনাস আইন নামে আইন পাশ হয়। বছরের পর বছর ধরে একটি বড় সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণির দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আইন প্রণেতাগণ উৎপাদনশীল ও প্রাথমিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৯৭২ সালে গ্র্যাচুইটি আইন অনুসারে একটানা পাঁচ বছর চাকরি করার পর বার্ধ্যক্য, অবসর বা পদত্যাগের কারণে কিংবা দুর্ঘটনার কারণে বা রোগের কারণে কোনো কর্মীর চাকরির অবসান ঘটলে নিয়োগকর্তা ওই কর্মীকে বা তার উত্তরাধিকারীকে গ্র্যাচুইটি দিতে বাধ্য থাকবে। এখানে মালিক পক্ষ গ্র্যাচুরিটি দিতে অস্বীকার করলে বা অবহেলা করলে গ্র্যাচুইটি কন্ট্রোলারের কাছে অভিযোগ জানানো যায়। অর্থাৎ যে সব কারণে শ্রমিক বা কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাধে বা কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব প্রকট হতে থাকে, দেশের শ্রমিক কল্যাণমূলক আইনগত ব্যবস্থাপনা সেইসব দাবি-দাওয়া পেশ, নিয়োগকর্তার ওই সব দাবি-দাওয়া পূরণের দায়বদ্ধতা করে দেওয়া এবং কোনো ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ অনেকটাই শ্রমিক কল্যাণমুখী বলা যায়।

(গ) তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষেত্রে :

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি দেশের সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। বলা হয় সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ। অন্যান্য নিয়মনীতির পাশাপাশি দেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সরকারের অধীন কাজ কার কাজের জন্য আবেদন করা, স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় করা, সভা-সমিতি করা দেশের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার অধিকার আছে। অস্পৃশ্যতার কারণে কাউকে কোন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে ১৯৫৫ সালে প্রবর্তিত নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন অনুসারে জেল ও জরিমানা হতে পারে। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বর্জন করা হলেও এক এক সমাজ ব্যবস্থায় এক এক রকমের বিশ্বাস বা রীতি-নীতি প্রচলিত থাকার কারণে বাস্তবে জাতি, ধম ও বর্ণগত বৈষম্য কিছু কিছু জায়গায় বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ভয়াবহ এই সামাজিক রীতি-নীতির সংস্কার ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণিভূক্ত মানুষকে যাবতীয় বঞ্চনা ও অবহেলার হাত থেকে যুক্ত করতে ১৯৮৯ সালে তফশিলি জাতি ও আদিবাসী (নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ) আইন প্রবর্তন করা হয়। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় এই আইনে প্রস্তাবিত সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য ব্লক অফিসে একজন আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়। যেখানে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভূক্ত পরিবারের লোকজনেরা তাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও নানারকম বঞ্চনার প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ/আবেদন জানাতে পারেন। এই ধরনের আইনগত নিরাপত্তা তফশিলি জাতি ও উপজাতিভূক্ত মানুষের কল্যাণ ও সার্বিক বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আইনগত প্রতিবিধান ও সকলের প্রতি সমান সুযোগ-সুবিধা দানের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের নানা ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই শ্রেণির মানুষের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রবর্তিত তফশিলি জাতি, উপজাতির জন্য সংরক্ষণ বিষয়ক ৮৬তম সংবিধান সংশোধন আইন এই অগ্রগতির ধারা ত্বরান্বিত করেছে।

(ঘ) শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে :

দেশের নাগরিক হিসাবে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার যারা, তাদেরও অন্য সকলের মতো শিক্ষালাভের, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের বা স্বাধীন পেশাচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধার সমান দাবিদার হলে তাদের জন্য বিশেষ কোন আইনী প্রতিবিধান ছিল না। ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষ (সমান সুযোগ, সমান অংশগ্রহণের অধিকার সুরক্ষা) আইন প্রবর্তনের পরে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য সাড়া লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, চাকুরী ও শিক্ষালাভের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভ্রমণকালীন বিশেষ সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অসহায় ও দুর্বলশ্রেণির ভাবনাচিন্তা অধিকাংশ প্রতিবন্ধী মানুষের মন থেকে সরে যেতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা ও মানসিক শক্তি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা ও স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ ছিল তা কাজে লাগাতে বেশিরভাগই বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠেন। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে চলার বার্তা পৌঁছে গেল। সমাজের উৎপাদনশীল মানবশক্তি হিসাবে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি ও সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। অর্থাৎ দিন পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবন্ধকতার মতো সমস্যার শিকার মানুষের জন্যও আইনগত প্রতিবিধান রচনা করা হল।

(ঙ) অসহায় ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে :

নারী ও শিশুদের পাশাপাশি অনাথ শিশু, দুর্ঘটনার শিকার সহায় সম্বলহীন মানুষ এবং বয়স্ক মানুষের একটি বড় অংশের কল্যাণে সরকারি ও বেসরকারি নানান রকমের উদ্যোগ গৃহিত হয়। যার সিংহভাগ উদ্যোগ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে। দীর্ঘ দিনের সমাজের একটি অংশের দাবীকে বিবেচনা করে দুটি বিশেষ আইন প্রবর্তিত হল। মহিলা ও শিশুদের প্রতিষ্ঠান (অনুমোদন) আইন-১৯৫৬ এবং অনাথ বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৬০ নামে এই দুটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে নানান ধরনের কল্যাণমূলক কাজের বেসরকারি উদ্যোগে বাধ্যতামূলক বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা হল। যার ফলে তাদের কাজকর্মের স্বচ্ছতা প্রশ্নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতার বাতাবরণ তৈরি হল। অন্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৯৮৬ সালে কিশোর অপরাধীর (য- ও সুরক্ষার) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। কোন অপরাধ অভিযুক্ত কিশোরদের এই আইন প্রণয়নের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একই আদালতে বিচার করা হতো। যা অন্য অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে কিশোর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ও ওই কিশোর অপরাধীর সমাজে প্রতিস্থাপনে অন্তরায় হতো। এই আইন প্রণয়নের ফলে বিশেষ য- সহকারে কিশোর অপরাধীর বিচার ও সাজার বন্দোবস্ত করা হয়। অর্থাৎ অসহায়, বৃদ্ধ, কিশোর ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যারা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের বাইরে বিরাজ করতেন তাদের বেশির ভাগকেই মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে, উল্লেখ করা যায় যে সমাজকল্যাণের ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র নিত্য নতুন আইন প্রনয়ন বা আইনগত ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। গৃহীত আইন বা আইনগত উদ্যোগ কতটা বলবৎযোগ্য হল সমাজের প্রয়োজনীয় ধ্যান ধারণার ও কুসংস্কার দূরীকরণে কতটা উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করলো কিংবা বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় কতটা বিচারের গতি ত্বরান্বিত হল তার সবদিক বিবেচনা করার উপরেই আইনের বা আইনগত প্রতিবিধানের বিস্তৃতি ঘটে থাকে।

১.৪ ❑ অনুশীলনী

১. সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলো কী কী ?
২. জেরিমি বেন্থামের মতো অনুযায়ী দেশের মানুষের কথা মাথায় রেখে কীভাবে আইন নীতি প্রণয়ন করা উচিত।
৩. 'পণ'-এর বিরুদ্ধে কীভাবে নীতি গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন হয়েছে।
৪. কিশোর অপরাধীদের সমাজে পুনঃস্থাপনের জন্য কেন ও কীভাবে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।
৫. বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষদের সাহায্যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
৬. ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৭. নারী ও শিশুদের রক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ?
৮. সমাজকল্যাণে আইনের ভূমিকা সবিস্তারে বর্ণনা করুন।
৯. সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের ভূমিকা সবিস্তারে বর্ণনা করুন।
১০. আইন প্রণয়ন করা হয় কেন এবং তার লঙ্ঘনে কী হতে পারে ?

————

একক ২ ❑ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মহিলা ও শিশু, তফশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উদ্বাস্তুদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের প্রতিবিধান

গঠন

২.১ সামাজিক ন্যায়বিচার।
২.২ মানবাধিকার
২.৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রতিবিধান
২.৪ অনুশীলনী

২.১ ❑ সামাজিক ন্যায় বিচার

সমগ্র সমাজের উপর বর্তায় যে বিচার, আপাত দৃষ্টিতে তাকেই সামাজিক ন্যায় বিচার বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরপেক্ষ বিচার ও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরপেক্ষ বিচার ও সমাজের সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্যক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে যাবতীয় সামাজিক অন্যায় ও অব্যবস্থা দূরীকরণে শৃঙ্খলা পরায়ণ ব্যবস্থা গ্রহণ।

আবার সামাজিক ন্যায়বিচারকে মানুষ কখনো কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের জন্য আন্দোলন হিসাবেও বিবেচনা করে থাকে। সাধারণ অর্থে দেখা যায় সামাজিক ন্যায় বিচার মূলত মানবাধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তিত। সামাজিক ন্যায় বিচারের সংজ্ঞায় বলা হয়। "সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক ন্যায় বিচার এমনভাবে প্রতীয়মান হয় যার মাধ্যমে মানবাধিকার স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়।" অন্যভাবে বলতে গেলে সামাজিক ন্যায় বিচার এক নতুন জগতের অনুভূতিতে কিছু করা, যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে সব মানুষের জন্য সমষ্টির সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সমানভাবে ভোগ করার ও অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশ্‌ন) ঘোষণায় সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, প্রত্যেক মানুষের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন এবং যে কোন ধরনের অভাব, ভয়-ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সামাজিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ এখানে সামাজিক ন্যায় বিচারকে মানবাধিকারের প্রেক্ষিতে বিশ্বাস করা এবং সকলের জন্য সম্পদের সু-সম বন্টনের কাজে মানবাধিকারের বিধান অনুসরণ করার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

২.২ ❑ মানবাধিকার

পৃথিবীব্যাপী মানবজীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠাও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে মানবাধিকারের বিধান সমস্ত রকমের আইনগত বাধা বা গন্ডি পেরিয়ে এমনকি ক্ষেত্রভিত্তিক গন্ডি যেমন, লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ,

জাতিগত ও দেশগত ভেদাভেদ ব্যতিরেকে সামগ্রিক অর্থে মানুষের অধিকার রক্ষার উপর ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। যেভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রে মানবাধিকার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তাতে অন্তত যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক মর্যাদা, তাদের বিশ্বজনীনতা ও বিদেশিসুলভ মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনগত বিধানের নিম্নলিখিত উপাদান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(ক) খুন, বাদ-বিচারহীন হত্যা করা, নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো অপরাধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপত্তার অধিকার।

(খ) ধর্ম, বিশ্বাস, সভা, সম্মেলন বা জমায়েত হওয়ার স্বাধীনতা বিষয়ক মুক্ত নাগরিকের অধিকার।

(গ) রাজনৈতিক অধিকার যা মানুষকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, নিজের মতামত দান, প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির অধিকার রক্ষা করে।

(ঘ) বিনা বিচারে হাজতবাসের সাজা, গোপন বিচার ও অত্যধিক সাজাদানের মতো আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিলম্বিত পরওয়ানার অধিকার।

(ঙ) সমতার অধিকার যা নাগরিকের সমান নাগরিকত্ব, আইনের দৃষ্টিতে সাম্যতা ও বৈষম্যহীনতার অধিকার রক্ষা করে।

(চ) কল্যাণমূলক অধিকার (যা অর্থনৈতিক অধিকার হিসাবেও পরিচিত) যা নাগরিকের শিক্ষা গ্রহণের, চরম দারিদ্র্যতা ও অনাহার অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রক্ষা করে।

(ছ) গোষ্ঠীর/সমষ্টির অধিকার যা তাদের গোষ্ঠীর অবলুপ্তির বিরুদ্ধে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষেত্রভিত্তিক সম্পদের পূর্ণমালিকানা রক্ষার অধিকার দান করে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিশেষ আইন চালু হয় ১৯৯৩ সালে। এই আইনের নাম হয় মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ১৯৯৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের পাশাপাশি মানবাধিকারের বিচার সংক্রান্ত মানবাধিকার আদালত স্থাপনের জন্য এই আইনে বিশেষ বিধান প্রবর্তিত হয়। এমনকি, মানবাধিকারের যে কোন ধরনের অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে সুবন্দোবস্ত দানের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এই বিশেষ আইন চালু করা হয়।

২.৩ ❑ ভারতীয় সংবিধানের প্রতিবিধান

সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মতো তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যা লঘুসম্প্রদায়, প্রতিবন্ধি ও অন্যান্য দুর্বলশ্রেণির মানুষের সমানতালে এগিয়ে চলার জন্য ভারতীয় সংবিধান সকলের প্রতি সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা রূপায়নে সামাজিক ন্যায়বিচার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজ পরিবর্তনের দূত হিসাবে সামাজিক ন্যায়বিচার সকলের জন্য সমান অধিকার রক্ষা, সম্পদের সু-সম গ্রহণীয়তা, পরিকল্পনার মাধ্যমে সকলের জন্য সমানভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফল বন্টন প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের কাজ করে থাকে।

মানুষের উপর শাসনব্যবস্থার প্রচলন কিভাবে হবে তার প্রশাসনিক কাঠামো রচনায় সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত আছে। প্রশাসনিক নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা—এই তিনটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রতিটি সাংগঠনিক

কাঠামোর ক্ষমতা সম্পর্কে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক তেমন প্রত্যেকটি কাঠামোর দায়িত্বও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান মূলত উল্লিখিত সাংগঠনিক কাঠামোর সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোর এবং প্রজা সাধারণের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের অন্যান্য সকল আইনের ঊর্ধ্বে ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। সরকার যখন যেমন আইন প্রণয়ন করে থাকে তা সাধারণত সংবিধানের বিধান মেনেই হয়ে থাকে। ভারতের জাতীয় লক্ষ্য—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতি সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমনকি, নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুসারে (সাময়িক বন্দোবস্ত) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতির ছাড় বা ব্যতিক্রমী হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে সংবিধানের (জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নির্দেশ জারি করা হয়। এছাড়াও ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে তফশিলি জাতি-উপজাতি, প্রতিবন্ধী মানুষ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, বয়স্ক মানুষ, পথশিশু, নেশাগ্রস্ত মানুষ প্রভৃতির কল্যাণের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের দায়িত্ব আরোপ করা হয়। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে যাবতীয় কল্যাণমূলক নীতি ও কর্মসূচির লক্ষ্যই হল সংশ্লিষ্ট শ্রেণি সুবিধা ভোক্তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতে তুলে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করা ও তাদের অনুপ্রাণিত করা। দুর্বল শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে—মহিলা, শিশু, সংখ্যালঘু সম্পদায়ের মানুষজন, উদ্বাস্তু ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্রেণির কল্যাণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে যেমন— মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক কর্তব্য প্রভৃতি অধ্যায়ে বিশেষ অধিকার রক্ষাও মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি দিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হল—

● **মুখবন্ধ :**

১৯৭৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

"আমরা ভারতের জনগণ, এত দ্বারা সংকল্প করছি যে ভারতকে আমরা সার্ব্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলবো এবং সকল নাগরিকের জন্য"—

— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের অধিকার সুরক্ষা।
— স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনার, মতামত দানের, বিশ্বাস, ধর্মচর্চার অধিকার সুরক্ষা।
— সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার অধিকার সুরক্ষা।
— ব্যক্তিবিশেষের আত্মমর্যাদা রক্ষা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার মাধ্যমে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া।

"আজ, ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৯, তারিখে আমরা ভারত রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠন কর পরিষদ এত দ্বারা রাষ্ট্রের সংবিধান গ্রহণ, বলবৎকরণ ও সকলের জন্য প্রবর্তন করলাম।"

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে দুটো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলা হয়েছে—

(ক) সুখবন্ধে সংবিধানের কর্তৃত্ব অর্জনের সূত্র সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।
(খ) সংবিধান যে উদ্দেশ্যপূরণ ও লক্ষ্য স্থাপনের কথা মাথায় রেখে রচনা করা হয়েছে—তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও এই মুখবন্ধে পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তার আমার স্বপ্নের ভারত সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে তার প্রতিফলন প্রকাশিত হয়েছে।..."একটি দেশ

এই ভারতবর্ষ যেখানে অতি দরিদ্র মানুষও যেন মনে করে যে এই দেশ গঠনে তাদের ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত আছে।...একটি দেশ এই ভারতবর্ষ যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় যেন প্রকৃত সংহতি স্থাপনে সুযোগ দান করে। অস্পৃশ্যতা, মাদকদ্রব্য ও নেশার উন্নত্ততার মতো সামাজিক অভিশাপ। এই ভারতে কোন স্থান পাবে না। পুরুষের মতো সমান তালে তাল মিলিয়ে মহিলারাও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।"

● **মৌলিক অধিকার :**

সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part-III) অঙ্গীভূত মৌলিক অধিকার মূলত ভারতের নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে ও সংহতিপূর্ণ জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দান করে। এই নাগরিক স্বাধীনতার বিষয়টি দেশের অন্যান্য আইনের চোখে অধিকতর সম্মানজনক বলে বিবেচিত হবে। যার সাথে স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করা, স্বাধীনভাবে মতামত দান করা, শান্তিপূর্ণ সভা-সম্মেলন করা, আইনের কাছে সকলেই সমানভাবে প্রতীয়মান হওয়া, ধর্মচর্চায় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার রক্ষায় সংবিধান প্রদত্ত উপায় অবলম্বনের অধিকার ভোগ করা, প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ভোগ করার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। এই ধরনের অধিকার লঙ্ঘনের সাজা হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিচার শালার বিধান আরোপিত হতে পারে। সংবিধানে প্রদত্ত ছয়টি মৌলিক অধিকার হল নিম্নরূপ।

—সমতার অধিকার।

—স্বাধীনতার অধিকার।

—শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অধিকার।

—স্বাধীন ধমচর্চার অধিকার।

—শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার।

—সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

সমাজের অসহায়, অনগ্রসর ও প্রান্তিক শ্রেণিক মানুষ বিশেষ করে তফশিলি জাতি। উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অনগ্রসর সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী মানুষ, বয়স্ক মানুষ, পথ শিশু ও নেশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট অধিকার সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল।

(ক) সমতার অধিকার :

সংবিধানের ১৪নং থেকে ১৮ নম্বর পর্যন্ত ধারায় সমতার অধিকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। যদিও আমাদের সংশ্লিষ্ট শ্রেণির কল্যাণের ক্ষেত্রে ১৪নং থেকে ১৭নং পর্যন্ত ধারার গুরুত্ব অপরিসীম।

● **অনুচ্ছেদ-১৪ :**

আইনের চোখে সমতা। ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের নাগরিকের সমান সুরক্ষা ও আইনের বিচারে সমতার অধিকার রাষ্ট্র কখনও অস্বীকার করতে পারবে না।

● **অনুচ্ছেদ-১৫ :**

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা ও জন্মস্থান ভেদে বৈষম্য প্রতিরোধ করার বিষয়ে উল্লিখিত আছে যে—

(১) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা, জন্মস্থানও অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করতে পারবে না।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা, জন্মস্থান বা অন্য কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন নাগরিককে—
—দোকান-বাজারে যাওয়া, রেষ্টুরেন্টে যাওয়া, হোটেলে যাওয়া বা গণ-বিনোদনে যোগ দেওয়া থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা, দায়বদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করতে পারবে না, এমনকি,
—কুয়ো, পুকুর বা স্নানের ঘাট, রাস্তা, জন সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান, সরকারি বা বেসরকারি তত্ত্বাবধানে রাখা সর্বসাধারণের জন্য কোন জায়গার ব্যবহার থেকে কোন নাগরিককে বিরত করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত করা থেকে বিরত করবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই বা ২৯নং অনুচ্ছেদের উপধারা-২ (Clause-2) অনুসারে রাষ্ট্রকে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বা তফশিলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নের কোনো প্রতিরোধ থাকবে না।

● **অনুচ্ছেদ-১৬ :**

চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অধিকার প্রসঙ্গো উল্লেখিত আছে যে—

(১) রাষ্ট্রের অধীন যে কোন সরকারি অফিসে চাকরি বা কর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমতা ও সমান সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা, জন্মস্থান, বাসস্থান প্রভৃতি ভেদে কোন নাগরিককে চাকরিতে যোগদান বা সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে অযোগ্য বা বৈষম্যের নজরে বিচার করা যাবে না।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই সংসদে বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সরকারি, স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বা কোন স্থানীয় কতৃপক্ষের অধীনে বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্য চাকরি বা নিয়োগের বন্দোবস্ত করা বা ওই রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রয়োজনে চাকরি নিয়োগের পূর্বে কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রূপায়ণে কোনো প্রকার প্রতিরোধ করবে না।

(৪) এই ধারার কোনো কিছুই অনগ্রসর শ্রেণির নাগরিকদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ বা পদের জন্য নির্দিষ্ট হারে সংরক্ষণ করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা যেখানে রাজ্যের পর্যাপ্ত সংখ্যক উপস্থিতির অভাবের কারণে উপযুক্ত বিধান অবলম্বনে বাধা থাকবে না।

(৪.ক) চাকরিতে পদোন্নতি বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্যের মতামতের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মরত ব্যক্তির অভাবের জন্য বিশেষ আইন গ্রহণে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবে না।

(৪.খ) সংরক্ষণের ব্যবস্থ যেভাবে উপধারা ৪ বা ৪(ক)-তে বলা হয়েছে, কোন বিশেষ শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদ অপূর্ণ থাকলে তা পরবর্তী বছরে বা বছরগুলিতে ওই বছরের শূন্যপদের সংখ্যার সঙ্গো বিবেচনা না করেই পূরণ করা যাবে যাতে নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য ওই বছরের সংরক্ষণের হার ৫০ শতাংশের সীমা নির্ধারণে এই অনুচ্ছেদের কোন অংশই রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই নতুন কোনো আইন চালু করতে রাষ্ট্রকে বিরত করবে না যাতে কোনো ব্যক্তি কোনো অফিসে ধর্মের কারণে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা কোনো পরিচালন সমিতির সদস্য থাকার কারণে তার নির্দিষ্ট ধর্ম পরিচয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারে।

● **অনুচ্ছেদ-১৭ :**

অস্পৃশ্যতা বিলোপ : 'অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত। যে কোনো ধরনের অস্পৃশ্যতার চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতার কারণে কোনো ধরনের অক্ষমতার চর্চা করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

অনুচ্ছেদ ১৪ নম্বরে আইনের চোখে সবাই সমান বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে দেশের সমস্ত নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যার অর্থ রাষ্ট্র কখনো কাউকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য করবে না। ২০০৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি ইলেক্ট্রিসিটি আইনে বলা হয়েছে যে সংসদ উচ্চতম কার্যালয়ের কোনো কর্মীর অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করতে বিশেষ আদালত প্রবর্তন করতে পারবে। বিশেষ আদালত মানে বিশেষ ব্যবস্থার কারণে কারও অধিকার ভঙ্গের বিষয় নয়।

অন্যদিকে, ১৫নং ধারা অনুসারে আবার জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ বা বাসস্থানের ভেদে সামাজিক সাম্যতা ও সাধারণ স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। প্রত্যেক নাগরিকের সাধারণ স্থান ব্যবহারের, পার্কে বা জাদুঘরে যাতায়াতের, স্নানের পুকুর বা ঘাট ব্যবহারের, মন্দির-মসজিদ বা গির্জায় যাতায়াতের সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্র মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বা তফশিলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোন প্রতিরোধের মুখে পড়বে না।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের বিধানের ১৬নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো নাগরিককে বৈষম্য করতে পারবে না। সকল নাগরিকের সরকারি চাকরিতে আবেদন করার অধিকারী। সংসদ রাজ্যের প্রয়োজনে যে কোন আইনগত বিধান গ্রহণ করতে পারবে। যেখানে স্থানীয় ভাষার সাবলীলতা ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। রাজ্যের কোনো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যেখানে উপযুক্ত সংখ্যক তফশিলি জাতি বা উপজাতির প্রতিনিধিত্ব থাকে না, সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদের সংরক্ষণ করতে পারবে। যাতে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসার পথ প্রশস্ত করা যায়। এমনকি বিশেষ শ্রেণির বা ধর্মের অফিস/কার্যালয়ের মালিক পক্ষ যাতে ওই শ্রেণি বা ধর্মের মানুষকে আরও বেশি করে যুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করে তার জন্য দরকার হলে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধনের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ১৭নং ধারায় বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অস্পৃশ্যতার চর্চা বা সেই কারণে কোন বৈষম্য আইনত দন্ডনীয়। ১৯৫৫ সালের অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মীয় স্থানে অস্পৃশ্যতার কারণে যেতে না দিলে বা সাধারণ কূপ-নলকূপ থেকে জল নিতে বাধা দিলে সেই অপরাধে দন্ডবিধান প্রযোজ্য হবে। ১৯৭৬ সালে এই আইন সংশোধিত হয় এবং না হয় নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার :

সংবিধানের ১৯ ('এ' থেকে 'ই' ও 'জি'), ২০, ২১, ২১(এ) এবং ২২ নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে ২১ নং ধারা ও ২১(এ) ধারার বিষয়াবলী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

● ধারা ২১ :

ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাধীনতার সুরক্ষা এই ধারায় মূল প্রতিপদ্য বিষয়। বলা হয়েছে আইনগত বিধান/প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার কোনো প্রচার বঞ্চনা করা যাবে না।

● ধারা-২১(এ) :

শিক্ষার অধিকার। কোন রাজ্য তার নিজস্ব আইনগত রীতিতে ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুকে নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে।

এই ধারার মূল উদ্দেশ্য হল কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবন সুরক্ষার বিষয়ে কোনো বঞ্চনার আগে রাজ্য প্রচলিত আইন ব্যবস্থার বিধান কঠোরভাবে মেনে চলবে। জীবনের অধিকার বলতে অর্থবহ। সম্পূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা এখানে বলা হয়েছে। অন্য কোনো অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। পশুর মতো জীবনধারণ বা কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকার অর্থে জীবন ধারণের থেকে বেশি কিছু। জীবনের মান বোঝানোর জন্য কোনো অবমানকর কিছু ব্যাখ্যা এমনকি সকলের জন্য একই মানের জীবন-যাপনের ব্যাখ্যা কোনোভাবেই করা হয়নি।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এখানে শারীরিকভাবে কোন ব্যক্তির দ্বারা বাধা, বলপ্রয়োগ বা ওই জাতীয় অন্য কোন প্রতিরোধ থেকে সুরক্ষার অধিকার বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিকার যা ১৯নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাতিরেকে নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা যায় না। সংবিধানের বিভিন্ন বিভিন্ন ধারায় বঞ্চনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আইনানুগ প্রক্রিয়া বলতে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রচলিত আইনগত বিধানকে বোঝানো হয়েছে। ১৯নং ধারায় উল্লিখিত অধিকারকে মৌলিক অধিকারের হৃদযন্ত্র হিসাবে সংশ্লিষ্ট আদালতে (Appex court)-র দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। উন্নি কৃষ্ণণের কেসে সংবিধানের এই ২১নং ধারাকে মৌলিক অধিকারের হৃদযন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করার জন্য দেখা গেছে যে শিক্ষা সহযোগে জীবন এবং জীবনের অধিকার থেকে প্রবাহিত শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন (আইন ২০০২) আইনে এই ধারার সংযোজন করা হয়েছে।

(গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

সংবিধানের ২৩ ও ২৪নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের প্রতিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

● ধারা-২৩ লোকপাচার ও কৃতদাস ব্যবস্থার নিবারণ :

বলা হয়েছে যে লোকপাচার, ভিক্ষাবৃত্তি বা ক্রীতদাস ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোন ধরনের অপরাধ এই ক্ষেত্রে আইনত দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত।

জনস্বার্থে কোনো রকম বাধ্যতামূলক সেবাপ্রদানের ব্যবস্থা করতে এই ধারায় রাষ্ট্র কোনো বাধা পাবে না। এমনকি এই ধরনের বন্দোবস্ত করতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি বা অন্য কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন প্রকার বৈষম্য করতে পারবে না।

● ধারা-২৪ কারখানা প্রভৃতিতে শিশুদের নিয়োগ নিবারণ :

১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানায়, খনিতে বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে ২৩ ও ২৪নং ধারায় দুটো বিশেষ ব্যবস্থা শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার যেমন ভিক্ষাবৃত্তি ও লোকপাচার নিবারণ এবং ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভিক্ষুকদের কোন প্রকার দান বা প্রদান যেমন উচ্চশ্রেণির বা ধনীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঠিক তেমন আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ বলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আবার ক্রীতদাসের ব্যবসা বা গণিকাবৃত্তির কারণে লোকপাচার ও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে ১৪ বছরের নীচে শিশুদের কোন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োগ নিবারণ করে শিশুদের জাতীয় ভবিষ্যৎ হিসাবে গড়ে তোলার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। তারা আনন্দে দিনযাপন করবে, শিক্ষা লাভ করবে এবং দেশের সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠবে। বলা হয়েছে যে শিশুশ্রম ভারতীয় সংবিধানের মূলভাবনার বা প্রতিবিধানের সামগ্রিক লঙ্ঘন ঘটায়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক সেবাদানের কাজে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই সেনাবাহিনীর কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে।

ভারতীয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দেশের নাগরিককে যে কোন ধরনের শোষণ/নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ প্রভৃতি ভেদে কোন বৈষম্য এ ক্ষেত্রে করা যাবে না।

(ঘ) স্বাধীন ধর্মচর্চার অধিকার :

সংবিধানের ২৫নং থেকে ২৮নং ধারায় ধর্মচর্চার অধিকার সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

● ধারা-২৫ :

ধর্মীয় বিবেক-বুদ্ধি, স্বাধীন পেশা, ধর্মপ্রচার বা চর্চায় স্বাধীনতা—

— সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষা নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই প্রতিবিধানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিবেকবুদ্ধির আদান-প্রদান, ধর্মচর্চার পেশায় প্রবেশ, ধর্মীয় প্রচার ও চর্চায় সমান স্বাধীনতার অধিকারী।

— এই ধারায় রাষ্ট্রকে প্রচলিত আইন কার্যকর করতে নতুন কোন আইন প্রবর্তন করতে কোন প্রকার বিরত করবে না। যথা—

● ধর্মচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর্থিক সংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধ আরোপ।

● হিন্দুধর্মের প্রতিটি শ্রেণি বা গোষ্ঠীর কাছে সমাজকল্যাণ ও সংস্কার বা সাধারণের বলে বিরোচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দরজা সকলের জন্য উন্মোচন করা।

ব্যাখ্যা-১ : কৃপাণ পরিধান বা বহন শিখ ধর্মের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা-২ : উপধারা (বি) ধারা (২) [Sub clause (b) o clause (2)]

হিন্দু প্রসঙ্গো বলা হয়েছে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবম্বী মানুষজনের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং সেইমতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গঠন হবে।

● ধারা-২৬ :

ধর্মীয় বিষয়ে ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা—সাধারণ শৃঙ্খলার স্বার্থে, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের খাতিরে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ বা যে কোন ধর্মের বিশেষ কোন শ্রেণির—

— ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও দেখাশোনার অধিকার থাকবে।
— ধর্মের যাবতীয় বিষয়ে নিজস্বভাবেই পরিচালন করার অধিকার থাকবে।
— স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের অধিগ্রহণ বা মালিকানা থাকবে।
— আইনানুসারে ওই সব স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির পরিচালন সংক্রান্ত অধিকার থাকবে।

● ধারা-২৭ :

কোনো নির্দিষ্ট ধর্মপ্রবর্তনের জন্য প্রদত্ত কর থেকে রেহাই—এই ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের জন্য বা আনুষঙ্গিক কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য কোনো প্রকার কর প্রদানে বাধ্য করা যাবে না যদি না উপযুক্ত খরচ প্রদানে বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে থাকে।

● ধারা-২৮ :

বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় উপদেশ বা ধর্মচর্চায় অংশগ্রহণে স্বাধীনতা—

(১) রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের ধর্মীয় উপদেশ/আদেশ প্রচার করা যাবে না।

(২) উপধারা (১)-এ রাজ্য সরকার কোন বিশেষ ট্রাস্ট বা সংস্থার অধীনে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে নির্দিষ্ট ধর্মের আদেশ/উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকবে, তা থেকে বিরত থাকার কোনো বিধান প্রয়োগ করবে না।

(৩) রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে বা সরকারের স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি কোনো ধরনের ধর্ম চর্চায়, বা কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বা বিদ্যালয় চত্বরে যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দান বা আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যদি না সে নাবালক হয় বা তাতে অভিভাবকের অনুমতি থাকে।

স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকারে ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮নং ধারায় সকলের জন্য সমান স্বাধীনতার বিধান প্রবর্তন করেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণের প্রতি মর্যাদা রক্ষাই এই বিধানের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের সমস্ত ধর্মের মানুষের সমানভাবে ধর্মচর্চার অধিকার আছে যেখানে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে অন্যের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতে পারবে না।

প্রত্যেক নাগরিক তাদের ইচ্ছামতো ধর্মোপদেশ দান, ধর্মচর্চা বা প্রচারের জন্য স্বাধীনতার অধিকারী। কেউ অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মচর্চায় কোন প্রকার আঘাত হানতে পারে না। জনস্বার্থে, একথা নির্দিষ্ট যে 'কিরপান' পারিধান বা বহন শিখধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য নির্দিষ্ট।

ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের উদ্যোগে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। যেখানে ধর্ম ছাড়াও অন্য বিষয়ে চর্চার উদ্যোগে নেওয়া যাবে। সরকার দ্বারা প্রবর্তিত আইনানুসারে ওই সব কাজ পরিচালিত হবে। সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। সরকার পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ধর্ম বিরোধী শিক্ষাদানের কাজ করতে পারবে না।

(ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার :

সংবিধানের ২৯নং ও ৩০নং ধারায় নাগরিকের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার রক্ষার বিষয়ে উপযুক্ত বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

● ধারা-২৯ :

সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষা—

(১) ভারত ভূ-খন্ডে বসবাসকারী যে কোন অংশের নাগরিকের যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও হস্ত দলিলাদির ভিন্নতা সত্ত্বেও তা ধরে রাখা বা সেই ভিন্ন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার আছে।

(২) রাজ্য সরকারের অনুদানে বা অর্থানুকূল্যে চলা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো নাগরিককে জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ বা অন্য কোনো অজুহাতে ভর্তি হওয়ার বাঁধা থাকবে না।

● ধারা-৩০ :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার—

(১) সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের নিজেদের পচ্ছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকারী।

(১ক) ১নং উপধারায় বর্ণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির পচ্ছন্দমতো স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য সরকার নিশ্চিত হবে এই মর্মে যে উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লিখিত বা প্রদত্ত মূল কোনো ভাবে প্রত্যাভূত আইনের বিধান লঙ্ঘন করেনি বা কোনো বিধানের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়নি।

(২) কোনো ধর্ম বা ভাষার প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান দেওয়ার সময় রাজ্য সরকর কোন ধরনের বৈষম্য পোষণ করতে পারবে না।

ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী, বহুধর্মবলম্বী ও বহুসংস্কৃতির মানুষের দেশ। সেই বিচারে সংবিধানের ২৯ ও ৩০নং ধারা অন্যান্য সকলের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষা করেছে। যে কোনো সম্প্রদায় যার নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি আছে তার নিজস্ব অধিকার সুরক্ষায় উপযুক্ত বিধান সংবিধানে প্রবর্তিত হয়েছে।

রাজ সরকারি অনুদান বা অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিকের ভর্তির বিষয়ে কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ধর্মীয় বা ভাষাগত সম্প্রদায় চাইলে তাদের

নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবেন। তা করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবেন। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান প্রদানের সময় রাজ্যসরকার সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধীন কিনা তার ভিত্তিতে কোনো প্রচার বৈষম্য করতে পারবে না। এক্ষেত্রে দেখা দরকার যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় প্রশাসনিক অধিকার অপ্রশাসনিকভাবে ব্যবহৃত না হয়। ১৯৮০ সালের একটি কেসের প্রসঙ্গো সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে কার্যকরী ও উৎকৃষ্টমানের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি শিক্ষকদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীদের কাজের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য রায়দানে (৩১শে অক্টোবর ২০০২ সালের কেসের) সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন পেশাগত বিষয়ে রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সাধারণ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখনকি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের মেধা যাচাই-এর বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারবে না।

(চ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার :

ভারতীয় সংবিধানের ৩২নং ধারায় যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ভারতের সকল নাগরিককে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে অনুমোদন দিয়েছে। সংবিধানে যে প্রতিবিধানের কথা বলা হয়েছে তা হল নিম্নরূপ—

● ৩২নং ধারা :

এই অংশে প্রত্যাভূত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার জারি—

(১) উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার জারি করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বলা যেতে পারে।

(২) এই অংশে প্রত্যাভূত কোনো অধিকার না রক্ষার ব্যাপার সুপ্রিমকোর্ট নিম্ন আদালতের হুকুম জারি করতে পারে, নিম্ন আদালতে বিচারিত মকদ্দমার নথিপত্র পাঠানোর জন্য নির্দেশ জারি করতে পারে বা বন্দীকে সরাসরি আদালতে হাজির করে তার বন্দিত্বের কারণ দেখানোর নির্দেশ জারি করতে পারে বা ওই জাতীয় যে কোনো উপযুক্ত নির্দেশ বা হুকুম জারি করতে পারে।

(৩) উল্লিখিত উপধারা (১) এবং (২) অনুসারে সুপ্রিমকোর্টকে প্রদত্ত ক্ষমতার কোন পক্ষপাতমূলক বিবেচনা না করেই সংসদ আইন বলে অন্য কোনো আদালতকে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতায় বিবেচনার জন্য ক্ষমতায়ন করতে পারে।

(৪) সংবিধান অন্য কোনো বিধান বলবৎ না করলে, এই ধারায় প্রবর্তিত অধিকারকে সামরিকভাবে স্থগিত করা যাবে না।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ও সদ্য প্রবর্তিত জনস্বার্থ রক্ষামূলক বিধান প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে বা তার সহ-নাগরিককে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার দিয়েছে। যে কোনো নাগরিক তার বিরুক্ষে কোনো ধরনের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন হলে সরাসরি উপযুক্ত বিধানের জন্য আদালতে যেতে পারেন। এখানে উক্তব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের জন্য আদালত প্রহরীর ভূমিকা পালন করে থাকে। কখনও

কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে সরকার অবিচার করে থাকলে বা বেআইনীভাবে কোন সাজা দিয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিকার চেয়ে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন এবং সরকারের অবৈধ শাস্তি বা অবিচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংবিধানের প্রতিধানমূলক অধিকারের বলে যে কোন ব্যক্তি তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোর্টে যেতে ও উপযুক্ত বিচার পাওয়ার অধিকারী। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, হাজত বাসের দন্ড ঘোষণার পরেও তা কতটা আইনসঙ্গাত বিচার হল কিনা সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদালতের কাজে জানতে চাইতে পারেন। তাতে যদি দেখা যায় যে, আদালতের দন্ড বিধান আইনসঙ্গাত নয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুক্তি পেতে পারেন। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক প্রতিবিধান বা নাগরিককে সুরক্ষাদানের জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার নানান উপায় আছে। এক্ষেত্রে উচ্চতম আদালত নিম্ন আদালতের উপর হুকুম জারি করা, নিম্ন আদালতে বিচার হওয়া মকদ্দমার নথিপত্র পাঠানো জন্য উচ্চতর আদালতের আজ্ঞালেখ বা বন্দীকে সরাসরি আদালতে হাজির করে তার বন্দিত্বের কারণ দেখানোর নির্দেশ দেওয়া প্রভৃতি করতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য, মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদা রক্ষার বিষয় বিবেচনা করেই সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রবর্তন করা হয়। সমাজের অগ্রগতি বিধানে সংবিধানগতভাবে সেই সব বিষয়ে নিরপত্তা দেওয়া হয়েছে। অতীতের নাগরিক জীবনে নানান ধরনের অসাম্যচর্চার নিবারণ ঘটিয়ে সমান অধিকারের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মৌলিক অধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র সুরক্ষিত হয়েছে। বিশেষকরে অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে এই বিধান বিশেষ কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি জাতি, ধর্ম, বর্ণ শ্রেণি ও লিঙ্গাভেদে বৈষম্য, লোকপাচারের বিলোপ ও ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ঘটাতে সংবিধানের মৌলিক অধিকার প্রবর্তন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা বা প্রথাগত নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ভাষাচর্চার ও তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ও প্রশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

● রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি :

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে (part-IV) রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে একটি নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদত্ত হয়েছে। সরকার যে কোনো আইন প্রনয়নের সময় বা আইনগত বিধান প্রণয়নের সময় তা মনে রাখবে। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশমূলক নীতি প্রকৃত অর্থেই অবিচার যোগ্য। আয়ারল্যান্ডের সংবিধান অনুসারে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিকে—গান্ধীবাদী, অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক, আইন ও বিচার সংক্রান্ত, পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষামূলক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণে ব্রতী হবে।

● ধারা-৩৮ :

জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করবে—

(১) সামাজিক শৃঙ্খলা সুরক্ষা ও যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে নিরাপত্তাদানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে ন্যায় বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করবে।

(২) সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জন্য বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণে ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে মর্যাদার অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা করবে।

● ধারা-৩৯ :

কর্মপন্থা নির্ধারণের কিছুনীতি মেনে চলা—নিম্নলিখিত বিষয় নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সরকার নির্দেশ দান করবে।

(ক) পর্যাপ্ত জীবন ধারনের উপায় অবলম্বনে পুরুষ ও মহিলা, সকল নাগরিকের সমান অধিকার।

(খ) সর্বসাধারণের ভালোর জন্য সমষ্টিকে বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ উপযুক্তভাবে বন্টন করা।

(গ) বিভিন্ন উৎপাদন সামগ্রী ও উৎপাদন মাধ্যমের উপর তার প্রভাব কেন্দ্রীভূত নয় এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা।

(ঘ) পুরুষ ও মহিলাদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরী প্রদান করা।

(ঙ) কমবয়সীদের শ্রমিক, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার অপচয় হয়নি বা তাদের স্বাস্থ্য ও বয়সের প্রেক্ষিতে ক্ষতিকর কোনো কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয়নি তা নিশ্চিত করা।

(চ) শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ ও সহযোগিতা করা হয়েছে এবং তারা কোনো ধরনের শোষণ বা নীতিভ্রষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তা দেখা।

● ধারা-৩৯(এ) :

সমান বিচার ও নিখরচায় আইনী সহায়তা—সরকার আইনগত ব্যবস্থা প্রচলনে সকলের জন্য সমান সুযোগ দান, বিনা খরচে আইনি সহায়তা বা অন্য কোন ভাবে সমান সুযোগ ও বিচারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে বা অন্যকোন প্রতিবন্ধকতার কারণে কেউ বঞ্চিত হয়নি সে দিকে নিশ্চয়তা দান করা।

● ধারা-৪১ :

কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য দান : বেকার সমস্যা, বার্ধক্য, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধকতা বা অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত অভাবের মোকাবিলার ক্ষৈত্রে অর্থনৈতিক সামর্থ্য

ও উন্নয়নের বিষয় মাথায় রেখে সকলের জন্য কাজের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার ও প্রয়োজনে সরকারি সহায়তা দানের জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

● **ধারা-৪২ :**

উপযুক্ত মানবীয় কাজের পরিবেশ ও প্রসূতি কালীন পরিত্রান : সরকার নাগরিকের জন্য উপযুক্ত মানবীয় কাজের পরিবেশ ও প্রসূতিকালীন পরিত্রাণের বিষয়ে সুরক্ষার বিধান করবে।

● **ধারা-৪৪ :**

নাগরিকের জন্য সার্বজনীন নাগরিক বিধি : ভারত ভূ-খন্ডের সর্বত্র সকলের জন্য সার্বজনীন নাগরিক বিধি জারি করার উদ্যোগ নেবে সরকার।

● **ধারা-৪৫ :**

সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান : সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে সরকার চোদ্দ বছর বয়সের নীচে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগ নেবে।

● **ধারা-৪৬ :**

জনস্বাস্থ্য, জীবন ধারনের মান ও পুষ্টির মান উন্নয়নের কর্তব্য : সরকার বিশেষ য-সহকারে জনগণের জীবন ধারনের মান, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের বিষয়ক অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করবে এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজন ব্যতীত মদ্যপান বা নেশা গ্রহণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

● **ধারা-৫১ :**

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান : সরকার উদ্যোগ নেবে যাতে

— আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।
— অন্যান্য দেশের সাথে উপযুক্ত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষা করবে।
— একে অপরের সংঘটিত জনগণের জন্য প্রবর্তিত আন্তরিক আইন ও সম্পদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।
— আন্তর্জাতিক বিরোধ নিবারণের জন্য পারস্পরিক নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি প্রশংসনীয় হবে।

● **সামাজিক ন্যায় বিচার :**

১৪ বছর বয়স অবধি সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা ভারতীয় সংবিধানে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে ২০০২ সালের ৮৬তম সংবিধান সংশোধন আইনে ২১-এর ক ধারা (21-A) সংযোজিত হয়েছে যেখানে ৬-১৪ বছর বয়সী সব শিশুর শিক্ষালাভের বিষয়টি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হবে বলে প্রবর্তিত হয়েছে।

রাজ্য ও জাতীয় সরকার দেশের দুর্বল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নানান ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ন করছে। যেমন তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য হস্টেল-এর সুবিধা। ১৯৯০-৯১ সালকে সামাজিক ন্যায়বিচার বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে বি. আর. আম্বেদকরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার বিনা খরচে পড়ার বই দিয়ে থাকে। ২০০২-২০০৩ সালে এইখাতে সরকার ৪.৭৭ কোটি টাকা খরচ করেছে। তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিভূক্ত সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করার জন্য নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় যা ওই জাতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধানের কথা বলেছে। ১৯৭১ সালে প্রবর্তিত ২৫তম সংবিধান সংশোধন আইনে ৩১-গ (31-C) ধারা সংযোজিত হয়। যা কিনা রাষ্ট্রে নির্দেশমূলক নীতির মান উন্নয়নের সুযোগ দিয়েছে।

সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির প্রবর্তনের ফলে নাগরিকের জীবন স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ও অর্থবহ হিসাবে অতিবাহিত করার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদি সরকার কোন কারণে তা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে নাগরিকের অধিকার আছে ভোটদানের মাধ্যমে সেই সরকারকে পরাস্ত করে নতুন সরকার গঠনে উদ্যোগী হওয়ার। এমনকি কোন সরকার তা অমান্য করলে তার জন্য কোন বিধান জারি করা যাবে না কারণ এই নীতি কেবল নির্দেশিকামাত্র, আইন নয় এবং সেই কারণে এই অপরাধ বিচার্য নয়। অর্থাৎ কোন সরকার নির্দেশমূলক নীতির প্রবর্তনে অক্ষম হলে তার বিরুদ্ধে দেশের কোন নাগরিক আদালতে কোন মামলা রুজু করতে পারবে না। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি বিশ্বের নানা প্রান্তে নাগরিকের উপর সংঘটিত অমানবিক অত্যাচারের বিষয়ে সচেতন করার প্রয়াস। দেশের নীতি নির্ধারক ও নিয়ামক সে কথা মাথায় রেখে নীতি স্থির করবেন। সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়ে থাকে যে নির্দেশমূলক নীতি বৃহত্তর সমাজ গঠনের স্বার্থে প্রবর্তিত অন্যদিকে এই নির্দেশমূলক নীতির সুবাদে আদালত মামলার নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবে।

● **মৌলিক কর্তব্য :**

ধারা ৫১(এ) : ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে নিম্নরূপ :

— দেশের সংবিধান মেনে চলবেন এবং এর আদর্শ গঠনতন্ত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি পূর্ণসম্মান প্রদর্শন করবেন।

— দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উৎস্বর্গীকৃত মহান আদর্শ পালন ও অনুসরণ করে চলবেন।

— দেশের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা ও সুরক্ষা করা।

— দরকার মতো জাতীয় সেবায় ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্রতী হবেন।

— ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ও সংহতি রক্ষায় যুক্ত হবেন। মহিলাদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও কোন রকম সম্মান হানির প্রতিবাদ করা।

— সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষা করা।

— প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন— বনাঞ্চল, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা।

— বিজ্ঞান সম্মত সহিষ্নুতা, মানবিকতা, এবং সংস্কার ও অনুসন্ধানমূলক বিষয়ের উন্নয়ন ঘটানো।

— সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষা ও হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিরোধকরা।

— ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজের উৎকর্ষতা মাধনে ও দেশের মান উন্নতকরণে উদ্যোগী হওয়া।

ভারতবর্ষ বহু বর্ণের, বহুভাষা-ভাষি, বহু ধর্মের ও বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত একটি দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজন তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সৌভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলের সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যুগ যুগ ধরে দেশের মহিলাদের খুব বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় না। সতীদাহ প্রথা, পণপ্রথা কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো নানান কু-অভ্যাসের ফলে তাদের মর্যাদা ধীরে ধীরে নিম্নগামী। আমাদের সকলের এই কু-অভ্যাসের প্রতিরোধ বিধানে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

যাইহোক, মৌলিক কর্তব্যসমূহ কোন বিচার ব্যবস্থায় বিবেচ্য নয়। কোন ব্যক্তি তার মৌলিক কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করতে না পারার জন্য তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এই ধরনের বিষয় নীতিগত দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক নাগরিক তা পূরণ করতে সচেষ্ট্য হবেন সেই প্রত্যাশা করা হয়। যা সাধারণত আচরণ বিধি হিসাবেও সফল নাগরিকের অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে সংযোজনের ফলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবিধানে সংহতির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মৌলিক অধিকার বা অন্যকোন সাংবিধানিক অধিকার তার একটি অংশ বলে স্বীকৃত। মৌলিক কর্তব্য যখন সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। তখন তা সংবিধানের শিক্ষাদানমূলক ভূমিকার অঙ্গ হয়। সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের আইনগত মর্যাদা আছে। যখন আইন প্রণেতাগণ আইন প্রণয়ন করেন বা সংসদে আইনগত বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সেই আইনের সঙ্গো মৌলিক অধিকারের কোন দ্বন্দ্ব যা নিস্পত্তি করার অযোগ্য, তেমন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক কর্তব্যকে বাতিল করা যাবে না। মৌলিক অধিকারগুলোর সাথে মৌলিক কর্তব্যের সামঞ্জস্য স্থাপন খুবই প্রয়োজন।

● **বহুবিধ :**

(১) পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান :

১৯৯১ সালের (৭২তম সংবিধান সংশোধন) বিল এর সঙ্গো যুক্ত উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কিত বিবরণী যা ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইন হিসাবে প্রবর্তিত হয় তাতে বলা হয় যে "বহুদিন ধরে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকলেও তা কখনো উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ জনগণের প্রতিষ্ঠান হতে পারেনি। অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি নিয়মিত নির্বাচন না হওয়া, বহুদিন ধরে চাপা পড়ে থাকা, তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের মতো দুর্বল শ্রেণির উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকা, অপর্যাপ্ত ক্ষমতার হস্তান্তর, আর্থিক অস্বচ্ছলতার মতো কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।" সেই কারণে সংবিধানের ২৪৩(ডি) ধারায় তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ করা হয়।

ধারা-২৪৩(ডি) :

(১) এই ধারায় বলা যে তফশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত আসন সংরক্ষণ করা থাকবে। সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোট আসনের একটি অংশ যেখানে তফশিলি জাতি বা তফশিলি উপজাতি ভুক্ত মানুষের অবস্থান বর্তমান সেইখানে প্রত্যেক সংসদে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের জন্য আসন বন্টনের ব্যবস্থা থাকবে।

(২) মোট আসনের $^১/_৩$ অংশ তফশিলি জাতি বা তফশিলি উপজাতি ভূক্ত মহিলাদের যেখানে যেমন পরিস্থিতি থাকবে তার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ করা থাকবে।

(৩) তফশিলি জাতি বা উপজাতিভূক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা সহ প্রত্যেক নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোট আসনের $^১/_৩$ অংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এবং তা প্রত্যেক সংসদে ধুরিয়ে ফিরিয়ে বন্টন করা হবে।

(৪) গ্রামস্তরে বা অন্য কোন পঞ্চায়েত স্তরে সভাপতি/প্রধান চেয়ারের স্থান তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য এমনভাবে সংরক্ষিত থাকবে যাতে আইনানুসারে প্রদত্ত বিধান কার্যকর হয়। যেমন—

বিধান আছে যে, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতের অন্য যে কোন স্তরে প্রধান/মুখ্য চেয়ারের স্থানাভিসিক্ত হওয়ার জন্য এমনভাবে সংরক্ষণ করা হবে যাতে সেই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সামঞ্জস্য বজায় থাকে ও তাদের উপযুক্ত সংখ্যক মুখ্য চেয়ারে আসীন হওয়ার সুযোগ প্রদত্ত হয়।

আরও বিধান আছে যে, গ্রামস্তরে বা পঞ্চায়েতের যে কোনো কার্যালয়ের মুখ্য চেয়ারে ন্যূনতম $^১/_৩$ অংশের আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এবং এই মুখ্য চেয়ারে $^১/_৩$ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনটি বিভিন্ন অফিস আবর্তনাকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রযোজ্য হবে।

(৫) উপধারা (১) ও (২)-এর সংরক্ষণ বিদান এবং অফিসের মুখ্য চেয়ারে মহিলাদের জন্য $^১/_৩$ অংশের আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৪নং ধারায় বর্ণিত সময় শেষে ওই মূল্য চেয়ারে আসীন ব্যক্তির মেয়াদ সমাপ্ত বলে পরিগণিত হবে।

(৬) এই অংশের কোন কিছুই কোন পঞ্চায়েতে বা পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে মুখ্য চেয়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের জন্য কোনো বিধান বা আইন প্রণয়নে সরকারকে বিরত করবে না।

● **বহুবিধ :**

(২) শহরে স্থানীয় শাসিত প্রতিষ্ঠান :

১৯৯১ সালের (সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন) বিলের সঙ্গে সংযুক্ত উদ্দেশ্য ও কারণ এর প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তন করা হয়। বলা হয়—বহুরাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে দুর্বল ও আকর্ষকর করা হয়ে পড়েছে। যার মূল কারণ হিসাবে "নিয়মিত নির্বাচন না হওয়া, বহুদিনের অবদমন, এবং সঠিকভাবে ক্ষমতার ও কাজের বিকেন্দ্রীকরণ না করার বিষয়কে দেখানো হয়েছে। যার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী ও সক্রিয় গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের স্তরে পৌঁছোতে পারে নি।

সংবিধানের ২৪৩(টি) ধারায় স্থানীয় শহরে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

ধারা ২৪৩(টি) :

(১) এখানে বলা হয় যে কোন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ক্ষেত্রে যে এলাকায় যেমন তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতির লোকসংখ্যা থাকবে, সেই এলাকায় ওই জনগোষ্ঠীর

অবস্থানের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির জন্য উপযুক্ত সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি ও $^{১}/_{৩}$ অংশ আসন নির্দিষ্ট থাকবে।

(৩) (তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিভূক্ত সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের মোট আসনের $^{১}/_{৩}$ অংশ আসন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং আবর্তনের মাধ্যমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান চেয়ারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি আইন অনুসারে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হারে সংরক্ষণ প্রবর্তিত হবে।

(৫) উপধারা (১) ও (২) অনুসারে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এবং উপধারা (৪) অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান চেয়ারের জন্য সংরক্ষণের মেয়াদের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৩৪নং ধারায় ঘোষিত হবে।

(৬) এই বিধানে আইন প্রনেতাগণকে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান চেয়ার-এর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সংক্রান্ত সে কোন আইন প্রণয়নে বা সংশোধনে এই বিধান কোনোরূপ প্রতিবন্ধক হবে না। এছাড়া সংরক্ষণের অন্যান্য অনেক বিধান নিম্নলিখিত ধারায় ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে।

(ক) ৩৩০নং ধারায় লোকসভায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(খ) ৩৩২নং ধারায় রাজ্যসভায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(গ) ৩৩৪নং ধারায় ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে ব্যাক্তির জন্য সংরক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্ত বা প্রতিনিধিত্ব খারিজ।

২.৪ ❑ অনুশীলনী

১। মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার রক্ষায় ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির অধিকার সুরক্ষায় ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। সামাজিক ন্যায় বিচার ও মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক রাষ্ট্রের নীতির ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

একক ৩ ❑ সামাজিক আইন প্রণয়ন, সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার : লিগ্যাল এইড্, পারিবারিক আদালত, জনস্বার্থ রক্ষা আইন, জাতীয় ও রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, লোক আদালত

গঠন

৩.১ সামাজিক আইন প্রণয়ন সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার

৩.২ লিগ্যাল এইড্

৩.৩ পারিবারিক আদালত

৩.৪ জনস্বার্থ রক্ষা আইন

৩.৫ জাতীয় ও রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ

৩.৬ লোক আদালত

৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩.৮ অনুশীলনী

৩.১ ❑ সামাজিক আইন প্রণয়ন, সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার

সাধারণ অর্থে আইন প্রণয়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নিত্যনতুন আইন প্রবর্তন, বলবৎকরণ এবং সমাজের নানান ধরনের অসাম্য দূরীকরণে আইনের সফল বাস্তবায়ন ঘটে থাকে। সমাজবন্ধ মানুষের ইচ্ছা বা বিচার সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা যা কিনা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের ধারণাকে বলবৎযোগ্য আইনে রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে। আপাত দৃষ্টিতে তাকেই সামাজিক আইন প্রনয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বিচার ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো থাকলেও সামাজিক আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হল মহিলা, শিশু, বয়স্ক ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা। ভারতীয় সংবিধানে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো মহিলাদের এবং অন্যান্য দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষেরও সরকারের অধীন কাজ করা, কাজের আবেদন করা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা, সভা সমিতি করা, জমায়েত হওয়া, দেশের যে কোন জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করা বা বসবাস করার অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে কোন নাগরিকের (সে পুরুষই হোক বা মহিলাই হোক) প্রাণ বা দৈহিক স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। মহিলাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার বা নির্যাতনের অপরাধে অপরাধীকে গ্রেপ্তার, হাজতে আটকে রাখা, তদন্ত করা, বিচার ও সাজা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়েও মহিলাদের বিশেষ সুবিধা দান করা হয়েছে। সাংবিধানিক সুরক্ষায় এবং সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত আইনের সহায়তায় সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়। বিবিন্ন ধরনের আইন প্রনয়নের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার কয়েকটি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

● **সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে :**

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা, শ্রেণি প্রভৃতি ভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যায় না। ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষি মানুষের দেশে অঞ্চল ভিত্তিক, জাতি ভিত্তিক, বর্ণ ও শ্রেণি ভিত্তিক বৈষম্যের কারণে আশানুরূপ উন্নয়নের স্তরে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের জন্য মানা ধরনের আইনগত সুরক্ষা প্রদানের দাবি বহুদিন ধরেই করা হচ্ছিল। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থান, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা দানের ক্ষেত্রে, এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে নানান বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ কিছু আইন প্রণীত হয়। যেমন— সমান মজুরী আইন-১৯৭৬, ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন-১৯৭৬, প্রসূতি কালীন সুবিধা আইন-১৯৬১, তথ্যের অধিকার আইন-২০০5 প্রভৃতি। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়নের ফলে সমাজের অসহায়, অনগ্রসর ও অবহেলিত মানুষের একটি বড় অংশ নিজেদের রুজি রোজগার ও জীবন ধারনের মান উন্নয়নের পথ খুঁজে পায়। যার ফল স্বরূপ সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

● **সম্পদের সু-সম বন্টনের ক্ষেত্রে :**

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের উত্তরাধিকার ও মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে দেখা যেতো নানা রকমের বঞ্চনার ও পক্ষপাতিত্বের ঘটনা ঘটতো। এক শ্রেণির মানুষের হাতে বেশিরভাগ সম্পদের মালিকানা, অন্য শ্রেণির মানুষের কাছে কিছু না থাকা বা সামান্য সম্পদের অবস্থান/মালিকানা সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, সম্পদের এই অসম বন্টন একশ্রেণির মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস বহুল জীবনযাপনে যেমন সহায়ক হয়, অন্যদিকে তেমন কিছু না থাকা বা যৎসামান্য সম্পদের অধিকারী মানুষের জীবনে ক্রমাগত অভাব-অনটনের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষের জীবন ধারনের ন্যূনতম মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নানান রকমের আইন প্রনয়ন করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইন হল—হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-১৯৫৬, সম্পত্তির অধিকার আইন ইত্যাদি। এই ধরনের আইন প্রনয়নের ফলে অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের একটি বড় অংশের হাতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা হস্তাররিত হয়। তাদের সমাজ জীবনে মর্যাদার সাথে বসবাস করার শক্তি ও সাহস জন্মায়। যা কিনা সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এমনকি, আইন প্রনয়নের ফলে দেশের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে তফশিলিজাতি ও তফ্‌শিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মালিকানাধীন সম্পত্তির হস্তান্তরেও নানান রকমের আইনি জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক আইন প্রনয়নের ফলে সম্পদের (স্থাবর ও অস্থাবর) অসম বন্টন এর অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহিত হয় ভূমিসংস্কার আইনের প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই আইন কার্যকর করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের একটি বড় অংশের হাতে খাস জমির পাট্টা তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। যার ফলে আর্থিক ও সামাজিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহাল সম্বলহীন কৃষিজীবি মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

● **সামাজিক শোষণ, অত্যাচার ও নিযার্তনের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে :**

সামাজিক শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বছরের পর বছর ধরে এক শ্রেণির মানুষ উন্নয়নের নানান রকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ শোষণাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনে মহিলা, শিশু ও বয়স্ক মানুষের একটি বড় অংশই শিকার

হয়ে এসেছেন। এমনকি সেই অত্যাচারের হাত থেকে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির মানুষও বাদ পড়েন নি। তৎকালীন সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্যোগে এবং উদ্ভূত সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সেই শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার পথ প্রবর্তিত হয়। যেমন-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত বাল্যবিবাহ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পণপ্রথা (নিবারণ) আইন, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত সতীদাহ প্রথা (বিলোপ) আইন, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত অনৈতিকভাবে লোকপাচার (প্রতিরোধ) (সংশোধন) আইন, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত গার্হস্থ্য নির্যাতন (প্রতিরোধ) আইন প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সমাজের চিরাচরিত আচার-আচরণ ও বিশ্বাস ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পাশাপাশি ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারাও উপধারায় ওই সব অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অপরাধে অপরাধীকে দণ্ডদানেরও নানান সংশোধন ও সংযোজন সাধিত হয়েছে। যার ফলে চিরকালের অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের আন্দোলনে ব্যাপক হারে মহিলাদের যোগদান ও সোচ্চার হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

● দুর্বল শ্রেণির মানুষের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে :

এমন একটা সময় ছিল যখন অসহায় ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা, নিজেদের রুটি-রোজগার-এর স্থায়ী সমাধান করা, সভা, সমিতি ও সংঘ স্থাপনের ব্যাপারে নানা রকমের অসুবিধায় পড়তে হত। বিশেষ করে মহিলাদের উপর সামাজিক বিধি নিষেধের কঠোরতা ছিল উল্লেখ করার মতো। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের যুক্ত করে তাদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন এর মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ মহিলাদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেনি, তাদের সমাজজীবনে ও পারিবারিক জীবনে জানা রকমের বাধা-নিষেধের মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস বাড়াতেও বিশেষ সহায়ক হয়েছে। দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানের এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন মহিলাদের একটি বড় অংশকে তাদের প্রচলিত জীবনচর্চার বাইরে, সমষ্টি স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকার নানারকমের সামাজিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে মূলত চারটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই ধরনের আইন প্রণয়নের গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন— সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে, শ্রমশক্তির বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে, কর ব্যবস্থার সংস্কার এর ক্ষেত্রে এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে। বিভিন্ন বিষয় সামাজিক আইন প্রণয়নের পথে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। মূলত দুর্বল, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের মূল স্রোতে উত্তরণের পথে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে সামাজিক আইন প্রণয়ন এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি মর্যাদা দানের বিষয়টি সংবিধান স্বীকৃত হলেও বাস্তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পূর্ণমর্যাদা রক্ষা করা বা পোষণ করার বিষয়ে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কোন অপরাধের সাজা দানের সময় বা কোন অপরাধের বিচার চলাকালীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমাজ অপরাধীর

নজরেও অবহেলার নজরে রাখার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। বিশেষ করে কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে আলাদা কোন বিচার ব্যবস্থার সুযোগ ছিল না। কিন্তু ১৯৮৬ সালে কিশোর অপরাধীর বিচার আইন (জুভেনাইল জাস্টিস্ এ্যাক্ট-১৯৮৬) প্রণয়নের ফলে শিশু ও১ কিশোর অপরাধীদের অপরাধের বিচার ব্যবস্থায় নতুন ধারা সংযোজিত হয়। সমাজের কাছে কিশোর অপরাধীদের জন্য নতুন বার্তা পৌঁছল। তাদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতিতে বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই আলোচনা থেকে খুব সহজে অনুমান করা যায় যে সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সামাজিক আইন প্রণয়ন নিঃসন্দেহে একটি মজবুত হাতিয়ারের মতো কাজ করে।

৩.২ ❑ লিগ্যাল এইড্

আক্ষরিক অর্থে লিগ্যাল এইড্ শব্দের অর্থ হল আইনগত বিষয়ে মানুষকে সহায়তা দান। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি জীবনে আইনগত বিষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে আইনগত বিষয়ে পরামর্শদান বা সহায়তা দান-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি পর্যায়ে আইনগত বিষয়ে পরিষেবা প্রদানের নানান ধরনের উদ্যোগ গৃহিত হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের কাছে আইনগত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সম্যকধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লিগ্যাল এইড্ কর্মসূচি গৃহিত হয়। সারা দেশজুড়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষকে আইনি পরিষেবামূলক কর্মকাণ্ডের শরিক হিসাবে এগিয়ে আসার জন্য লিগ্যাল এইড্ কর্মসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে যে ধরনের আইনগত পরিষেবা প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নিম্নরূপ :

- আইনগত বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহ করা।
- আইনগত সাক্ষরতা বিষয়ে প্রচার।
- আইনগত বিষয়ে সাহায্য প্রার্থীকে পরামর্শ দান।
- সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী, আইনগত বিষয়ে চর্চাকারী/উকিল ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা।
- আইনগত পরিষেবা লাভের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত নানান ধরনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য অনেক স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি লাসেব [লিগ্যাল এইড্ সার্ভিস ইন্ ওয়েষ্টবেঙ্গাল] এবং সিলাস (সেন্টার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ লিগ্যাল এইড্ স্কিম)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত দুস্থ ও অসহায় মানুষ যাদের জন্য আইনি সহায়তা দানের কথা বলা হয় তাদের চিহ্নিত করণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা দান প্রক্রিয়া আশানুরূপ অগ্রসর লাভ করেনি। দেশের বহুমানুষ এখনও আইনগত সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতি আগ্রহী নয়। বর্তমান আইনি সহায়তা দানের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে এই প্রক্রিয়ায় নানারকমের অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার চিত্র ফুটে উঠবে। যেমন—

প্রথমত : বিলম্বিত ও ব্যয় বহুল বিচারব্যবস্থার কারণে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির একটা বড়

অংশ আইনগত পরিষেবা গ্রহণের প্রতি উদাসীন থেকেছে।

দ্বিতীয়ত : যাদের জন্য আইনি সহায়তা দানের কথা বলা হয়, তাদের বেশিরভাগ মানুষ অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার শিকার।

তৃতীয়ত : চিরচরিত অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে এই শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষের ক্ষমতাশীল বিরোধিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের শক্তি ও সামর্থ্য থাকে না।

চতুর্থত : সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালীর সাথে আইনি ক্রিয়াকলাপের নামে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে বেশিরভাগ মানুষই মানুষই চায় না।

পঞ্চমত : রাজনৈতিকভাবে এই শ্রেণির অবহেলিত ও শোষিত মানুষের জন্য আইনগতভাবে কোন উদ্যোগ গ্রহণের অনিহা।

ষষ্ঠত : বিচারব্যবস্থায় আইনি সহায়তার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষার মানসিক প্রস্তুতি অনেকেরই থাকে না।

সপ্তমত : আইনগত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে একটি সংখ্যক মানুষের কাছে অপব্যাখ্যার প্রবণতা বৃদ্ধি। এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে আইনি সহায়তা দানের বিষয়টি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। আইনগত সহয়তা দানের মধ্যে যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ৯০০০ টাকার বেশি নয় তাদের সরকারি উকিল ও আদালতের খরচ দিয়ে সাহায্য করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, প্রঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য, পুরসভার কমিশনার, প্রমুখের মধ্যে যে কোনও একজনের দেওয়া আয় সংক্রান্ত শংসাপত্র সহ বি.ডি.ও., মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের দপ্তরে এই সাহায্যের জন্য আবেদন করা যায়। আবেদন পত্রের প্রাথমিক পরীক্ষার পর আবেদনকারীকে কোনো আইনজীবীর কাছে পাঠানো সাহায্য পেতে পারে তা হল—

— সংশ্লিষ্ট মামলাতে কোর্ট ফি, সাক্ষীদের যাতায়াত খরচ, মামলার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ।
— মামলার প্রার্থীকে বিনা খরচে আইনজীবির সাহায্য ও পরামর্শ।
— প্রার্থীকে মামলার রায়, সাক্ষ্য, আদেশ ও অন্যান্য কাগজপত্রের নকল কপি দেওয়া।
— মামলায় দলিলপত্রের ছাপাই ও অনুবাদ সহ আবেদনের জন্য কাগজপত্র তৈরি করে দেওয়া।
— মামলার দলিলপত্রের খসড়া করে দেওয়া।

এছাড়াও লিগ্যাল এইড্ পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রত্যেক জেলায় জেলা ও মহকুমা স্তরে লিগ্যাল এইড্ শিবিরের আয়োজন করা হয়। যার ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে আদালতগুলিতে মোটরগাড়ি দুর্ঘটনাজনিত মামলা, খোরপোষের মামলা, এমনকি কিছু দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তির আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব মামলার ক্ষেত্রে দুঃস্থ ও দরিদ্র নারীদের আইনগত সাহায্যের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

লিগ্যাল এইড্ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নারীর অধিকার বিষয়ে মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি জন্য কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা গেছে, বিপন্ন মহিলাকে সাহায্য দেবার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে।

৩.৩ ❑ পারিবারিক আদালত

সমাজ কাজ করছে নানান স্বার্থগোষ্ঠী। মূলত শ্রেণিভিত্তিক। একদিকে উচ্চ ও বিত্তশীল শ্রেণির এবং অন্যদিকে পশ্চাৎপদশ্রেণি বা অনুন্নত শ্রেণি। নিজেদের সপক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়ে নেওয়ার জন্য এই শ্রেণিগত ভিত্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মজার বিষয় হল এই যে ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। আবার সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অনুসারে পঞ্চায়েত এলাকায় জনগণের মতামত গ্রহণ ও প্রস্তাবিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য গ্রামসভা এবং পৌর এলাকায় ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে একই অনুশীলন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধানে উল্লিখিত এইসব নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকটি আইন ও প্রণীত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে পারিবারিক আদালত আইন প্রণয়ন এর মাধ্যমে বলা হয় যে, প্রত্যেক জেলায় এবং রাজ্যে পারিবারিক আদালত গঠন করা আবশ্যক। বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়/বিবাদ সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি ও আপোসের মাধ্যমে তা পুনরায় সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্যই পারিবারিক আদালতের প্রতিষ্ঠা করার কথা ওই আইনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ধরনের সমস্যা বা বিষয়-এর উপর পারিবারিক আদালত কাজ করতে পারবে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল নিম্নরূপ—

— বিবাহ বাতিলকরণ।
— দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
— আইনগত বিচ্ছেদ।
— বিবাহ ভেঙে দেওয়া।
— ব্যক্তির বৈবাহিক মর্যাদা দেওয়া।
— অন্তর্বর্তী নির্দেশ/নিষেধাজ্ঞা যা বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে ঘটে থাকে।
— ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য আদালতে আবেদন করা।
— ব্যক্তির আইনগত সুরক্ষা, আইনসম্মত বৈধ্যতা নাবালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণের সুযোগের বন্দোবস্ত করা।

উপরোক্ত কাজ কর্ম যথাযথভাবে দেখাশোনা ও উপযুক্তভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের সঙ্গো আলোচনা ও পরামর্শ করেই জেলায় জেলায় পারিবারিক আদালতের প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩.৪ ❑ জনস্বার্থ রক্ষা আইন

বিগত ছাপ্পান্ন বছর ধরে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব যোগ্যতার সাথেই পালন করে চলেছে। বহুমামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং পরিণামে উভয় আদালত কর্তৃক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হয়েছে। দেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ আদালতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও দেশের জনগণের স্বার্থ-রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ভারতবর্ষের মতো রাষ্ট্রে আদলতের প্রশংসনীয় তাৎপরতা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দরিদ্র, নিরক্ষর এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হওয়ার কারণে জনস্বার্থ বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিষয় তেমন গুরুত্ব পায়নি। ফলে, সংবিধানে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষকে আদালতমুখী করা সম্ভব হয়ে

ওঠেনি। নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য বা তাৎপরতা এই শ্রেণির বেশির ভাগ মানুষের থাকে না। এমতাবস্থায় সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা—তাদের কাছে অর্থহীন। মাননীয় বিচারপতি পি. এন. ভগবতীর একটি রায়ের ভিত্তিতে আশির দশকের গোড়ায় প্রবর্তিত হয় জনস্বার্থমূলক মামলার অধিকার। এর ফলে দরিদ্র, নিরক্ষর, অসহায় ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচারব্যবস্থার প্রচলিত ভাবমূর্তির ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল সুপ্রিমকোর্টে জনস্বার্থমূলক মামলা দায়ের করার সুযোগ দেওয়া হলেও অনতিকালের মধ্যে হাইকোর্টকেও জনস্বার্থমূলক মামলা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। এই মামলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে মামলা দায়ের করতে না পারলেও তার হয়ে অন্য কেউ জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মামলা করতে পারেন। এমনকি মাননীয় বিচারপতির কাছে একটি পোষ্ট কার্ডে লিখে অথবা একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েও এই মামলা দায়ের করা যায়। এর ফলে জনস্বার্থ মামলা সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ পরিবর্তনের এবং সমষ্টির অধিকার রক্ষার একটি সহজতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে পড়া, আর্থিকভাবে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির বেশির ভাগ মানুষ আদালতে গিয়ে মামলা দায়ের করার পরিবর্তে সহজপদ্ধতি অবলম্বন করে জনস্বার্থমূলক মামলার মাধ্যমে আইনগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পথ অনুসরণের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। জনস্বার্থমূলক মামলা জনগণের কাছে একটি নতুন ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ যার ফলে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কর্তব্য এবং আদালতের এক্তিয়ারভূক্ত সীমানার মধ্যে তা বলবৎযোগ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা যায়। জনস্বার্থমূলক মামলা অন্য সাধারণ মামলার মতো বলবৎযোগ্য কোন মামলার মধ্যে পড়ে না। এই ধরনের মামলা সাধারণত সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটবে এমন কোন বিষয় বা ঘটনার উপর ভিত্তি করে দায়ের করা হয়ে থাকে। যেমন— জেলের মধ্যে শিশুদের উপর অবিচার, বোম্বাই শহরের পথশিশু ও ফুটপাথ শিশুদের সুরক্ষা, হাওড়ায় জনবসতি এলাকায় দুর্গন্ধযুক্ত কীটনাশক প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপন, কলকাতা ময়দানে সবুজায়ন সুরক্ষার জন্য নানান ধরনের মেলা বন্ধ করার মামলা প্রভৃতি জনস্বার্থমূলক মামলার বিবেচনাধীন বিষয় বা ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ নং অনুচ্ছেদে এবং ৩২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, বা আইনগত সুযোগ-সুবিধার অধিকারলাভ বঞ্চিত হয়, তাহলে তিনি বা তারা জনস্বার্থমূলক মামলার অধীনে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। মহামান্য উচ্চ আদালত এক্ষেত্রে জনস্বার্থে (Pro-bono-publico) তড়িঘড়ি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে থাকে। প্রসঙ্গত, অম্মিল ভারতীয় শোষিত (রেলওয়ে) কর্মচারীসংঘ বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিবন্ধীকৃত শ্রমিক সংগঠন না হলেও উক্ত কর্মচারী সংঘ সদস্যদের সমষ্টিগত স্বার্থে আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য লিখিত আবেদন করতে সক্ষম হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ার এই মর্মে শ্রেণীগত বিষয় ও জনস্বার্থ রক্ষায় বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়ার বৈধতা বিষয়ে সংবিধানে বর্ণিত অধিকার সুরক্ষার অনুকূলে রায় দেন।

জনস্বার্থমূলক অধিকার রক্ষার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণের প্রথম কয়েকমাস পরে এই বিষয়ে অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য এত বেশী বেশী আবেদন সম্বলিত পোষ্টকার্ড, চিঠি ও সাদা কাগজের দরখাস্ত উচ্চ আদালতে আসতে শুরু করল যে, মামলা দায়ের করার সাতদিনের মধ্যে তা আর শুনানীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। এর ফলে আবেদনকারীদের মধ্যে অনেকে

উচ্চ আদালতে এমনকি সর্বোচ্চ আদালতেও এই মামলার সময় মতো নিষ্পত্তি করা হয়ে ওঠেনি।

সামান্য কিছু ত্রুটি দুর্বলতার জায়গা থাকলেও জনস্বার্থমূলক মামলার প্রচলন সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য রক্ষা কবচের মতো কাজ করেছে। সমষ্টিস্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যবসায়িক স্বার্থে ও ব্যক্তি স্বার্থে কোন কিছু করা ও তার বিনিময়ে সমষ্টির স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন থাকার দিন প্রায় শেষের দিকে। বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম, বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমের উদ্যোগে জনস্বার্থ মামলা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। অন্যান্য মামলার মতো জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে হাইকোর্টে বা সর্বোচ্চ আদালতে শুধুমাত্র চিঠি পাঠিয়ে মামলা দায়ের করা যায়। ভারতবর্ষের মতো দেশে যার স্বার্থকতা ও কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

৩.৫ ❑ জাতীয় ও রাজ্য আইন পরিষেবার কর্তৃপক্ষ

একদিকে স্বাধীনতা ও লাভের পর ভারতবর্ষে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের জন্য নানান ধরণের সুবিধাদানের মাধ্যমে মূল স্রোতে আনার ফিরিয়ে আনতে নানা রকমের আইন প্রণয়ন করা হয়। সকলের জন্য সমান-সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও লিঙ্গাভেদে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ বা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করতে ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনকি কোন অপরাধের কারণে অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট আইন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ধরনের উদ্যোগগুলোর মধ্যে ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট বা আইনি পরিষেবার কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

— বিনা খরচে ও যথাযথ আইনি পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণির মানুষের কাছে ন্যায় বিচার অর্জনের পথ সুনিশ্চিত করা এবং

— লোক আদালত এর আয়োজন করে অর্থনৈতিকভাবে ও অন্য কোনো ভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য সমান সুযোগের বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এবং আইনি পরিষেবাকে সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিতে নিম্নলিখিত ত্রি-স্তর আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ স্থাপনের বন্দোবস্ত করা হয়।

যেমন, — (ক) জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ,
— (খ) রাজ্য আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ,
— (গ) জেলা আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ,

উল্লিখিত আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ আইনের (১৯৮৬) ধারা নং ৪ অনুসারে জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী এখানে নীচে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী :

জাতীয় স্তরে আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ হওয়ার ফলে এই স্তরে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের

কর্তৃপক্ষের জন্য নানানধরনের কাজকর্ম করতে হয়। এছাড়া জাতীয় স্তরে নিজস্ব কাজকর্মের জন্য এই কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যে ধরনের কাজ সাধারণত জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ করে থাকে তা হল—

— রাজ্য আইনগত পরিষেবার জন্য কর্মপন্থা ও নীতি প্রণয়ন করা।
— সবচেয়ে কার্যকরী ও সাশ্রয়কারী প্রকল্প রচনা।
— রাজ্য ও জেলা স্তরের আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের জন্য অর্থবরাদ্দ ও খরচ এর তদারকি করা।
— ক্রেতার স্বার্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ও অবহেলিত মানুষের অন্য কোনো স্বার্থ রক্ষায় সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
— বস্তি অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে এবং শ্রমিক কলোনীতে বসবাসকারী মানুষজনের আইনি শিক্ষাদানের জন্য লিগ্যাল এইড্ ক্যাম্প করা এবং এদের মধ্যে বহুদিনের ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তির জন্য লোক আদালতের আয়োজন করা।
— পারস্পরিক বোঝাপড়া, আপস ও সালিসির মাধ্যমে কলহ নিরসর্ণে উদ্বুদ্ধ করা।
— সংবিধানের ৪(এ) অংশে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্য-এর প্রতি প্রতিশ্রুতিবন্ধ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
— বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আইনগত শিক্ষাদানের ক্লিনিক স্থাপন করা, দেখাশোনা করা ও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করার জন্য বার কাউন্সিলের সঙ্গো পরামর্শ করা।
— সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণির মানুষের কাছে আইনগত বিষয়ে সাক্ষরতা বাড়ানোর ও সচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
— তৃণমূলস্তরে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যারা মূলত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য এবং শহর ও গ্রামের শ্রমিকদের জন্য কাজ করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে আইনগত বিষয়ে উপযুক্ত কর্মসূচী রূপায়ণ করা।

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনার জন্য এবং জাতীয় স্তরে আইনমূলক পরিষেবার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে দেখভালের জন্য নিম্নলিখিত সাংগঠনিক পরিকাঠামো থাকাটা বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে সদস্যদের বিন্যাস হবে এইরকম—

— সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হবেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা 'প্যাট্রন ইন্ চিফ্'।
— সর্বোচ্চ আদালতের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবেন। এই পর্ষদের সাধারণ সদস্য তিনি।
— সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন নির্বাচিত সদস্য যাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা বা উপযুক্ত মানের শিক্ষা আছে। এই দুজন সদস্য নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা।

(খ) রাজ্য আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ :

রাজ্যস্তরে আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের নিম্নোক্ত পর্ষদ গঠন করা হয়। যথা—

— একজন মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, যিনি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি।

— একজন সদস্য যিনি সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত বিচারক।

— অন্য যে কোন দুজন ব্যক্তি যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্তমান।

উল্লিখিত পর্ষদের নেতৃত্বে আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ যে ধরনের কাজকর্ম করে থাকে তা হল নিম্নরূপ।

— রাজ্য সরকার জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কর্মপন্থা ও নীতি মেনে চলা।

— আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের আইনে বর্ণিত নির্দিষ্টশর্ত পূরণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আইনগত সাহায্য প্রদান করা।

— লোক আদালতের আয়োজন করা।

— প্রতিরোধমূলক ও কৌশলগতভাবে আইনগত সহায়তার (লিগ্যাল এইড্) কর্মসূচির আয়োজন করা।

উপরোক্ত কাজগুলোর পাশাপাশি জাতীয় আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ দায়বন্ধ থাকবে।

(গ) জেলা আইনগত পরিষেবা মূলক কর্তৃপক্ষ :

জাতীয় ও রাজ্য আইনগত পরিষেবা মূলক কর্তৃপক্ষের মতো জেলাস্তরে আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃক্ষের একটি পর্ষদ/কমিটি গঠন করা হয়। তা হল এইরকম—

— একজন সভাপতি, যিনি জেলা জজকোর্টের বিচারক হিসাবে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত।

— একজন সদস্য, যিনি জেলা জজকোর্টের কর্মরত বা অবসর প্রাপ্ত সদস্য।

— দুজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী/সদস্য যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেছেন বা শিক্ষালাভ করেছেন।

উপরোক্ত পর্ষদ গঠনের পাশাপাশি জেলা আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ যে ধরনের কাজ করে থাকে তা হল এইরকম—

— রাজ্য আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও কর্মপন্থা মেনে চলা।

— আইনগত সহায়তা দানের কাজকর্ম জেলাস্তরে সংযোজন করতে সাহায্য করা।

— জেলায় লোক আদালতের আয়োজন করা।

— আইনগত সেবার স্বার্থে জেলা আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিষয়ক প্রতিষ্টান, কলেজ ও অন্যান্য এই জাতীয় সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা।

— জাতীয় ও রাজ্য আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত জেলা পর্যায়ের প্রত্যেকটি কাজ করা জন্য দ্বায়বন্ধ থাকা।

এইভাবে আমরা জাতীয়, রাজ্য ও জেলা আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের গঠন ও কাজকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে পারি। উক্ত আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের আইনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে উল্লিখিত দিকগুলো আমরা দেখে নিতে পারি। তা হল আইনগত সহায়তা কারা পেতে পারেন বা কাদের জন্য আইনগত সহায়তা/সেবাদানের কথা বলা হয়েছে। আইনের ১২ নং ধারায় উল্লিখিত সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হল নিম্নরূপ :

যে কোনো ব্যক্তি এই আইনগত পরিষেবামূলক সহায়তা পেতে পারেন, যাকে সুরক্ষার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়, যদি তিনি—

- একজন তপশিলি জাতি বা উপজাতিভূক্ত পরিবারের সদস্য হয়ে থাকেন।
- লোকপাচার এর শিকার কোন পুরুষ বা মহিলা।
- ভারতীয় সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদের বর্ণনায় কোন ব্যক্তি, যিনি ভিক্ষুক বা ভিক্ষার মাধ্যমে জীবনধারণ করে থাকেন।
- একজন মহিলা বা শিশু হয়ে থাকেন।
- (এই আইনের ১২নং ধারায় বর্ণিত) মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ বা ভারসাম্যহীন কোন ব্যক্তি হন।
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত বা বর্ণবিদ্বেষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকেন।
- শিল্প বা কলকারখানার শ্রমিক হয়ে থাকলে।
- নিরাপদ তত্তাবধানে থাকা, শিশু অপরাধীর হোমে থাকা অথবা অন্য কোনো হোমের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তি হয়ে থাকেন।
- পারিবারিক আয় বার্ষিক ৯০০০ টাকার কম থাকা কোনো পরিবারের কোনো সদস্য হলে,
- বার্ষিক আয় ১২,০০০ টাকা বা তার চেয়ে কম হলেও সেই পরিবারের কোনো সদস্য আইনগত পরিষেবা পেতে পারেন যদি তিনি আগে জেলা আদালতে ও পরে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে আইনগত জন্য দারস্থ হয়ে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, আইনগত সেবামূলক বিষয় সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গৃহিত আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত আইনগত পরিষেবামূলক কর্তৃপক্ষের গঠন প্রণালী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাহায্যপ্রার্থীকে তার প্রত্যাশাপূরণের জায়গা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে যা আইনগত সেবাদানকারী অন্য অনেক উদ্যোগেও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাবে আইনগত পরিষেবায় প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় সাহায্যপ্রার্থীকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই আইনে করা হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৬ ❑ লোক আদালত

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় গরিব ও অসহায় মানুষের পক্ষে আদালতে গিয়ে মামলা দায়ের করা এবং ন্যায় বিচারের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে যার পরনাই জটিলতার শিকার হতে হয়। মূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও অক্ষমতার জন্যই কোন নাগরিক যাতে সামাজিক ও আইনগত ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা দেখার জন্য আইনগত সাহায্য দানের (Legal Aid) এর ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই আইনগত সাহায্যদানের কাজকর্ম যে কয়েকটি ধারায় চালানোর জন্য গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি কাজকর্মের ধারাই হল জেলা সদর, মহকুমা, ব্লক প্রভৃতি স্থানীয় এলাকায় 'লোক আদালত' এর আয়োজন করা। দেশের বিভিন্নপ্রান্তে 'লোক আদালতে'র গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যবস্থার আয়োজন করার জন্য পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে বা অন্য কোন কার্যকারী মাধ্যমে প্রচার করে বা সরাসরি যোগাযোগ করে যাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছে তাদের উভয় পক্ষকে শিবিরে হাজির করার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি এই পদ্ধতিতে জেলা আদালতে বা উচ্চ আদালতে বহুদিনের পড়ে থাকা মামলার অপর পক্ষকেও এই শিবিরে হাজির

করানোর ব্যবস্থা করা হয়। লোক আদালতের মূল উদ্দেশ্য হল উভয়ের বক্তব্য শুনে বিরোধটির অথবা ইতিমধ্যে আদালতের বিচারধীন কোন মামলার যাতে আপোসের মাধ্যমে মীমাংসা করা যায় তার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯-এ অনুচ্ছেদের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে সকলের জন্য সমান ও ন্যায়সঙ্গত বিচার সুনিশ্চিত করতে আইনগত সাহায্য দানের কর্মসূচি গৃহিত হয়। লোক আদালতের মাধ্যমে বহুদিনের জমে থাকা অপরাধী মামলা, কোম্পানী আইন-লঙ্ঘন মামলা, খাজনা বা কর সংক্রান্ত মামলা, পঞ্চায়েত ও পুর আইন সংক্রান্ত মামলার আপোস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপ্রতি, সরকারি আধিকারিক এমনকি উচ্চ আদালতের বা নিম্ন আদালতের মিনিষ্টারিয়াল কর্মী এবং দুইজন কাউন্সিলার সহ আদালতের কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় দু একজন কর্মীকে নিয়েই লোক আদালতের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বিশেষ আইন মোতাবেক লোক আদালতের রায়কে স্বীকৃত বিচারবিভাগীয় রায় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত যে পদ্ধতিতে লোক আদালতের মাধ্যমে পরস্পর বিবাদমান দুইপক্ষের বা ইতিমধ্যে কোন আদালতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এমন মামলার উভয়পক্ষকে উক্ত লোকআদালত শিবিরে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে আপসের মাত্রা বোঝার জন্য দুজন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞানের অধিকারী পরামর্শদানকারী (counsellor) নিযুক্ত করা হয়। উভয়পক্ষের আপসের ভিত্তিতে আদালতে শুনানী হয় এবং মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার বিচারে সমাজকর্মের বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকেই কাউন্সিলার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। যাদের মূল লক্ষ্য থাকে বিকল্প উপায়ে বিরোধ মেটানোর প্রক্রিয়া (Alternative Dispute Resolution Process) তে উভয় পক্ষের মধ্যে আইনগতভাবে স্বীকৃত উপায়ে মামলার নিষ্পত্তি ঘটানো।

এই পদ্ধতি প্রচলের অব্যবহিত পরে উচ্চ আদালত ও জেলা বা নিম্ন আদালতে বহু বছর ধরে পড়ে থাকা মামলার একটি বড় অংশের নিষ্পত্তি ঘটানো সম্ভব হলেও পরবর্তীকালে লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য জড়ো হওয়া মামলার সংখ্যা এতটাই বাড়তে থাকে যা সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে অধিক সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি ঘটানোর কাজে সময়ভিত্তিক লক্ষ্যপূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৩.৭ ❑ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। নারী ও শিশু বিকাশ দপ্তর ও সমাজকল্যান দপ্তর — দিশা, ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রারম্ভিক সংখ্যা ২০০১ ডিসেম্বর।

২। ড. অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — মানবাধিকার আইন।

৩। অমলকুমার মুখোপাধ্যায় — প্রসঙ্গ ভারতীয় সংবিধান, যোজনা, ডিসেম্বর ২০০৬ সংখ্যা।

৩.৮ ❑ অনুশীলনী :

১। সামাজিক পরিবর্তন-এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক আইন প্রণয়ন ব্যাখ্যা করুন।

২। লিগ্যাল এইড কী ও কাদের জন্য ?

একক ৪ ❑ বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, পতি/পত্নী ও শিশুর ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, আইনগত প্রতিবিধান ও তার নানান বৈশিষ্ট্য।

গঠন

৪.১ ধারণা

৪.২ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ

৪.২.২ বিবাহ

৪.২.২ বিবাহ বিচ্ছেদ

৪.৩ উত্তরাধিকার ও পরম্পরা

৪.৪ পতি/পত্নী ও শিশুর ভরণপোষণ

৪.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ ❑ ধারণা

আইন প্রণেতাগণের দ্বাবা বা ভারতীয় সংসদের মাধ্যমে প্রবর্তিত আইনসমূহের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ব্যাখ্যাই আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত। সমাজে বাস করার জন্য আমাদের সবাইকে কিছু নিয়মবিধি মানতেই হয়। এই সব নিয়মনীতির উৎস হল আইন। সমাজের নানা ধরনের প্রথা, নিয়ম, কু-অভ্যাস ও কু-সংস্কার দূর করে সমাজকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সামাজিক আইন প্রণয়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বিভিন্ন আইনে মহিলা ও শিশুদের যেমন বিভিন্ন ধরনের অধিকার সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমনি, সেই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও তার প্রতিকারের বিধান সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্বে সেইসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে নিম্নলিখিত উপায়ে।

৪.২ ❑ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ

৪.২.১ বিবাহ :

বিবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণির ও ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিধান ও প্রথা প্রচলিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহের ভূমিকা বিশেষ করে ব্যাক্তি জীবনে বিশেষগুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক বিবাহ আইন চালু আছে। হিন্দু বিবাহ আইন—১৯৫৫, মুসলিম বিবাহ আইন, ক্রিশ্চান বিবাহ আইন ১৮৭২, পাত্রপাত্রীর ধর্ম ভিন্ন হলে বিশেষ বিবাহ আইন—১৯৫৪, প্রভৃতি আইন আমাদের দেশের বিবাহ ব্যবস্থার সুরক্ষা ও তার পরিচালন ব্যবস্থার পথ নির্দেশ করে।

● **হিন্দু বিবাহ আইন সম্পর্কিত :**

এই আইনের আওতায় হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা বা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছেন তারাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন এবং তাদের বৈবাহিক বিধান এই আইনে প্রবর্তিত হয়েছে। হিন্দু বিবাহের বিধান অনুসারে—

(ক) পাত্র ও পাত্রী উভয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হবেন।
(খ) কেউ (পাত্র বা পাত্রী) বিবাহিত নয়।
(গ) উভয়ের মধ্যে রীতি অনুযায়ী কেউ কোনো নিষিদ্ধ সম্পর্কে আবদ্ধ নয় এবং উভয়ের বিয়েতে রীতি অনুসারে কোনো বাধা নেই।
(ঘ) কেউ অন্য ধর্মগ্রহণ বা সংসার ত্যাগ করেছেন এমন বা রীতি অনুসারে উভয়ের বিবাহে কোনো বাধা নেই।
(ঙ) বিয়ের সময়ে উভয়ের কেউ মানসিক প্রতিবন্ধী বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন না হন।
(চ) পাত্রের বয়স ২১ বছর ও পাত্রীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে।
(ছ) জোর করে বা প্রতারণার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে এমন নয়।
(জ) উভয়ের কেউ স্ব-গোত্র ভূক্ত নয়।

এই ধরনের শর্ত না মানলে বা কোন শর্ত উভয়পক্ষের কারর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলে হিন্দু বিবাহ আইনমতে বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে না।

● **বিশেষ বিবাহ আইন সম্পর্কিত :**

প্রত্যেক প্রধান ধর্মের নিজস্ব প্রথা পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথক বিবাহ আইন চালু আছে। পাত্র-পাত্রী একই ধর্মের হলে তাদের নিজস্ব ধর্মের বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাত্র-পাত্রীর ধর্ম ভিন্ন হলে তাদের বিবাহ বিশেষ বিবাহ আইন—১৯৫৪ অনুসারে হতে পারে। একই ধর্মের হলেও পাত্র-পাত্রী এই আইন অনুসারে বিবাহ নিবন্ধকের অফিসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলীপূরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় :

(ক) কোনো পক্ষেরই স্বামী/স্ত্রী জীবিত নেই।
(খ) কোনো পক্ষেরই
- — মানসিক জড় বুদ্ধির কারণে বিবাহে সম্মতিদানে সক্ষমতা নেই।
- — বিবাহে সম্মতিদানে সক্ষম হলে ও মানসিক ভারসাম্যহীন বা তেমন কোন অবস্থা যা বিবাহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয় বলে বিবেচিত হবে বা সন্তান ধারনে অক্ষমতা।
- — বারে বারে মৃগি বা উন্মত্ততায় মগ্ন হন।

(গ) পাত্রের ২১ বছর ও পাত্রীর ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে।
(ঘ) উভয়ের কেউ কোন রকম নিষিদ্ধ সম্পর্কে আবদ্ধ নয়।

প্রচলিত নিয়ম/বিধান অনুসারে যেহেতু এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের বিয়ে সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, সেই কারণে তা সম্পাদিত হতে পারে যদি না উভয়ের মধ্যে কোন পক্ষই নিষিদ্ধ সম্পর্কে জড়িত না থাকেন।

(ঙ) জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এই আইন অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথিত আছে যে উভয়েই ভারতীয় নাগরিক এবং এই আইনের কার্যকারী ক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী হবেন।

বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ হওয়ার কারণে সম্পত্তির অধিকার বা ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হতে পারে না। পরবর্তী জীবনের জটিলতা কাটাতে বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেটের কপি উভয়ের কাছে রাখা অতন্ত জরুরি।

৪.২.২ বিবাহ বিচ্ছেদ :

বিবাহিত জীবনে চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝি ও অশান্তির ফলে কখনও কখনো অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

● হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ :

এই আইনের (হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫) ১৩ ধারায় স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ যে কোন সময় বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদন জানাতে পারেন। তার জন্য নিম্নলিখিত কোন একটি কারণ থাকা দরকার।

● বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বিবেচ্য বিষয়াবলী :

(ক) **পরকিয়া :** স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ নিজের স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মহিলা বা পুরুষের সাথে শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক রাখলে।

(খ) **অত্যাচার :** বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী যে একে অন্যের উপর শারীরিক, মানসিক বা উভয় রকম অত্যাচার করলে।

(গ) **পরিত্যাগ :** বিয়ের পর একে অপরকে অবহেলা করা, কারণ ছাড়া বা ইচ্ছা বহির্ভূত কারণে স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ একে অপরকে দূরে সরিয়ে রাখলে।

(ঘ) **সন্ন্যাস (ধর্মান্তর) :** বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ হিন্দু ধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্মগ্রহণ বা সংসার ছেড়ে চলে গেলে।

(ঙ) **পাগল :** বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ অন্তত তিন বছর যদি চেতনাহীন/জড় বুদ্ধি সম্পন্ন বা পাগল হন তাহলে।

(চ) **কুষ্ঠ :** বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ যদি কঠিন ও নিরাময়হীন কুষ্ঠরোগে অন্তত তিন বছর ধরে ভুগলে।

(ছ) **যৌন রোগ :** বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী'র যে যদি নিরাময়হীন যৌন রোগে অন্তত তিন বছর ধরে ভুগলে।

(জ) বিয়ের পর অন্তত সাত বছর ধরে স্বামী বা স্ত্রী'র যে কেউ বেঁচে আছেন এমনটা শুনতে না পেলে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের প্রতি কর্তব্য না করলে, একে অপরকে পরিত্যাগ করলে বা একত্রে বসবাস না করলে আদালতে প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে।

● **বিবাহ বিচ্ছেদ (উভয়ের সম্মতিতে) :**

হিন্দু বিবাহ (সংশোধিত—১৯৭৬) আইন এর ১৩(বি) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে :

- অন্তত ১ বছর বা তার বেশি সময়কাল ধরে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পর একে অপরের থেকে আলাদাভাবে বসবাস করে থাকলে।
- একসঙ্গো বসবাস করার মতো পরিস্থিতি তাদের মধ্যে না থাকলে।
- উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হলে।

হিন্দু বিবাহ আইনের উপরোক্ত বিধান ব্যাতীত বিশেষ বিবাহ আইনেও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতিবিধান আরোপ করা হয়েছে।

● **বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদ :**

বিশেষ বিবাহ আইনের ২৭নং ধারায় বিবাহের পরে স্বামী বা স্ত্রী'র মধ্যে যে কেউ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন। নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে—

(ক) এই আইনের বিধান অনুসারে ও উক্ত আইনে বর্ণিত নিয়মানুসারে স্বামী বা স্ত্রী'র মধ্যে যে কেউ নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন—

১) নিজের স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রী বা স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে।

২) আবেদনকারী/আবেদনকারিণীকে আবেদন করার দিন থেকে বিগত দুই বছর বা তার বেশি সময় ধরে পরিত্যাগ করেছেন এমনটা হলে।

৩) ভারতীয় দন্ডবিধি (১৮৬০)-এর ৪৫নং ধারায় উল্লিখিত বিধান অনুসারে কোন অপরাধে স্বামী/স্ত্রী'র কেউ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য দন্ডিত হলে।

৪) বিবাহের পর থেকে আপেদনকারী/আবেদনকারীণী অনবরত নির্যাতন/অত্যাচারের শিকার হলে—

৫) নিরাময়হীন মস্তিস্ক বিকৃতি, জড় বুদ্ধিতা বা ঐ জাতীয় অন্যকোন সমস্যার কারণে আবেদনকারী বিবাহ জীবন যাপনে আশাহীন হয়ে পড়লে।

এই অনুচ্ছেদে **"মানসিক বিকৃতি'র** ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

(ক) মানসিক অসুখ, জড়তা বা মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণ বিকাশ, মনস্তাত্তিক বিশৃঙ্খলা বা অন্য কোন ধরনের বিকৃতি বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং সিজোফ্রেনিয়া বা উন্মত্ত পাগলামি।

(খ) 'মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা' বলতে এখানে মনের ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলা বা মনের প্রতিবন্ধকতা (বুদ্ধির অস্বাভাবিকতা যুক্ত থাকতে পারে নাও থাকতে পারে) যার ফলে অস্বাভাবিক উগ্রতা বা দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার লক্ষণ যার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে বা নাও হতে পারে।

৬) যে কোন ছোঁয়াবে নিরাময়হীন যৌন রোগে ভুগলে বা।

৭) কুষ্ঠ (নিরাময়হীন) রোগে ভুগলে যা আবেদনকারীর সংস্পর্শে আসার জন্য ছড়ায়নি এমন পরিস্থিতি ঘটলে।

৮) সাত বছরের বেশি সময় ধরে বেঁচে আছেন এমন কোন খবর না পাওয়া গেলে বা কারও মুখে শুনতে না পেলে।

উপরোক্ত ধারায় 'পরিত্যক্ত (desertion)' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বিয়ের পর আবেদনকারী তার অপর পক্ষ কর্তৃক কোন সংগত কারণ ব্যতীত বা আবেদনকারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ইচ্ছাকৃত অবহেলার মাধ্যমে বা অন্য কোন ব্যাকরণগত তারতম্য ঘটলে তবেই আবেদনকারী অপরপক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

● (১-এ)

একজন স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কারণে জেলা আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারেন :

(ক) বিয়ের পর থেকে তার স্বামী সমকামী, ধর্ষণকারী বা কামুক জাতীয় দোষে দুষ্ট।

(খ) হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনের ১৮ ধারায় বা অপরাধী বিচারবিধি Criminal procedure code-1973)-১৯৭৩-এর ১২৫ ধারায় বা পূর্ববর্তী অপরাধী বিচার বিধি (1898)-১৮৯৮-এর ৪৮৮ ধারায় স্ত্রী'র ভরণপোষণের যে বিধান/রায় প্রয়োজ্য হয়েছে তা অর্জনের জন্য আবেদন এর আগে স্ত্রীকে নিশ্চিত হতে হলে যে তিনি বিগত একবছর ধরে স্বামীর সঙ্গো একত্রে বসবাস করেননি বা ওই সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গো সহবাস করেননি।

● (২)

আইনের বিধান অনুসারে বা নিয়ম অনুসারে ১৯৭০ সালে প্রবর্তিত বিশেষ বিবাহ (সংশোধন আইনের আগে বা পরে অনুষ্ঠিত বিবাহের বন্ধনে আবন্ধ স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন।—

(ক) উভয়ের আবেদনের (যেখানে উভয়পক্ষই বাদী আসামী) ভিত্তিতে ঘোষিত আইনগত বিচ্ছেদ থাকা কালীন অন্তত এক বছর বা তার বেশি সময়ের মধ্যে উভয়ে সহবাসে লিপ্ত হন নি।

বা

(খ) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের (যেখানে উভয়ে বাদী-আসামী) আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইনগত বিচ্ছেদের মেয়াদকালের অন্তত এক বছর বা তার বেশি সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী সম্পর্ক কোন ভাবে ফিরে পান নি।

● **(২৭-এ) ধারা :**

বিবাহ বিচ্ছেদ কার্য-বিবরণ প্রণালীর বিকল্প ব্যবস্থা : এই আইনের ২৭নং ধারার উপধারা (১)-এর (h) অংশে বর্ণিত বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ব্যাতীত আদালত আবেদনকারীর আবেদন এর বিচার-প্রণালীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে আইনগত বিচ্ছেদ থাকার ঘোষণা না করেই বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দান করতে পারে।

● **উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ :**

বিশেষ বিবাহ (সংশোধন) আইন ১৯৭০-এর ২৮নং ধারা অনুসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন।—

(১) এই আইনের বিধান ও নিয়ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন যেখানে উভয়ে নিশ্চিত হবেন এই মর্মে যে—

— বিগত এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে উভয়ে আলাদা আছেন।

— উভয়ে আর কোন ভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে সমর্থ নয়।

— উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য সম্মত হয়েছেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন আদালতে উপস্থাপনের ছয় মাসের আগে বা ১৮ মাসের পর কোন সময়ে উক্ত আবেদন প্রত্যাবর্তন না করলে জেলা আদালত ইতিমধ্যে পারস্পরিক শুনানীর ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনে আদালতের নির্দেশে অনুসন্ধান ও তার পরবর্তী শুনানীর ভিত্তিতে উক্ত আইন মতে অনুষ্ঠিত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রেরিত আবেদনের যথার্থতা যাচাই করে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দান করতে পারে।

৪.৩ ❑ উত্তরাধিকার ও পরম্পরা

উত্তরাধিকার বা পরম্পরার বিষয় আলোচনা করতে গেলেই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)-এর কথা মাথায় চলে আসে। এই আইন প্রবর্তনের পর হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা গেছে। পুরুষ ও মহিলা সমানভাবে অধিকার অর্জন করলেন। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার ভোগ করার বিধান এই আইনে প্রবর্তিত হয়েছে। কয়েকটি বিধান নীচে আলোচনা করা হল :

● **পুরুষদের উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়ম :**

এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে উইল না করে কোন হিন্দু পুরুষ মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হবে—

(ক) প্রথমত, তার পরবর্তী উত্তরাধিকারের উপর বা (1)নং শ্রেণির তালিকা মতে নির্দিষ্ট কোন আত্মীয়ের উপর।

(খ) দ্বিতীয়ত, (I)নং তালিকাভুক্ত শ্রেণির উত্তরাধিকার না থাকলে, (II)নং শ্রেণির তালিকাভূক্ত কোন আত্মীয়ের উপর।

(গ) তৃতীয়ত, (I)নং ও (II)নং তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকার না থাকলে মৃত ব্যক্তির সগোত্রভুক্ত ব্যক্তির উপর।

(ঘ) সবশেষে, সগোত্রভুক্ত ব্যাক্তি না থাকলে মৃত ব্যক্তির কুটুম্ব/জ্ঞাতির উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তাবে।

● **তফসিলে উত্তরাধিকারীদের ক্রমানুসার :**

তফসিলের বর্ণনা অনুসারে (I)নং শ্রেণির উত্তরাধিকার পর্যায়ক্রমে উত্তরাধীকারী হওয়ায় অধিকারী। (II)নং শ্রেণির প্রথমে যার সুযোগ পাওয়ার কথা তিনি প্রথম ও তাঁর অবর্তমানে পরবর্তী ক্রমের কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার অগ্রাধিকার পাবেন। একই রকম দ্বিতীয় ক্রমের কেউ বর্তমান না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় ক্রমের উত্তরাধিকারী হওয়ার অগ্রাধিকার থাকবে এবং এইভাবে ক্রমানুসারে উত্তরাধির হস্তান্তরিত হবে।

● **তফসিলের (I)নং শ্রেণিভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মদ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর :**

নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে তফসিলের (I)নং শ্রেণিভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উইল না করে যাওয়া মৃত ব্যাক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে—

নিয়ম-১ :

উইল না করে যাওয়া মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রী (বিধবা) থাকলে সকল স্ত্রী এক অংশের উত্তরাধিকারী হবেন।

নিয়ম-২ :

মৃত ব্যাক্তির পুত্র কন্যাগণ ও মা বেঁচে থাকলে তিনি সহ সকলে ওই সম্পত্তির এক একটি অংশের উত্তরাধিকারী হবেন।

নিয়ম-৩ :

মৃত ব্যক্তির প্রয়াত পুত্র বা প্র পাতা কন্যার মধ্যে একটি অংশের উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হবে।

নিয়ম-৪ :

উপরোক্ত নিয়ম-৩ অনুসারে মৃত ব্যাক্তির সম্পত্তির হস্তান্তর হবে নিম্নলিখিত ভাগে—

(ক) মৃত ব্যক্তির প্রয়াত পুত্র সন্তানের স্ত্রী বেঁচে থাকলে (একাধিক স্ত্রী থাকলে) এবং পুত্র সন্তানের সন্তানাদি থাকলে প্রত্যেকে ওই অংশের উত্তরাধিকার সমান হারেই পাবেন।

(খ) মৃত ব্যক্তির প্রয়াতা কন্যা সন্তানের জীবিত সন্তানাদি থাকলে তারা প্রত্যেকে ঐ অংশের উত্তরাধিকার সমান হারেই পাবেন।

● **তফসিলের (II)নং শ্রেণিভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর :**

একজন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তফসিলের (II)নং শ্রেণিভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে কোন একটি বিবরণের (entry) ভিত্তিতে সমানভাবে হস্তান্তরিত হবে।

● **মৃত ব্যাক্তির সগোত্রভুক্ত ব্যক্তি বা জ্ঞাতির উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ক্রম :**

সগোত্রভুক্ত ব্যক্তি বা জ্ঞাতিভুক্ত কোন ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ক্রমানুযায়ী উত্তরাধির নিম্নলিখিত নিয়মের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে।

নিয়ম-১ :

দুই উত্তরাধিকারীর মধ্যে যার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই বা সামান্য আছে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

নিয়ম-২ :

যেখানে উভয়ের সমান প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বা কিছুই নেই সেখানে যার ন্যূনতম বা আদৌ নেই তিনিই উত্তরাধিকারের অগ্রাধিকার পাবেন।

নিয়ম-৩ :

যেখানে উভয়ের কারও অগ্রাধিকার নিয়ম-১ বা নিয়ম-২ অনুসারে গ্রাহ্য নয় সেখানে একের পরে অন্যের উত্তরাধিকার পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য হবে।

● **উত্তরাধিকারের ক্রমানুসার গণনার ধাপ :**

(১) স্বগোত্রভুক্ত ব্যক্তি বা জ্ঞাতিভূক্ত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির থেকে উত্তরাধিকারীর প্রতি কতটা বেশি ঘনিষ্টতা বা দূরত্ব ছিল তা যাচাই করেই নির্ধারিত হবে।

(২) ঘনিষ্ঠতার প্রভাব বা দূরত্বের প্রভাব হিসাব করার সঙ্গে বিনাউইলে মৃত ব্যক্তির বিষয়টি বিবেচিত হবে।

(৩) প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে ধাপে ধাপে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা বা দূরত্বের বিষয়টি বর্তায়।

● **হিন্দু মহিলার সম্পত্তি একমাত্র তারই সম্পত্তি :**

(১) এই আইন প্রণয়ণের আগে বা পরে অর্জিত সম্পত্তির মালিকানায় হিন্দু মহিলার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার এবং সেখানে তার মালিকানার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

সম্পত্তির ব্যাখ্যা : এই উপবিধিতে "একজন হিন্দু মহিলার মালিকাধীন সম্পত্তি বলতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যা তিনি অর্জন করেছেন, বা ভাগিদার হয়েছেন বা ভরণপোষণের পরিবর্তে পেয়েছেন বা বকেয়া হিসাবে পেয়েছেন বা যৌতুক পেয়েছেন, অথবা নিজে কিনেছেন বা দক্ষতার বিনিময়ে পেয়েছেন বা সুপারিশ মতো পেয়েছেন বা বিবাহের কারণে পেয়েছেন বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছেন বা অন্য যে কোনো সম্পত্তি যা স্ত্রী ধন হিসাবে তাকে দেওয়া হয়েছে যা এই আইন প্রণয়নের আগে বা পরে ঘটেছে।"

(২) উপধারা (১) এর ব্যাখ্যায় এমন কিছু বলা হয়নি যা কোন যৌতুকের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, উইল করে পাওয়া সম্পদ, দায়রা আদালতের রায়ের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পদের বা সরঞ্জামের প্রাপ্তি বা আদালত কর্তৃক কোনো সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ জারি বা যৌতুক, উইল ও অন্যান্য সরঞ্জামের বা কোন স্বীকৃতির অধীনে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে।

● **হিন্দু মহিলার উত্তরাধিকারী হওয়ার সাধারণ নিয়মাবলী :**

(১) এই আইনে উইল না করে কোন হিন্দু মহিলা গেলে ১৬নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তাবে :

(ক) প্রথমতঃ তার পুত্র ও কন্যা (প্রয়াত পুত্র কন্যার সন্তানাদি) এবং স্বামীর উপর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রয়োজ্য হবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ স্বামীর উত্তরাধিকারীদের উপর।

(গ) তৃতীয়তঃ বাবা ও মায়ের উপর।

(ঘ) চতুর্থতঃ বাবার কোন উত্তরাধিকারীর উপর।

(ঙ) সবশেষে, মায়ের উত্তরাধিকারীর উপর।

(২) উপধারা (১) নং-এ বর্ণিত বিষয় ছাড়াও বিধিত আছে যে—

(ক) কোন হিন্দু মহিলা তার মা অথবা বাবার কাছ থেকে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়ে থাকলে, নিজের সন্তান-সন্ততি না থাকলে (প্রয়াত পুত্র কন্যার কোন সন্তানাদি) অন্য কোন উত্তরাধিকারীর উপর (উপধারা-১ অনুযায়ী) বর্তাবে না, কিন্তু বাবার কোন উত্তরাধিকারির উপর প্রযোজ্য হবে।

— এবং —

(খ) কোন হিন্দু মহিলা তার স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেলে, নিজের সন্তান-সন্ততি না থাকলে (প্রয়াত কন্যা-পুত্রের সন্তানাদি) উপধারা (১) নং অনুসারে অন্য কোন উত্তরাধিকারের উপর বর্তাবে না, স্বামীর উত্তরাধিকারী-র উপর প্রযোজ্য হবে।

● একজন হিন্দু মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টনের ক্রমানুসার ও রীতি :

হিন্দু মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টনের ক্রমানুসার এই আইনের ১৫ নং ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত উপায়ে তার উত্তরাধিকারীদের উপর প্রযোজ্য হবে :

নিয়ম-১ :

(১৫) নং ধারার উপধারা (১) অনুসারে এক বিবরণীতে (entry) বর্ণিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অগ্নাধিকারের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হবে।

নিয়ম-২ :

প্রয়াত মহিলার পুত্র বা কন্যা বা তাদের প্রয়াণের পর তাদের সন্তান জীবিত থাকলে এবং প্রয়াত হিন্দু মহিলার মৃত্যুর আগে বেঁচে থাকলে, তারা ওই সম্পত্তির একটি অংশের উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী।

নিয়ম-৩ :

হিন্দু মহিলার উইল না করে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টনের এই আইনের (১) নং ধারার (খ), (ঘ), (ঙ) উপধারা ও ১৫ নং ধারার (১) ও (২) নং ধারার প্রত্যেক নিয়ম একইরকম ক্রমানুসারে পিতা, মাতা বা স্বামীর যে ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হবে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারের উপরে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়টি প্রযুক্ত হবে।

● মরুমাককাট্টায়ম (Marumakkattayam) এবং আলিয়াশান্তনা (Aliyasantana) আইনের অনুশাসনাধীন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বিধান :

মরুমাক্কাট্টায়ম ও আলিয়াশান্তনা আইনের অনুশাসনাধীন ব্যক্তিদের জন্য এই আইনের ৮, ১০, ১৫, ২৩নং ধারার বিধান অনুসারে যদি এই আইন পাশ হয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে—

(১) আইনের ৮নং ধারার উপবাক্য (সি) ও (ডি) এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিকল্প ব্যবস্থা প্রযুক্ত :

(সি) উপরোক্ত দুইটি আইনগত বিধান অনুসারে কোন উত্তরাধিকার না থাকলে, এই বিধানে তার সগোত্রভুক্ত কোন ব্যক্তি বা জ্ঞাতিভূক্ত কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে।

(২) ১৫নং ধারার উপধারা (১) এর উপবাক্য (এ) ও (ই) এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিকল্প ব্যবস্থা প্রযোজ্যঃ

(এ) প্রথমতঃ তার পুত্র ও কন্যা (প্রয়াত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি) এবং তার মা।

(বি) দ্বিতীয়তঃ তার স্বামী বা বাবা।

(সি) তৃতীয়তঃ মায়ের উত্তরাধিকারীদের

(ডি) চতুর্থতঃ বাবার উত্তরাধিকারীদের

(ই) সবশেষে, স্বামীর উত্তরাধিকারীদের

(৩) ১৫ নং ধারার উপধারা (২) এবং উপবাক্য (এ) বাদ নেওয়া হয়েছে।

(৪) ২৩ নং ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে।

❒ **উত্তরাধিকারের কিছু সাধারণ বিধান :**

- **বৈমাতৃক অপেক্ষা কুলীন (পিতা মাতা উভয় পক্ষ তুষ্ট) অগ্রাধিকার :**

  পিতা ও মাতার উভয় পক্ষতুষ্ট ব্যক্তি/কুলীন সন্তানের উইল না করে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে বৈমাত্রিক সন্তানের চাইতে বেশী অগ্রাধিকারগণ্য হবে।

- **দুই বা ততোধিক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উত্তরাধিকারী হওয়ার পন্থা :**

  উইল না করে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দুই বা ততোধিক উত্তরাধিকারী থাকলে তাদের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর নিম্নলিখিতভাবে হবে—

  (ক) এই আইনে অন্যথা ব্যাখ্যা না থাকলে যেমনভাবে সম্পত্তি রয়েছে তেমনভাবেই মাথাপিছু হিসাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী প্রযোজ্য হবে কিন্তু তা টুকরো টুকরো/কাটা ছেঁড়া করে হবে না।

  (খ) একজন সাধারণ দখলদার হিসাবেই প্রযোজ্য হবে, যৌথদখলদার হিসাবে প্রযোজ্য হবে না।

- **গর্ভস্থ্য শিশুর অধিকার :**

  উইল না করে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন বা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে গর্ভস্থ্য শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মালে, তার উক্ত মৃত মাতা/পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে এবং বিধিত আছে যে উইল না করে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর দিন থেকেই ওই নবজাত সন্তানের উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্ত হবে।

- **পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিবেচনা :**

  এমন ঘটনা যদি ঘটে যেখানে একসঙ্গো পরপর দুজন কোন অপ্রীতিকর ঘটনায় মারা যান, তাহলে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোন বিচার বা বিবেচনা না করেই একথা গ্রহণযোগ্য যে বয়স্ক জনের পরেই কনিষ্ঠজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং সেইভাবে উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হবে।

- **বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পত্তি অর্জনের অগ্রাধিকার বিষয়ক অধিকার :**

  (১) এই আইন চালু হওয়ার আগে সম্পত্তির উইল না করে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির বা তার কোন ব্যবস্থা থাকলে তার স্বার্থে (একক বা যৌথ ব্যবসা—যাই হোক না কেন) তফসিলের

(১) নং শ্রেণিতে উল্লিখিত নিয়মানুসারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপর বর্তানোর অগ্রাধিকারের বিষয়ে অধিকার বলবৎ বা প্রযোজ্য হয়েছে।

(২) উইল না করে মৃত্যু ঘটলে, তার সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন পূর্ব চুক্তি না থাকলে, আদালত কর্তৃক কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হবে। এই ক্ষেত্রে কোন আবেদনকারী আদালতের নির্ধারণকরা সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে উত্তরাধিকারী হিসাবে তা গ্রহণ না করলে আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে।

ব্যাখ্যা : এখানে “আদালত” বলতে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন আদালত যেখানে উত্তরাধিকারের হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি বা ব্যবসা বর্তমান, বা রাজ্য সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট আদালতকেই বোঝানো হয়েছে।

- **বসত বাড়ির উত্তরাধিকার হস্তান্তরযোগ্য বিশেষ বিধান :**

যেখানে হিন্দু ব্যক্তি তার বাসস্থানের উত্তরাধিকার হস্তান্তর উইল না করেই মারা গেছেন এবং তার পরিবারের পুরুষ বা মহিলা (তফসিলের ১ নং শ্রেণী অনুসারে) সহ সকলে একসঙ্গো একটি বসতবাড়িতে বসবাস করছেন সেখানে অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই বিধিত আছে যে ওই উত্তরাধিকারী মহিলা হলে তার ওই বসতবাড়ির ভাগ দাবি করার কোন অধিকার গ্রাহ্য হবে না যতক্ষণ না ওই উত্তরাধিকারীদের পুরুষ উত্তরাধিকারী ওই বসতবাড়ী ভাগ করার পথ বেছে নেয়। ওই মহিলা উত্তরাধিকারী ওই বসত বাড়িতে বসবাস করার অধিকারী। এই প্রসঙ্গো উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির কন্যা হন এবং অবিবাহিতা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না হন তবেই কেবলমাত্র বসবাস করার অধিকারী হবেন।

- **পুনরায় বিবাহিতা কোন কোন বিধবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারেন না :**

উত্তরাধিকারী কেউ মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী বা প্রয়াত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা তার প্রয়াত প্রপুত্রের বিধবা স্ত্রী হলে এবং তিনি বা তাদের মধ্যে কোন বিধবা মহিলা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে এবং ওই দিনে উত্তরাধিকার হস্তান্তরের বিষয় উত্থাপিত হলে তা ওই পুনরায় বিবাহিতা বিধবা অর্জনের অধিকারী হবেন না।

- **খুনীদের উত্তরাধিকার অর্জনে অযোগ্যতা :**

কোনো ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য অপর ব্যক্তিকে খুন করলে বা খুন করার জন্য প্ররোচনা দিলে, উক্ত খুন হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনের কোন সুযোগ ওই ব্যক্তি (খুনী) কখনো পাবেন না।

- **ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারের অযোগ্যতা :**

এই চালু হওয়ার আগে বা পরে কোন ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছেন বা ধর্মান্তর হয়েছেন এমনটা ঘটলে ওই ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বা ধর্মত্যাগীর পুত্র বা কন্যা (ধর্মান্তরের পরে জন্মালে) ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এমনকি যে কোন হিন্দু আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনেও তাদের কোন অধিকার থাকবে না।

- **উত্তরাধিকার অর্জনে অযোগ্য হওয়ার পর উত্তরাধিকারী :**

যদি কোন ব্যক্তি এই আইন প্রণয়নের ফলে উত্তরাধিকার অর্জনে অযোগ বলে বিবেচিত হন, সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে ওই ব্যক্তি তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে উইল না করেই মারা গেছেন।

- **অসুখ, অক্ষমতা প্রভৃতি অযোগ্যতা নয় :**
  কোন ব্যক্তিকে অসুস্থতা, অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না, এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্যকোন কারণ ব্যাতীত তিনি স্বাভাবিক সুযোগের অধিকারী।
- **কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে :**
  যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী (এই অনুযায়ী) কেউ না থাকলে, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সরকারের উপর ন্যাস্ত হবে। সেক্ষেত্রে সরকার ওই মৃতব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার অর্জন ও তৎসহ যাবতীয় দ্বায়-দায়িত্বের জন্য অঙ্গীকার বন্ধ থাকবে।

৪.৩ ❑ পতি/পত্নী ও শিশুদের ভরণপোষণ :

বিধিসম্মত বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ ও আইনগত পৃথকাবস্থার প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্ত্রী/পত্নী ও শিশুদের ভরণপোষণের জন্য স্বামী দায়বন্ধ ও বাধ্য থাকে। এই দায়বন্ধতা ও বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন ব্যাক্তি আইন ও বিচার কার্যাবলীর রীতি নীতিতে বিধিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইনে তার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কয়েকটির এক ঝলক হল নিম্নরূপ :

- **অপরাধীর বিচারবিধি ১৯৭৩ এর ১২৫ ধারা :**
  এই বিধির উল্লিখিত (১২৫) ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কোন পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির প্রতি দায়বন্ধ থাকবেন তা নয়, পাশাপাশি তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্ত্রী/স্ত্রীগণ, অক্ষম পিতা-মাতাকেও ভরণপোষণের জন্য তিনি দায়বন্ধ থাকবেন। এক্ষেত্রে ভরণপোষণের দাবি করার মতো স্বামীর উপায় বিশেষ বিবেচনাধীন থাকবে। ব্যতিক্রম কেবল কোন মহিলা যদি ইতিমধ্যে অন্যকোন আইন মতে ভরণপোষণ পেয়ে থাকলে বা অন্য সুরক্ষা বিধানের মাধ্যমে তার ভরণপোষণ ব্যবস্থা চালু থাকলে তিনি আর কোনো ভরণপোষণ পাওয়ার দাবিদার হতে পারবেন না।
- **হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন-১৯৫৬ :**

(১) এই আইন অনুসারে কোন হিন্দু বিবাহিত মহিলা যদি নিজের চেষ্টায় নিজের ভরণপোষণের অসামর্থ্য হল কেবলমাত্র তখন তার স্বামীর কাছে তার ভরণপোষণের জন্য দাবি করতে পারেন। এমনকি যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে স্ত্রী দূরে থাকেন সেক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত কারণে ভরণপোষণ চাইতে পারেন—

- স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হলে।
- স্বামীর অত্যাচারে নির্মাতিত হলে।
- স্বামীর কুষ্ঠ বা অন্য ভয়াবহ অসুখ থাকলে।
- বহুপত্নিক স্বামী হলে।
- পরকিয়া সম্পর্কে আবদ্ধ হলে।
- অন্য ধর্মে স্বামী ধর্মান্তরিত হলে।
  [প্রসঙ্গাত উল্লেখ যে, কোন বিবাহিতা স্ত্রী পর-পুরুষের সঙ্গো অবৈধ সম্পর্ক রাখলে, ধর্মান্তরিত হলে, পুনরায় বিবাহ করলে, তিনি কোন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন না।]

(২) উক্ত হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনানুসারে শিশুরা, বয়স্ক মানুষজন ও অক্ষম অভিভাবকবৃন্দ তাদের নিজেদের রোজগার বা সম্পত্তির উৎস থেকে আয় দিয়ে নিজেদের ব্যায়ভার বহনে অসামর্থ্য হলে তারাও ভরণপোষণ পাওয়ার দাবি করতে পারে/পারেন—

- এখানে শিশুদের বলতে বৈধ ও অবৈধ শিশু যারা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী।
- আবার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অভিভাবকদের তাদের (পুত্র ও কন্যা) সন্তান সন্ততিদের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

(৩) উক্ত হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণের আইন (১৯৫৬) অনুসারে হিন্দু বিধবা তার নিজের আয় বা সম্পত্তি থেকে আয়ের দ্বারা নিজের ভরণপোষণ করতে অসামর্থ্য হলে তিনি নিচের ব্যক্তিদের কাছে ভরণপোষণ দাবি করবেন—

- তার অভিভাবকের কাছে বা স্বামীর সম্পত্তি থেকে।
- তার পুত্র বা কন্যার কাছে বা তাদের সম্পত্তি থেকে।
- উক্ত দুই পক্ষের অনুপস্থিতিতে শ্বশুরের কাছে বা তার সম্পত্তি থেকে।

[যদি তিনি পুনরায় বিবাহ করেন তাহলে শ্বশুরের কাছ থেকে আর ভরণপোষণ পাবেন না।]

৪.৫ ❑ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। Bare Act—'The Hindu Marriage Act of 1955' Hindu Publication House, Allahabad, U.P., India.

২। Bare Act—'The Hindu Succession Act of 1956 Clarion low Books, New Delhi, India.

৩। Bare Act—'The Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956' Hindu Publication House, Allahabad, U.P., India.

৪.৬ ❑ অনুশীলনী

১। ১৯৫৬ প্রবর্তিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

২। হিন্দু বিবাহ আইন—১৯৫৫-এর বিধান অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের কারণগুলো কী কী?

৩। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের তফশিলভুক্ত (১)নং ও (২)নং শ্রেণির উত্তরাধিকার কারা, তা বর্ণনা করুন।

একক ৫ ❑ মহিলা ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষার আইন

গঠন

৫.১ ভূমিকা

৫.২ কিশোর অপরাধীর বিচার (য- ও সুরক্ষা) আইন ২০০০

৫.২.১ ২০০০-এর আইন-৫৬

৫.২.২ রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ

৫.২.৩ সেবার সুযোগ

৫.২.৪ উপযুক্ত শর্তাবলি

৫.২.৫ ধাপে ধাপে অগ্রসর

৫.২.৬ অপরাধগ্রস্ত শিশু

৫.২.৭ আবেদন ফর্মের ধরন

৫.২.৮ নথিপত্রের পরীক্ষা

৫.২.৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণালী

৫.২.১০ নির্দিষ্ট সময় সারণি

৫.২.১১ নির্দিষ্ট ফি

৫.২.১২ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ

৫.২.১৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

৫.২.১৪ এই আইন রূপায়ণের কৌশল এবং উদ্দেশ্য

৫.২.১৫ পশ্চিমবঙ্গে এই আইন রূপায়ণের বর্তমান অবস্থা

৫.২.১৬ আইনের পর্যালোচনা

৫.২.১৭ সংশোধন

৫.৩ শিশু শ্রমিক আইন (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) ১৯৮৬

৫.৩.১ ১৯৮৬ সালের আইন-৬১

৫.৩.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপূর্ণ বিভাগ/দপ্তর

৫.৩.৩ শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ

৫.৩.৪ নিয়ন্ত্রণমূলক বিধান

৫.৩.৫ প্রশাসনিক সরঞ্জাম

৫.৩.৬ এই আইনের উদ্দেশ্য

৫.৩.৭ সাজা

৫.৩.৮ আইনের পর্যালোচনা ও প্রতিস্থাপনমূলক সরঞ্জাম

৫.৩.৯ সংশোধন

৫.৪ পণ নিবারণ আইন ১৯৬১

৫.৪.১ ১৯৬১ সালের আইন-২৮ (সংশোধন হয়—১৯৮৪ এবং ১৯৮৬-তে)

৫.৪.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ

৫.৪.৩ প্রশাসনিক সরঞ্জাম

৫.৪.৪ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

৫.৪.৫ পশ্চিমবঙ্গো এই আইন প্রণয়নের বর্তমান অবস্থা

৫.৪.৬ আইনের পর্যালোচনা

৫.৪.৭ সংশোধন

৫.৫ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯

৫.৫.১ ১৯২৯-এর আইন-১৯

৫.৫.২ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর

৫.৫.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

৫.৫.৪ আইনের পর্যালোচনা

৫.৫.৫ সংশোধন

৫.৬ সমান মজুরি আইন ১৯৭৬

৫.৬.১ ১৯৭৬ সালের আইন-২৫

৫.৬.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/দপ্তর

৫.৬.৩ আইন বলবৎ করণ

৫.৬.৪ সাজা

৫.৬.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

৫.৬.৬ আইনের পর্যালোচনা

৫.৬.৭ সংশোধন

৫.৭ প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১

৫.৭.১ ১৯৬১ সালের আইন-৫৩

৫.৭.২ রাজ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/বিভাগ

৫.৭.৩ প্রয়োগের ক্ষেত্র

৫.৭.৪ উল্লেখযোগ্য বিধান

৫.৭.৫ প্রসূতিকালীন সুবিধা বাজেয়াপ্ত করেন

৫.৭.৬ সাজা

৫.৭.৭ আইনের পর্যালোচনা

৫.৭.৮ সংশোধন

৫.৮ গর্ভপাত আইন ১৯৭১

৫.৮.১ ১৯৭১-এর আইন-৩৪, যা সংশোধিত হয় ২০০২ সালের নং ৬৪ হিসাবে

৫.৮.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ

৫.৮.৩ এম.টি.পি. আইন, এম.টি.পি. নিয়ম ও এম.টি.পি. নিয়ন্ত্রণ

৫.৮.৪ কখন গর্ভপাত করা যাবে

৫.৮.৫ গর্ভাবস্থার মেয়াদ

৫.৮.৬ গর্ভপাতের কারণ

৫.৮.৭ বৈধ আইনগত মতামত

৫.৮.৮ কোথায় গর্ভপাত করানো যেতে পারে

৫.৮.৯ সাজা

৫.৮.১০ আইনের পর্যালোচনা

৫.৮.১১ সংশোধন

৫.৯ উপসংহার

৫.১০ সারসংক্ষেপ

৫.১১ অনুশীলনী

৫.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

যুগ যুগ ধরে দেশের মহিলা ও শিশুদের একটি বিরাট অংশ এখনও অত্যন্ত দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অবস্থার শিকার। যদিও আমাদের দেশের সংবিধান নারী ও পুরুষভেদে সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা থাকার বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ কিছু ধারায় সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য জায়গা ব্যবহারে, সরকারের অধীনে কাজ করা, কাজের জন্য আবেদন করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, মতামত প্রকাশ করা, অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার, হাজতে আটকে রাখা, ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ১৪ বছরের নীচে শিশুদের কারখানার শ্রমিক, খনি ও বিপজ্জনক কাজে লাগানো যাবে না সে বিষয়েও সংবিধানের উপযুক্ত বিধান বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বহু দেশ মহিলা ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় উপযুক্ত আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে

লিঙ্গা বৈষম্যের মতো বিষয় দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার সুরক্ষার যেসব ক্ষেত্র বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় তা হল—

- সুরক্ষা
- বেঁচে থাকা
- উন্নয়ন
- অংশগ্রহণ

উপরোক্ত বিষয়ে ১৯৪৫ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে এবং ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাতে বেশিরভাগ দেশ সরব হয়। তখন থেকে সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক সরঞ্জাম প্রযুক্ত হয় ও যাবতীয় বৈষম্যমূলক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। ১৯৬৬ সালে গৃহীত রাজনৈতিক ও দেওয়ানি অধিকার সম্বলিত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে উভয় লিঙ্গের প্রতি সমান সুরক্ষার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। মহিলাদের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। চতুর্থ বেজিং কন্‌ফারেন্স-এ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের জন্য আরও একবার লিঙ্গা সাম্য বিধানকে অন্যতম মৌলিক শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছতা দিয়েছে "মহিলাদের উপর সমস্ত রকমের বৈষম্য দূরীকরণের সম্মেলন ১৯৮১"। যেখানে পুরুষদের সমান সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি উঠেছে। ওই সম্মেলনের মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "দেশের সার্বিক ও সম্পূর্ণ বিকাশে, বিশ্বের সব মানুষের কল্যাণে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গো সমান হারে মহিলাদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ খুবই জরুরি।"

তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে "শিশুদের অধিকার বিষয়ক সম্মেলন"-এর আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর কিশোরীদের অধিকার সুরক্ষার হাতিয়ার তুলে ধরা হয়। এই সম্মেলনের (Convention on the Right of the Children) (১) নং অনুচ্ছেদে একটি শিশু বলতে প্রত্যেক মানুষ যার বয়স ১৮ বছর (যা কিশোর কিশোরীদের নিয়ে) পূর্ণ হয়নি এবং যদি না কোন আইনানুসারে প্রযুক্ত হয় তাহলে বেশিরভাগ তার মধ্যে পড়বে।

ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে মুখবন্ধে, মৌলিক অধিকার-কর্তব্যের অধ্যায়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি ও অন্যান্য ধারায় বিভাজনমূলক ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠাসুলভ বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৪ নং ধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার সমান সুযোগ ও সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৫ নং ধারায় জাতি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা ও শ্রেণী ভেদে যে-কোনো ধরনের বৈষম্য নিবারণের কথা বলা হয়েছে। ১৫ (৩) নং ধারায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে মহিলাদের স্বার্থে বৈষম্যমূলক আচরণের স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে, ১৬ নং ধারায় সরকারি, ক্ষেত্রে কাজে যুক্ত হওয়ার কাজের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আবার, ৩৯ (এ) ধারায় রাষ্ট্রকে তার সকল নাগরিকের জন্য সমান জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা রচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩৯ (সি) ধারায় প্রত্যেকের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ৪২ নং ধারায় রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সকলের জন্য উপযুক্ত ও মানবিকতা সমৃদ্ধ কাজের পরিবেশ ও প্রসূতিকালীন সুবিধাদানের বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বোপরি রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক কর্তব্য [ধারা

৫১-এ (ই)] প্রবর্তন এবং মহিলাদের প্রতি কোন রকমের মানহানিকর বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার কোন আচরণ না করার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন রকমের বিধান, ধারা ও উপধারায় মহিলা ও শিশুদের প্রতি সমান সুযোগ-সুবিধা দানের বিষয়গুলোর সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় মহিলাদের ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দানের বন্দোবস্ত করেছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পণপ্রথা নিবারণ, ধর্ষণ ও অত্যাচার প্রতিরোধ, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, নানান ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলাদের ও শিশুদের নানান অধিকার, সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা দানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের একটি বিরাট অংশ তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

৫.২ ❑ কিশোর অপরাধীর বিচার (য- ও সুরক্ষা) আইন ২০০০

এই আইনের অধীন সমস্যাগ্রস্ত শিশুর য- ও সুরক্ষার আইনগত বিষয়ের পাশাপাশি শিশু অপরাধীর বিচার, তাদের সার্বিক বিকাশ ও পরিচর্যার প্রতি উপযুক্ত নজরদান, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত বিচার ব্যবস্থার ধারায় শিশুর সহযোগী উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে প্রতিস্থাপনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত রাখার মতো বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গো তাদের প্রতিষ্ঠানগত বিশেষ পরিচর্যার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.২.১ ২০০০-এর আইন-৫৬

কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) বিল সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদনের পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ৩০শে ডিসেম্বর ২০০০ সালে। বিধিবদ্ধ বইতে দি জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট ২০০০ (৫৬ অফ্ ২০০০)

৫.২.২ রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ

রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর এই বিষয়ের যাবতীয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ।

৫.২.৩ সেবার সুযোগ

এই আইনে অবহেলিত ও দুঃস্থ শিশু অপরাধীর য- ও সুরক্ষার বিষয়ে উল্লিখিত বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

৫.২.৪ উপযুক্ত শর্তাবলি

কিশোর অপরাধীর (শিশুর য- ও সুরক্ষা) আইনে শিশু বলতে ১৮ বছর বয়সের নীচে সমস্ত শিশুর (ছেলে ও মেয়ে উভয়) ক্ষেত্রেই বোঝানো হয়েছে।

৫.২.৫ ধাপে ধাপে অগ্রসর

(১) অবহেলিত ও দুঃস্থ শিশুকে হোমে ভর্তি করানো যেখানে তিনমাসের মধ্যে তার অপরাধের বিচার সম্পন্ন হবে এবং শিশুকে হোমে পাঠানো হবে। থাকা, খাওয়া ও ঔষধপত্রের খরচ সম্পূর্ণভাবেই যুক্ত।

(২) কিশোর অপরাধীদের হোমে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত য- ও পরিচর্যার পাশাপাশি তার বিদ্যাচর্চা সম্পূর্ণ হবে।

(৩) যদি হোমে থেকে তার পড়াশোনা সম্পূর্ণ না হয় তাহলে তাকে আফ্‌টার কেয়ার হোম (After care Home)-এ পাঠানো হবে। সেখানে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত সে থাকতে পারবে, তার পরে দরকার হলে হোমে পাঠানো হবে।

৫.২.৬ অপরাধগ্রস্ত শিশু

কিশোর অপরাধীর বিচার পর্ষদ (Jwrenile Justice Board)-এ অপরাধগ্রস্ত শিশুদের ভর্তি করানো এবং বিশেষ হোমে (Special Home) তাদের রাখার বন্দোবস্ত করা হয়।

৫.২.৭ আবেদন ফর্মের ধরন

কোন নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম ছাড়াই শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে যে-কেউ আবেদন করতে পারেন, দুঃস্থ ও অবহেলিত শিশুকে উপস্থাপন করতে পারেন যাতে তাদের হোমে ভর্তি করানো যায়।

৫.২.৮ নথিপত্রের পরীক্ষা

১৯৭৩ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু কল্যাণ কমিটি (Child Welfare Committee) কোন নথিপত্র চেক করা বা পরীক্ষা করার নির্দেশ জারি করেনি।

৫.২.৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণালী

অবহেলিত বা দুঃস্থ শিশুকে ভর্তি করানো বা ছাড়া দেওয়ার সময় শিশু কল্যাণ কমিটি আগাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা (verification) করার ক্ষমতাসীন নয়।

৫.২.১০ নির্দিষ্ট সময় সারণি

তিন মাসের মধ্যে শিশু কল্যাণ কমিটি এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করবে।

৫.২.১১ নির্দিষ্ট ফি

কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) আইনের বিধান অনুসারে দুঃস্থ ও অবহেলিত শিশুর ভর্তি, পরিচর্যা ও সামাজিকীকরণের জন্য কোন খরচ দিতে হয় না।

৫.২.১২ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ

- দুঃস্থ ও অবহেলিত শিশুদের জন্য—শিশু কল্যাণ কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার অনুমোদন কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।
- অপরাধগ্রস্ত শিশুদের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার শিশু অপরাধী বিচার পর্ষদকেই অনুমোদন কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫.২.১৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা :

এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার শিশু কল্যাণ কমিটি ও শিশু অপরাধী বিচার পর্ষদ যাবতীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য দায়বন্ধ হবে।

৫.২.১৪ এই আইন রূপায়ণের কৌশল এবং উদ্দেশ্য :

কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) আইনে (২০০০) কেবলমাত্র শিশুর য- ও সুরক্ষার বিধান প্রবর্তিত হয়নি। আইনের সঙ্গো তাদের যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না গিয়ে খুব সহজ সরলভাবে বিচার বা রায়দানের বিধানও প্রবর্তিত হয়েছে। এই আইন রূপায়ণের জন্য মন্ত্রণালয় 'কিশোর অপরাধীর বিচার বিষয়ক কর্মসূচি' গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- কোনো পরিস্থিতিতে যাতে শিশু অপরাধীকে সাধারণ আইনের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারে যাতে না পাঠাতে হয় তার জন্য কিশোর অপরাধীর বিচার আইন মোতাবেক পরিকাঠামো ও সেবার খরচ বহন করতে রাজ্য সরকারকে সহায়তা দান করা।
- কিশোর অপরাধীর বিচার বিষয়ক যাবতীয় সেবার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা।
- সামাজিকভাবে সমন্বয়হীন অবস্থার পরিবর্তন ও কিশোর অপরাধীকে সমাজে প্রতিস্থাপন করানোর প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।
- অন্যান্য দুঃস্থ শিশুর থেকেও বেশি দুঃস্থ ও অবহেলিত ও সাধারণ আইনের নানা সমস্যায় জর্জরিত শিশুর য- ও সুরক্ষার কাজে সমষ্টি ও সমষ্টিবন্ধ সংগঠনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

এই কর্মসূচির অধীন কিশোর অপরাধীর য- ও সুরক্ষার জন্য ও সাধারণ আইনের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতির জন্য বিভিন্ন স্তরে কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা মেরামতির কাজে রাজ্য সরকারকে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ৫০% সহায়তা মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

৫.২.১৫ পশ্চিমবঙ্গো এই আইন রূপায়ণের বর্তমান অবস্থা :

(১) রাজ্যের সব জেলাগুলোর জন্য দুটো কিশোর অপরাধীর বিচার পর্ষদ স্থাপিত হয়েছে।
(২) সমস্ত জেলায় শিশু কল্যাণ কমিটি (Child welfare Committee) গড়ে তোলা হয়েছে।
(৩) সরকারি পরিচালনায় ৫টি পর্যবেক্ষণ হোম স্থাপিত হয়েছে।
(৪) সরকারি পরিচালনায় ৫টি বিশেষ হোমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৫) শিশুদের ১৩টি হোম স্থাপন ও সরকারি পরিচালনায় বর্তমান।
(৬) ২১টি শেল্টার হোম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত।
(৭) ৮টি আফ্‌টার কেয়ার হোম বর্তমানে চলছে।
(৮) সরকারের বিবেচনাধীন আইনগত নিয়মনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫.২.১৬ আইনের পর্যালোচনা :

শিশুদের য- ও সুরক্ষা বিধানের প্রাথমিক আইন হিসাবে কিশোর অপরাধীর বিচার আইন প্রবর্তিত হয়। অবহেলিত ও দুঃস্থ শিশুর য-, সুরক্ষা ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ের উপযুক্ত বিচার ও রায়দানের বিশেষ বন্দোবস্ত করতে এই আইন প্রবর্তন করা হয়।

অতীতের কিশোর অপরাধীর বিচার আইন (১৯৮৬)-এর পরিবর্তে কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুদের য- ও সুরক্ষার) আইন ২০০০ চালু করা হয়। য- ও পরিচর্যার অভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিশুর উপযুক্ত য-, সুরক্ষা ও সমাজে সঠিকভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই আইনে আরও বেশি শিশু কেন্দ্রিক, নানান ধরনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। কিশোর অপরাধীদের ও অবহেলিত শিশুদের মধ্যে সুস্পষ্ট তফাত এই আইনে করা হয়েছে। এছাড়া এর আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ—

- এখানে বালক-বালিকার বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত একটাই মানদণ্ড প্রচলিত হয়েছে।
- এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কিশোর অপরাধীর মামলা ৩-৪ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- একটি জেলার জন্য বা কয়েকটি জেলাকে একত্রে নিয়ে তার জন্য কিশোর অপরাধীর বিচার পর্যদ (যা অতীতে জুভেনাইল কোর্ট নামে অভিহিত ছিল) ও শিশু কল্যাণ কমিটি (অতীতে যা কিশোর অপরাধী কল্যাণ পর্যদ নামে পরিচিত ছিল) স্থাপন করা এই আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- শিশুদের পুনর্বাসন ও পুনরায় সামাজিক সংহতি প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই আইনে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দত্তক, পালিত, বিধিমত প্রতিশ্রুতি (ধরম পিতা-মাতা) ও আফ্‌টার কেয়ারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই আইনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বসবাসকারী যে-কোনো সমষ্টিবাসী শিশুকে দত্তক নিতে পারবে বলে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একক অভিভাবক বা অভিভাবকদের উভয়েই শিশুদের দত্তক নিতে রাজি হলে কিশোর অপরাধী বিচার পর্যদ সেই দত্তক দানের অনুমোদন দেওয়ার অধিকারী বলে এই আইনে বলা হয়েছে। এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততি থাকলেও বাবা-মা এই শিশুদের দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন।
- এই আইনে বলা হয়েছে কিশোর অপরাধী এবং অপরাধী নয় এমন কিশোরের একসঙ্গে দেওয়ানি কার্যাবলি চলতে পারে না।

২০০০ সালের কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) আইন অনুসারে রাজ্য সরকার কিশোর অপরাধী বিধি ২০০২ প্রবর্তন করেছে। এমনকি রাজ্য সরকার শিশু কল্যাণ সমিতি (Child Welfare Committee) ও কিশোর অপরাধীর বিচার পর্যদ (Juvenile Justice Board) প্রত্যেক জেলায় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিশোর অপরাধীর বিচার আইনে প্রদত্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের সুনিশ্চিত করা যাতে তাদের সাধারণ কারাগারে না প্রবেশ করানো হয়। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কিশোর অপরাধীর সঙ্গো সমাজের সুষ্ঠু বোঝাপড়া, সমাজে প্রতিস্থাপন ও কোথাও কিশোর অপরাধী নানান ধরনের ঝুটঝামেলার শিকার হলে তা নিষ্পত্তি সাধনের মাধ্যমে তার সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা বিষয়ে উপযুক্ত নজর দেওয়া।

কিশোর অপরাধীর কল্যাণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে পর্যবেক্ষণ হোম (Observation Home) তৈরি ও মেরামতির জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এমনকি যে সমস্ত শিশুর কোন না কোন সমস্যায় পড়তে হয়, তাদের জন্য বিশেষ হোম, আফ্টার কেয়ার ইন্‌স্টিটিউশন-এর পাশাপাশি যাবতীয় য- ও সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্যও রাজ্য সরকার আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সেইসব হোম, সুরক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও মেরামতির খরচ ৫০ : ৫০ হারে বহন করা হয়ে থাকে।

৫.২.১৭ সংশোধন :

সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সত্যনারায়ণ জাতিয়া ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল লোকসভায় কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) সংশোধন বিল-২০০৩ পেশ করেন। ২০০০ সালের কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) আইনের ৩২,৩৩, ৫৬, ৫৭ ও ৫৯ নং ধারার সংশোধনের কথা এখানে বলা হয়। দিল্লি উচ্চ আদালতের জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই আইনের বেশ কিছু বিষয় পুনর্বিবেচনার দাবি ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিশুকে শিশু কল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার সময়কাল কমানোর কথা ভাবা হয়। যাত্রাপথের সময় ব্যতীত কোন সময় ব্যয় না করেই কোন অবহেলিত বা দুঃস্থ শিশুকে তৎক্ষণাৎ শিশু কল্যাণ কমিটির হাতে অর্পণ করার ব্যবস্থা করতে যা সর্বাধিক ২৪ ঘন্টার মধ্যে হবে বলে বিধান প্রবর্তন করা হয়। প্রশিক্ষণহীন কোন 'পুলিশ অফিসারের জিজ্ঞাসাবাদ বা জুভেনাইল ইউনিটের' জিজ্ঞাসাবাদের পরিবর্তে 'যে কোন বিশেষ জুভেনাইল ইউনিটের সদস্য'-এর জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কথা বলা হয়। বিশেষ কোন অনুষ্ঠান, পরীক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি কারণে শিশুদের ছুটির মেয়াদ-এর ক্ষেত্রে শিথিলতা দেওয়ার কথা বলা হয়।

৫.৩ ❑ শিশু শ্রমিক (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬

শিশুশ্রম বন্ধ করা ও অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজে যুক্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করতে অন্যান্য আইনের পাশাপাশি ১৯৮৬ সালে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। শিশুদের জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, যা শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গো যুক্ত এবং উপযুক্ত কাজের শর্ত সুনিশ্চিত করতে এই আইন পাশ করা হয়।

৫.৩.১ ১৯৮৬ সালের আইন-৬১

গুরুপদস্বামী কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৮৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শিশু শ্রমিক (প্রতিরোধ

ও নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন বিশেষ বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের কাজ করানো প্রতিরোধ করা এবং তাদের উপযুক্ত কাজের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। শিশু শ্রমিক কারিগরি উপদেষ্টা পর্ষদ (Child Labour Technical Advisory Commitee)-এর পরামর্শ অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রের তালিকা ও কর্মপ্রক্রিয়ার বিস্তৃতি বিষয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

উপরোক্ত ধারায় সামঞ্জস্য রেখে ১৯৮৭ সালের জাতীয় শিশুশ্রমনীতি নির্ধারণ করা হয়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত শিশুদের সমাজে প্রতিস্থাপন ও তাদের কর্মপ্রক্রিয়া যাতে আর না সম্পাদিত হয় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া।

৫.৩.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপূর্ণ বিভাগ/দপ্তর

রাজ্যের শ্রম দপ্তর এই বিষয়ে দেখাশোনার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৫.৩.৩ শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ

১৪ বছর বয়সের কমবয়সী শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ ও তাদের কাজে যুক্ত করানোর উপযুক্ত শর্তাবলি আরোপ করে শিশুদের শ্রমদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণত ১৩টি ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং ৫১টি কর্মপ্রক্রিয়ায় শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫.৩.৪ নিয়ন্ত্রণমূলক বিধান

এই আইন কোন শিশুকে সন্ধ্যে ৭টার পর সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাজ করার বা কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দেয়নি। ৩ ঘণ্টা একটানা কাজের পর ১ ঘণ্টার বিশ্রাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত শিশুদের সপ্তাহে একটি পূর্ণদিন ছুটি দেওয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫.৩.৫ প্রশাসনিক সরঞ্জাম

এই আইনের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রম দপ্তরের প্রত্যেক পরিদর্শন আধিকারিককে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগ বা সংস্থার বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গোর অভিযোগ পেলে পরিদর্শক তা খতিয়ে দেখবেন। আদালতে কোন ধরনের নিয়মভঙ্গোর বিরুদ্ধে নালিশ করার বিধান প্রযোজ্য হয়েছে।

৫.৩.৬ এই আইনের উদ্দেশ্য

এই আইনের উদ্দেশ্য হল ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের উপযোগী কাজের শর্তাবলি সুনিশ্চিত করা।

৫.৩.৭ সাজা

যে-কেউ শিশুদের জন্য নিয়োগ নিষিদ্ধ করা কোন ক্ষেত্রে শিশুদের নিযুক্ত করলে বা যুক্ত করার অনুমতি দিলে বা শিশুদের কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটালে অন্তত ১০,০০০ টাকা জরিমানা ও একবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। অন্যান্য নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে একমাস পর্যন্ত কারাবাস বা ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

৫.৩.৮ আইনের পর্যালোচনা ও প্রতিস্থাপনমূলক সরঞ্জাম

ভারতের দেশে শিশুশ্রম দূর করতে এবং শিশুশ্রমিকদের নানারকম বাধা দূর করতে এই আইন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। দেশের সংবিধান, বিধিবদ্ধ ও বিভাগীয় উদ্যোগসমূহ শিশুশ্রম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলেও উপযুক্ত আইন প্রণয়নের ফলে তা আরও বেশিভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের শিশুশ্রম সংক্রান্ত ষষ্ঠ সম্মেলনকে সার্থক রূপ দিয়েছে ভারতবর্ষ। উক্ত সম্মেলনের অনেক কিছুর পাশাপাশি তিনটি মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিংশ শতকের মাঝামাঝি রূপায়িত হয়। শিশুদের কাজের উপযুক্ত শর্ত সুনিশ্চিত করতে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উপর নানা ধরনের শোষণের প্রতিকার করতে ভারতে বিভিন্ন ধরনের আইন ও আইনগত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সহযোগী নীতি গ্রহণ করে সংবিধানগত, বিধিবদ্ধ ও বিভাগীয় উদ্যোগ-এর সাহায্যে সংঘবদ্ধভাবে শিশু শ্রমিকের নানান সমস্যা মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৪, ৩৯ এবং ৪৫ নং ধারায় ১৪ বছরের কমবয়সী শিশুদের শ্রম সুরক্ষা দান ও সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া একটি সুসংহত আইন হিসাবে ১৯৮৬ সালে শিশু শ্রমিক (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রবর্তন করে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের নিযুক্তকরণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়। ১৯৯৯ ও ২০০৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই আইনের তফসিল বিস্তৃত করা হয়। কোন ক্ষেত্রে কত বয়সের শিশুর কাজ করার উপযুক্ততা আছে তার তালিকা প্রস্তুত করা ও নিয়োগের প্রক্রিয়া উপযুক্তভাবে বিবেচিত হচ্ছে কিনা সেই মর্মে তফসিল ১৪ থেকে ৫৭ পর্যন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ৫-১৪ বছর বয়সী শিশু শ্রমিক আমাদের দেশে ১২.৫ মিলিয়ন, যেখানে মোট শিশুর সংখ্যা ২৫২ মিলিয়ন।

এই আইনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

- শিশু শ্রমিক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির জন্য বিধান : এই আইনে (ধারা-৫ অনুসারে) ভারত সরকারের তফসিলভুক্ত কাজের সংযোজন করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিশু শ্রমিক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট হতে পারে বলে বলা হয়েছে।
- কাজের মেয়াদ ও সময়-এর জন্য বিধান : আইনের (৭নং ধারা অনুসারে) বিধান অনুসারে কোন শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো বা কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকদিনের

কাজের সময় ৩ ঘণ্টা কাজের পর অন্তত এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বন্দোবস্ত থাকবে। কোন শিশুর সন্ধ্যে ৭টা থেকে সকাল ৮টার মধ্যে কাজ করার অনুমোদন বা কাজ করানোর অনুমোদন থাকবে না।

- সাপ্তাহিক ছুটি : প্রত্যেক শিশু শ্রমিককে সপ্তাহে একটি পূর্ণদিন ছুটি দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে (ধারা-৮)
- বিধিভাঙার মামলা কে দায়ের করতে পারে :
  (ক) যে-কোন ব্যক্তি
  (খ) পুলিশ অফিসার
- এই আইনের বিভিন্ন বিধান ভাঙা/লঙ্ঘনের জন্য (ধারা-১৪) উপযুক্ত শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৯৮৭ সালের জাতীয় শিশু শ্রমিক নীতিতেত শিশু শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় নানান রকম আইনগত বিধান প্রবর্তনের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে শিশু শ্রমিকদের উন্নয়ন ও প্রকল্পভিত্তিক শিশু শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প (National Child Labour Project) গ্রহণ করা হয়, যার অধীন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে শিশু শ্রমিকদের জন্য বিধিবহির্ভূত বিদ্যালয় স্থাপন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পরিপূরক পুষ্টি প্রভৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মরত শিশুদের জন্য শিশু শ্রমিক দূরীকরণ (Elimination of Child Labour Programme) কর্মসূচি এই পথে নতুন দিশা দান করেছে। এই প্রকল্পের অধীন অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর জন্য মোট ১.৫ লক্ষ শিশু শ্রমিককে নিয়ে ৭৭টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটির মিটিং-এ (২০ শে জানুয়ারী ১৯৯৯) এই প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মোট অনুমোদিত কর্মসূচির সংখ্যা ১০০টি করা হয়,

যে সংখ্যায় শিশু শ্রমিককে বিশেষ বিধিবহির্ভূত স্কুলে ভর্তি করানো হয় তার তুলনায় স্কুল থেকে বেরিয়ে সমাজে পুনর্বাসন হওয়ার মতো উপযুক্ত শিশুর সংখ্যা খুবই কম, জাতীয় শিশু শ্রমিক কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মরত অবস্থার দূরীকরণ ও শিশুদের সঠিকভাবে পরিচর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে সমাজে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৃজনশীল সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা।

শিশু শ্রমিকদের সমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারের দায়িত্বশীল ভাবমূর্তির প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় সু-শাসন আলোচনাসূচিতে (National Agenda for Governance-1998) । আলোচনাসূচিতে বলা হয় যে, সরকারের মূল লক্ষ্য হল যাতে কোন শিশু নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত, চিকিৎসাহীন, পরিচর্যাহীন অবস্থায় না থাকে তা দেখা ও শিশু শ্রমিক ব্যবস্থার দূরীকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মহামান্য উচ্চতম আদালত কর্তৃক সময়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিশু শ্রমিক প্রতিরোধের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক আবেদন (নগর) নং ৪৬৫/১৯৮৬-এর বিচারে সুপ্রিম কোর্ট রায়ে “কোন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের যুক্ত করা হলে সেক্ষেত্র থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করতে হবে বা তুলে আনতে হবে। অন্যান্য ঝুঁকিহীন ক্ষেত্রে শিশুদের কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকার ব্যাপারে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা” করার নির্দেশ জারি করে।

উক্ত রায়ের সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি হয় তার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিশু শ্রমিক পিছু ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে, শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন তৎসহ কল্যাণ তহবিল গঠন করবে, ওই শিশুর পরিবর্তে তার পরিবারের বড়/প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে ওই কাজে বহাল রাখবে, বা প্রতি শিশু শ্রমিক পিছু ৫০০০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, ছয়মাসের মধ্যে কর্মরত শিশুদের সমীক্ষা সম্পূর্ণ হবে, ২৫,০০০ টাকার উপর সুদ ধার্য করে তা প্রদান করবে (২০,০০০ টাকা নিয়োগকারীর ও বাকী ৫০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট সরকার দেবে) তার পরিবারকে, কর্মাবস্থা থেকে তুলে নেওয়া শিশুর লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত করবে প্রভৃতি। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অনুসারে সরকার ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বেশ কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করেছে।

৫.৩.৯ সংশোধন

শিশুশ্রমিক (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬-এর সর্বশেষ সংশোধনও কার্যকরী হয় সম্ভবত আগস্ট মাসে (২০০৬)। এবং গার্হস্থ্য কর্মে, পথের ধারে চায়ের দোকান বা ধাবায় শিশু শ্রমিক নিষিদ্ধ করা হয়। এই সংশোধনের ফলে ভারত সরকার ১৪ বছরের কমবয়সী শিশুদের পারিবারিক কাজে বা হোটেল ও রেস্তোরাঁয় নিয়োগ নিষিদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছে। ১০ই অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মৃণাল ব্যানার্জী ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গ এই আইন রূপায়ণ করবে এবং শিশু শ্রমিক বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট হবে।

৫.৪ ❑ পণ নিবারণ আইন ১৯৬১

এই আইনে পণ বলতে বলা হয় কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বিয়ের কারণে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ/নগদ অর্থ দেয় বা নেয়, দেবে বা নেবে বলে ঠিক করে বা ভবিষ্যতে দেওয়া হবে বা নেওয়া হবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাহলে সেই স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বা নগদ অর্থ পণ হিসাবে বিবেচিত হবে। এখানে উভয়পক্ষই এই আইনের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

৫.৪.১ ১৯৬১ সালের আইন-২৮ (সংশোধন হয়—১৯৮৪ এবং ১৯৮৬-তে)

এই আইন মূলত মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যে কেউ পণ দিলে বা নিলে তা এই আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই কার্যকরী হয়।

৫.৪.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ

রাজ্যের সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর এই মর্মে যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর।

৫.৪.৩ প্রশাসনিক সরঞ্জাম

এই আইনের ১০ নং ধারায় প্রদত্ত অধিকারবলে রাজ্য সরকার পণ নিবারণ বিধি-২০০০ চালু করেছে।

সরকার মহকুমা শাসককে পণ নিবারণ আইন ১৯৬১ অনুসারে পণজনিত যাবতীয় বিষয়ের জন্য বসা, আলোচনা ও সেইমতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পণ নিবারণ আধিকারিক (Dowry Prohibition Officer)-এর স্বীকৃতি দিয়েছে। পণসংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পণ নিবারণের আধিকারিককে সহায়তার জন্য প্রতিটি মহকুমায় উপদেষ্টা পর্ষদ গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত পর্ষদ সদ্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে পণ নিবারণ আধিকারিকের কাজ উপযুক্তভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করেছে।

৫.৪.৪ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

পণ প্রথার একটি ভয়ানক সামাজিক ও স্বাস্থ্যসমস্যার প্রভাব আজকাল দেখা যাচ্ছে। বহু জায়গায় বধূ হত্যা, জ্বালিয়ে দেওয়া, আত্মহত্যা, হাসপাতালের অবহেলাজনিত মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা নিয়মিত ঘটে চলেছে। এর অন্যান্য নানান কারণ থাকলেও বিয়ের সময় প্রতিশ্রুত পণ পাত্রপক্ষকে না দেওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যেহেতু ছেলেদের সামাজিক মূল্য বেশি এবং মহিলাদের কম, যেহেতু ছেলেদের তুলনায় মহিলাদের অবস্থা অনেকটা পিছিয়ে, সেইহেতু তার মূল্য হিসাবে পাত্রপক্ষ দামী জিনিস ও ভারী টাকার পণ দাবী করে বা উপহার চায়। এমনকি বেআইনীভাবে এইসব জিনিসপত্র বিয়ের আগে নেওয়ার জন্য অনেক পক্ষ বিশেষ ভাবে উদ্‌গ্রীব থাকে। এই আইনের বিধানে বলা হয়েছে যদি কেউ এই বিধিভঙ্গা করে পণ নেয় তার কমপক্ষে ৫ বছর জেল বা ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা জরিমানা হবে বা যা পণ নিয়েছে তার মূল্য এদের মধ্যে যেটা সর্বাধিক হবে সেই শাস্তিই বলবৎ হবে। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রকম চর্চা অনুসারে বিভিন্ন রকমের নিবারণ ব্যবস্থা যেমন—বিজ্ঞাপন, পণের সুযোগ, উপহার, যৌথ হিসাব (ব্যাঙ্কের), অন্য ধরনের যৌতুক—এর মধ্যে ধরা হয়ে থাকে।

১৮৮৫ সালের পণ নিবারণ (পাত্র ও পাত্রীকে প্রদত্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ) বিধি অনুসারে উপহার ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি, বিয়ের পর সাত বছরের মধ্যে কোন মহিলার মৃত্যু হলে এবং মৃত্যুর আগে তার স্বামী, শ্বশুর/শাশুড়ি বা আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা ঘটলে তা পণজনিত মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে এবং তার সাজা হিসাবে অপরাধীকে ৭ বছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে।

৫.৪.৫ পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রণয়নের বর্তমান অবস্থা

২০০৩ সাল থেকে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে জানাতে হবে যে বিয়ের আগে, পরে বা বিয়ের সময় তিনি পণ নেননি, যদি কারও ঘোষণায় এটি ধরা পড়ে এবং প্রমাণিত হয় যে তিনি পণ নিয়েছেন এবং তা গোপন রেখেছেন, সেক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারা অনুসারে দেওয়ানি মামলা ও তার সাজা বলবৎ হবে। ১৯৬১ সাল থেকে পণ বিরোধী আইন বলবৎ হলেও সদ্য জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য পণ নিবারণ আইন (সংশোধন) ১৯৮৯ অনুসারে উপযুক্ত বিধি প্রবর্তন করা হয়।

উক্ত সরকারি কর্মচারীকে তার বিভাগীয় প্রধানের কাছে সংশ্লিষ্ট ঘোষণা জমা দিতে হবে এবং তার স্ত্রী, বাবা ও শ্বশুরের কাছ থেকে সংশয়িত করিয়ে আনতে হবে। প্রয়োজন হলে, সেই ঘোষণাপত্র যথাযথ পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সদ্য নিযুক্ত মুখ্য পণ নিবারণ আধিকারিক (Chief Dowry Prohibition Offficer)-এর

নিকট পাঠাবেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। রাজ্যের সব জেলার জন্য পণ নিবারণ আধিকারিক পদটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আধিকারিক সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীর ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের অনুসন্ধান করবেন এবং যদি দেখা যায় তিনি বিয়েতে বা আগে ও পরে পণ নিয়েছেন তাহলে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করার ব্যবস্থা করবেন।

উক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন কলকাতার বিভাগীয় প্রধানের কাছে সংশ্লিষ্ট পণ নিবারণ আধিকারিক পেশ করবেন এবং ওই আধিকারিককে উক্ত ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দোষী কর্মচারীকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়ার পাশাপাশি চার্জশিট গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫.৪.৬ আইনের পর্যালোচনা :

পণ প্রথার সঙ্গো পণজনীত মৃত্যুর সম্পর্ক খতিয়ে দেখতে অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি এই আইনের বিভিন্ন বিধান পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। এই আইনের ২নং ধারায় পণ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে বিয়ে উপলক্ষে যে-কোনো মূল্যবান সম্পদ বা নিরাপত্তা দান। ৩নং ধারায় পণ সংক্রান্ত কথা দেওয়া বা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বলা হয়েছে। ৪নং ধারায় পণ দাবির জন্য সাজার ব্যবস্থা ও ৪-এ ধারায় পণ সংক্রান্ত বিষয়ের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৫নং ধারায় পণ দেওয়া-নেওয়ার চুক্তি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৬নং ধারায় যাকে পণ দেওয়া হয়েছে উক্ত পণের সামগ্রী তার হাতে তুলে দেওয়া, তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীর হাতে, ছেলে-মেয়ের হাতে বা বাবা-মা'র হাতে যেখানে যেমন পরিস্থিতি হবে সেই অনুসারে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৭ ও ৮ নং-এ এই অপরাধকে গুরুতর অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ৮-এ ধারায় অপরাধ প্রমাণের ঝামেলা এবং ৮-বি ধারায় পণ নিবারণ আধিকারিক নিয়োগ ও তাকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণের বিধান দেওয়া হয়েছে। ৯ ও ১০ নং ধারায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে বিশেষ বিধি তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন-এর ১১৩-এ ধারায় কোন মহিলা বিবাহের সাত বছরের মধ্যে যদি মারা যান তাহলে তা পণজনিত মৃত্যু বলে স্বীকৃত হবে। ১১৩-বি ধারায় আরও বলা হয়েছে যে পণজনিত মৃত্যুর আগে ওই মহিলার উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়েছিল বলে বিবেচিত হবে।

এই আইনের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

- পণ দেওয়া-নেওয়ার চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৩নং ধারায় পাত্রীর বাবা-মাকে পণ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এমনকি পাত্রীর বিয়েকে কেন্দ্র করে সামান্যতম কিছু দেওয়াকেও পণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। উল্লিখিত আছে যে কোন পাত্রী বা বিবাহিতা মহিলা তার স্বামীকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামিন দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্বামীর ক্ষেত্রে তার স্ত্রীকে একই বিষয়ে কিছু দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ধারা ৩-এর উপধারা (১) পণ দেওয়া বা নেওয়া বা দেওয়ার/নেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ৩নং ধারায় (২) নং উপধারায় প্রথাগত নিয়মনীতিগত বিয়েতে প্রথামত কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন দাবি ছিল না তা নিশ্চিত হবে। এই ধরনের প্রথামাফিক কিছু উপহারের ক্ষেত্রে যিনি দিচ্ছেন বা যাকে দেওয়া হচ্ছে তাদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গো সঙ্গাতি রেখেই দিতে হবে এবং এই সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে উক্ত উপহার

সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে উক্ত উপহার বিয়ের সময়েই দেওয়া-নেওয়া করতে হবে।

সংসদও পণজনিত মৃত্যুর সমস্যা মোকাবিলায় নানান রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪-বি ধারা সংযোজন। এই ধারায় প্রদত্ত বিধান হল—

- স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত মহিলার পুড়ে মৃত্যু, দৈহিক আঘাতে মৃত্যু বা কোন ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে।
- বিয়ের ৭ বছরের মধ্যে ঘটেছে।
- দেখানো হয়েছে মহিলার মৃত্যুর আগে তাঁর স্বামী পণের জন্য তাঁর উপর নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার করেছেন সে কারণে এই মৃত্যু পণজনিত মৃত্যু বলে ধরা হবে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঘটনা প্রমাণিত হলে উক্ত মহিলার স্বামী বা তার আত্মীয়স্বজন এই অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবে।

৫.৪.৭ সংশোধন

১৯৬১ সালের আইন সংশোধন করা হয় ১৯৮৬ সালে। এই দুই সালের সংশোধন অনুসারে এই আইন আরও মজবুত হয়। ১৯৮৬ সালের সংশোধনীতে ৮-এ এবং ৮-বি ধারা সংযোজন করা হয়। ৮-এ তে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য যে ৩নং ধারা অনুসারে (পণ দেওয়া-নেওয়া বা ঐ সংক্রান্ত প্ররোচনা দেওয়া) অপরাধ ঘটেনি এবং ৪নং ধারা (পণের দাবি করা)-য়—ব্যক্তির অপরাধ চার্জ করা হবে।

৫.৫ ❑ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯

৫.৫.১ ১৯২৯-এর আইন-১৯

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন বাল্যকালের বিবাহ প্রথাকে প্রতিরোধ করেছে। এই আইন জম্মু কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভারতে বা তার বাইরে সকলের উপর প্রযোজ্য।

৫.৫.২ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর

রাজ্যের সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু কল্যাণ দপ্তর এই বিষয়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৫.৫.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

এই আইনের ৬নং ধারায় যে কারণে সাজা দেওয়া হয় তা হল—

- ২১ বছরের নীচে যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বালিকাকে বিয়ে করলে তার ১৫ দিন পর্যন্ত কারাবাস বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।
- ২১ বছরের বেশী যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বালিকাকে বিয়ে করলে ৩ মাস পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা উভয় সাজাই হতে পারে।
- কম বয়সে বাচ্চাদের বিয়ে দিলে তার সাজা তিন মাস পর্যন্ত জেল বা জরিমানা উভয়ই হতে পারে

যদি না প্রমাণিত হয় যে ওই বিয়ে কোন বাচ্চাদের মধ্যে সংঘটিত হয়নি।

- বাল্যবয়সের বিয়েতে জড়িত বাবা-মা বা অভিভাবকদের তিন মাস পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা উভয়েই হতে পারে।
- কোন মহিলাকে কারাবাসের দণ্ড দেওয়া যাবে না।

এই বিধানের ব্যবস্থা অনুসারে অন্য কোনভাবে প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কোন নাবালককে বাল্য বিবাহে রাজী করানো হলে তার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা অভিভাবকের অবহেলার কারণে হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ অফিসার নিয়োগের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যিনি বাল্য বিবাহ হওয়া, হবে বলে স্থির হওয়ার বিষয় বিবেচনা করবেন, অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবেন এবং আইন সঠিকভাবে রূপায়ণে সাহায্য করবেন।

৫.৫.৪ আইনের পর্যালোচনা :

দেখা গেছে ভারতের মতো দেশে যত বিবাহ সম্পাদিত হয় তার অন্তত ৫০ শতাংশের ক্ষেত্রে পাত্রী/বালিকা অপ্রাপ্তবয়স্কা। র‍্যাপিড হাউসহোল্ড সার্ভে (Rapid Household Servey) অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে বিহারে ৫৮.৯ শতাংশ মহিলার বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সের নীচে, ৫৫.৫ শতাংশ হল রাজস্থান, ৫৪.৯ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গো, ৫৩.৮ শতাংশ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে, ৫৩.২ শতাংশ মধ্যপ্রদেশে, এবং ৩৯.৩ শতাংশ কর্ণাটকে। উচ্চ নারীশিক্ষার হারযুক্ত রাজ্য কেরালাতেও প্রতি ১০ জন মহিলার মধ্যে ১ জন মহিলার বিয়ে হয় নাবালিকা অবস্থায়।

ভারতীয় সংসদে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন পাশ হয় ১৯৭৮ (ব্রিটিশ আমলের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯-কে পরিমার্জন করে এবং ১৯৪৯ সালের আইন সংশোধন করে) এবং মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ ও ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ বছর নির্দিষ্ট করা হয়। যাইহোক ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন একটি জটিলতাপূর্ণ ব্যবস্থা যেখানে বলা হয়েছে সকল শিশুর বিবাহ অবৈধ কিন্তু বাতিলযোগ্য নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ-এর সঙ্গো বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘের শিশুর অধিকার বিষয়ক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা (UNDHR) এবং মহিলাদের উপর সমস্ত রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণের সম্মেলন (CEDAW) যেখানে বাল্য বিবাহ বাতিল বলে স্বীকৃত হয়েছে তার সঙ্গো ভারতের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন বহু জায়গায় দ্বিমতের শিকার, শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে বা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না, দেশের শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃত্ব মৃত্যুর হার, দারিদ্র্যের ভয়াবহতা প্রভৃতির কারণে ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (Millenium Development Goal) অনুসারে ভারতের মতো দেশে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সফল হওয়ার নানা প্রতিবন্ধকতা বর্তমান।

জাতীয় মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতি গিরিজা ব্যাস-এর মতে আইনের বাধ্যবাধকতা ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। জাতীয় মহিলা কমিশন এই বিষয়টি সরকারের সঙ্গো আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেছে।

- সরকার যত শীঘ্র সম্ভব বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিক নিয়োগের বন্দোবস্ত করবে।
- ২৩ নং ধারায় প্রযোজ্য শাস্তি পুনর্বিবেচনা ও আরও গুরুতর আকারের হওয়া দরকার।

- আইনের বিধি ভেঙে বিবাহ সম্পাদিত হলে তা বাতিল বলে ঘোষণা করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেওয়া বা প্রতিরোধ চাওয়ার মাধ্যমে বাল্য বিবাহে উপস্থিত থাকা প্রত্যেকের জন্য শাস্তি বিধান বলবৎ করা।
- বাল্য বিবাহের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইনের অপরাধকে জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের সুপারিশ অনুসারে এই আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য কঠোর সাজা বলবৎ করা এবং এই আইনের সমস্ত অপরাধীকে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার অধীন বলবৎ করা। এছাড়া যাঁরা দলগতভাবে বাল্য বিবাহের আয়োজন করে থাকেন তাঁদের শাস্তিদানের বিধানও প্রবর্তন করা উচিত।

ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে 'বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার পুরো আর্থিক সহায়তা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত ১৯৯৭ সালের ১৫ আগস্টের পরে জন্মানো বালিকাদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেক স্তরে তার শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঐ আর্থিক সহায়তার অর্থ জমা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বালিকা অবিবাহিত ও ১৮ বছর পার না হচ্ছেন ততক্ষণ এই সহায়তা বহাল থাকবে। এই প্রকল্পের অধীন ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ করা হয় এবং ৮ লক্ষ বালিকাকে সহায়তা দান করা হয়।

৫.৫.৫ সংশোধন :

মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর ও ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর করার জন্য ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন (যা সারদা আইন হিসাবে পরিচিত) ১৯৭৮ সালে সংশোধন করা হয়। এই আইনে অভিযোগ পাওয়া মাত্র পুলিশ অনুসন্ধান করতে পারে কিন্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া "ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট" ব্যতীত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। যাইহোক এই আইন বাল্য বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে না যেহেতু মহিলাদের মর্যাদাহানির রীতি প্রচলিত।

দেশের বাল্য বিবাহ ব্যবস্থা প্রতিরোধের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভারত সরকারের (মহিলা ও শিশু বিকাশ দপ্তরের) কাছে ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন সংশোধনের জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ পেশ করেছে। এই সমস্ত সুপারিশ বিবেচনা করে ভারত সরকার (আইন প্রণয়ন বিভাগ, আইন ও বিচার মন্ত্রক) ২০.১২.২০০৪ তারিখে রাজ্যসভায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিল ২০০৪ পেশ করে। এই বিলের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও মহিলা ও শিশু বিকাশ দপ্তরের অনেক সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.৬ ❑ সমান মজুরি আইন ১৯৭৬

৫.৬.১ ১৯৭৬ সালের আইন-২৫ :

সমান মজুরি বিল সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করা হয় এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি ১৯৭৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী এই বিলে সম্মতি দেন। বিধিবদ্ধ গ্রন্থে এই বিল 'সমান মজুরী আইন ১৯৭৬' হিসাবে (১৯৭৬ এর ২৫) নথিভুক্ত হয়। মূলত পুরুষ ও নারী উভয় কর্মীকে সমজাতীয় কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান, পুরুষ ও নারীভেদে মজুরি প্রদানের বৈষম্য দূর করা ও কাজের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

৫.৬.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/দপ্তর :

রাজ্যের শ্রম দপ্তর এই বিষয়ে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর।

৫.৬.৩ আইন বলবৎকরণ :

শ্রম দপ্তরের তদন্তকারী আধিকারিক/তদন্তকারী (Inputing Officer/Inspector) আইনের বিভিন্ন বিধির কার্যকরী দিক দেখাশোনা করবেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে শ্রম আধিকারিক, সহকারী শ্রম কমিশনার বা উপ শ্রম কমিশনারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে এই বিধান প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেবেন।

তদন্তকারী দলের সাহায্যে ২০০২ সালে ২৮২৬টি এবং ২০০৩ সালে ১২৩৩টি ক্ষেত্রে তদন্ত করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

৫.৬.৪ সাজা :

এই আইনের কোনও বিধি লঙ্ঘন করলে তার সাজা হিসাবে অন্তত ১০,০০০ টাকা জরিমানা যা সর্বাধিক ২০,০০০ টাকা পর্যন্তও হতে পারে বা তিন মাসের কারাবাস যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা ও কারাদণ্ড উভয় সাজাই হতে পারে। পরবর্তী কালের অপরাধের জন্য দুই বৎসর কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে।

৫.৬.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

এই আইনের ৯নং ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তদন্তকারী হিসাবে নিযুক্ত করে নিয়োগকর্তা এই আইনের কোন বিধি লঙ্ঘন করেছেন বা করছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করবে এবং তদন্তকারীর কাজের সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করে দেবে।

এই আইনের ১০নং ধারায় বলা হয়েছে যে—

এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যদি কোন নিয়োগকর্তা—

- কতজন কর্মী কাজ করছেন তার নথিভুক্ত খাতা বা কাগজপত্র না রাখেন।
- কর্মী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখাতে না পারেন।

- কোন নথিপত্র দেখাতে অস্বীকার করেন বা তাঁর সহযোগী ব্যক্তি বা সংস্থাকে যাকে তার দায়িত্বে বহাল করেছেন তার কাছে কোন নথি রাখতে বা দেখাতে বারণ করেন।
- কোন ধরনেরই তথ্য দিতে অস্বীকার করে, তাহলে সেই নিয়োগকর্তার (এক মাস পর্যন্ত কারাবাস বা ১০০০ টাকা জরিমানা) সাজা হতে পারে—

এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে যদি কোন নিয়োগকর্তা—

- এই আইনের বিধি লঙ্ঘন করে নিয়োগ করেন।
- একই কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা হারে মজুরি প্রদান করেন।
- পুরুষ ও মহিলাদের কোন রকমের বৈষম্য করেন।
- এই ৬নং ধারার উপধারা (৫) অনুসারে সরকার দ্বারা জারি করা কোন নির্দেশ না মানেন।
  সেই নিয়োগকর্তার শাজা (১০,০০০ টাকা জরিমানা বা সর্বাধিক ২০০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে বা ৩ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড) হতে পারে।
- যদি কোন ব্যক্তি দরকার মতো তদন্তকারী আধিকারিককে উপযুক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে অস্বীকার করে বা কোন তথ্য দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার সাজা হিসাবে ৫০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।

৫.৬.৬ আইনের পর্যালোচনা :

এই আইনে বলা হয়েছে যে, কোন নিয়োগকর্তা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মজুরি প্রদানের জন্য নগদ টাকা বা জিনিস দেওয়ার সময় পুরুষ বা নারীকর্মী ভেদে পরস্পরের মধ্যে কাউকে বেশি বা কাউকে কম মজুরি প্রদান করতে পারবে না। এই আইন আরও বিধান দিয়েছে যে নিয়োগ-এর সময় কোন নিয়োগকর্তাই পুরুষ বা মহিলা হিসাবে কোন বৈষম্য করতে পারবে না। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হল—

- পুরুষ বা নারীকে একই রকম বা একই কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদানের বিষয়টি সুরক্ষিত হয়েছে।
- যেখানে মহিলাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে সেই ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে কাজে যোগ দেওয়ার বা কাজের শর্তাবলির কোন বৈষম্য পুরুষ বা নারীভেদে করা যাবে না।
  ক্রমবর্ধমান কাজের সুযোগ দিতে ও মহিলাদের কাজে নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে এই আইনে একটি উপদেষ্টা কমিটি স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। রাজধানী দিল্লীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সরকার এই উপদেষ্টা কমিটি ইতিমধ্যে গঠন করেছে। সমান মজুরি বিধি ১৯৯১ অনুসারে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যা সমান মজুরি আইন ১৯৭৬ সালের ৬নং ধারার (১) নং উপধারাতেও বলা হয়েছে।

৫.৬.৭ সংশোধন :

প্রোমোশন, ট্রেনিং ও ট্রান্সফারের মতো চাকরি জীবনের নানান সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী কর্মীভেদে কোন তারতম্য যাতে না করা হয় তার জন্য ১৯৭৬ সালের সমান মজুরি আইন সংশোধন করা হয়, যার নাম হয় সমান মজুরি (সংশোধন) আইন ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ৪৯)। যা মূল আইনে উল্লেখ করা

ছিল না। এছাড়া বৈষম্যের শিকার কোন ব্যক্তির অভিযোগ দায়ের করার এবং আরও গুরুতর সাজা দানের ব্যবস্থাও এই সংশোধন আইনে করা হয়। যার ফলে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণমূলক সংগঠনও এই আইনের আওতাভুক্ত হয়।

৫.৭ ❑ প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১ :

৫.৭.১ ১৯৬১ সালের আইন-৫৩ :

কর্মরত মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও সুবিধা দানের জন্য সংসদের উভয় কক্ষে প্রসূতিকালীন সুবিধা বিল পেশ করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১২ ডিসেম্বর এই প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১ সালের ৫৩) প্রণয়ন করা হয়।

৫.৭.২ রাজ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/বিভাগ :

রাজ্যে শ্রম দপ্তর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/দপ্তর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫.৭.৩ প্রয়োগের ক্ষেত্র :

এই আইন মূলত কেন্দ্রীয় আইন এবং ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন অনুসারে প্রসূতিকালীন সুবিধা দানের জন্য সমস্ত কারখানায় এই আইন প্রযোজ্য। দশ বা তার অধিকসংখ্যক কর্মী কর্মরত বা বছরের কখনো কর্মরত ছিল এমন দোকান বা সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন সেইজন্য বিজ্ঞাপিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এমনকি অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে যদিও তা খুবই সীমিত। একজন মহিলা কর্মী ৯০ দিন সবেতনে প্রসূতিকালীন বা গর্ভস্রাবের জন্য ছুটি পাওয়ার অধিকারী।

৫.৭.৪ উল্লেখযোগ্য বিধান :

যে সব কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন ১৯৪৮-এর আওতাভুক্ত সেইসব কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে না। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনানুসারে বিধিবদ্ধ কারখানা সমূহের প্রসূতিকালীন সুবিধা বিধি অনুসারে কারখানার ইন্সপেক্টরকেই মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৫.৭.৫ প্রসূতিকালীন সুবিধা বাজেয়াপ্তকরণ :

এই আইনের ৬নং ধারা অনুসারে কোন কর্মরত মহিলা নিয়োগকর্তার অনুমতিক্রমে অনুপস্থিত থাকলে এবং সেই অনুপস্থিত সময়ের জন্য প্রসূতি সংক্রান্ত কোন সুযোগ সুবিধার দাবি করলে তা গ্রাহ্য হবে না। পূর্ব অনুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে প্রসূতিজনীন সুবিধা বাজেয়াপ্ত হবে।

৫.৭.৬ সাজা :

এই আইন বিধান দিয়েছে যে—

- যদি কোন নিয়োগকর্তা প্রসূতিকালীন সুবিধা দিতে না পারে বা এই আইনে বর্ণিত বিধান অনুসারে তার অনুপস্থিতিতে কোন মহিলাকে উপযুক্ত সুবিধা দিতে অস্বীকার করলে তার সাজা হিসাবে ওই নিয়োগকর্তার ৩ মাস কারাদণ্ড যা এক বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে বা ২০০০ টাকা জরিমানা যা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে বা উভয় সাজাই হতে পারে। এই সাজা ঘোষণার আগে আদালতে উপযুক্ত কারণ লিখিতভাবে জানিয়ে শাস্তির মাত্রা লাঘব করানোর উপযুক্ত সুযোগ যেন দেওয়া হয়।
- এই আইনে বর্ণিত কোন বিধান বা নিয়মবিধির কোন নিয়ম যদি কোন নিয়োগকর্তা লঙ্ঘন করেন তাহলে তার সাজা হিসাবে ওই নিয়োগকর্তার এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিধি বা নিয়মবিধির নিয়ম কেবলমাত্র প্রসূতিকালীন সুবিধার কোন অর্থ প্রদান বা অন্য কোন সুবিধার অর্থ প্রদান বা বকেয়া অর্থ আদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা উক্ত অভিযোগকারিণী পাওয়ার অধিকারী বলে বিবেচিত।

৫.৭.৭ আইনের পর্যালোচনা :

কেন্দ্র সরকার ১৯৬১ সালে এই আইন প্রণয়ন করে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তা প্রযোজ্য হয় এবং দেশের প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিসংক্রান্ত কাজে যুক্ত সকলেই এই আইনের আওতাভুক্ত। এমন কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা এই আইনে বলা হয়েছে যা একজন মহিলা গর্ভাবস্থায় পাওয়ার অধিকারী। এমনকি তার গর্ভাবস্থার কারণে ওই মহিলাকে কখনো কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করাও যাবে না।

এই আইনের বিধান অনুসারে সর্বাধিক ১২ সপ্তাহ প্রসূতিকালীন ছুটি দেওয়া যেতে পারে। প্রসবের আগে ৬ সপ্তাহ ও প্রসবের অব্যবহিত পরে ৬ সপ্তাহ। ছুটিতে যাওয়ার আগে একজন মহিলা হালকা কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী তার বেতন কমাতে পারেন না। প্রসূতিকালীন ছুটি বাতিল হতে পারে যদি ওই ছুটির মধ্যে কর্মচারী জন্য কোথাও কোন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন।

এই আইন মূলত লিঙ্গাভিত্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা একজন মহিলাকে গর্ভাবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে। এই আইনের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য হল—

- অন্তত ৮০ দিন কাজ করার পর প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে।
- গর্ভস্রাবের বা সন্তান প্রসবের দিন থেকে ৬ সপ্তাহ কাজ করার দরকার নেই।
- ভারী ধরনের কাজ, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিতে আঘাত বা গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা বাড়বে এমন কোন কাজ প্রসবের সময়ের ছয় সপ্তাহ আগের একমাস আর করা যাবে না।
- ডাক্তারি সার্টিফিকেট অনুসারে অগ্রিম প্রসূতি সুবিধা হিসাবে যেখানে বিনা খরচে প্রসবের আগে ও প্রসবের পরে পরিচর্যা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে যেখানে চিকিৎসার বোনাস হিসাবে ২৫০ টাকা দেওয়া যেতে পারে।

৫.৭.৮ সংশোধন :

প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১ বহুবার সংশোধিত হয়েছে। যেমন—

- কেন্দ্রীয় শ্রমিক আইন (জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত) ১৯৭০ (আইন ১৯৭০-এর ৫১)।
- প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধন) আইন-১৯৭২ (১৯৭২-এর ২১)।
- প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধন) আইন-১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫২)।
- প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধন) আইন-১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৫৩)।
- প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধন) আইন-১৯৮৮ (১৯৮৮-এর ৬১)।
- প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধন) আইন-১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ২৯)।

শেষের সংশোধনে কর্মক্ষেত্রে মহিলার প্রসূতিকালীন সুরক্ষার কয়েকটি উন্নতি সাধন করা হয়। যেমন—

- প্রসূতিকালীন ছুটি যা মজুরি প্রদানের সঙ্গে যুক্ত, ২০০১ সালের ৮ই মার্চ থেকে ১৪ সপ্তাহের পরিবর্তে ১৮ সপ্তাহ করা হয়।
- ২০০১-এর মার্চ মাস থেকে অতিরিক্ত অবৈতনিক ছুটি বাড়িয়ে ৮ সপ্তাহ করা হয়।

৫.৮ ❑ গর্ভপাত আইন ১৯৭১

৫.৮.১ ১৯৭১-এর আইন ৩৪, যা সংশোধিত হয় ২০০২ সালের নং ৬৪ হিসাবে :

১৯৭১ সালের স্বাস্থ্যগত ভ্রূণনাশ আইন বা গর্ভপাত আইন গর্ভধারণকালে মায়ের জীবন ও শরীর বা মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে যে-কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত করানোর সুবিধা দান করেছে।

৫.৮.২ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ :

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এই বিষয়ের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর।

৫.৮.৩ এম.টি.পি. আইন, এম.টি.পি. নিয়ম ও এম.টি.পি. নিয়ন্ত্রণ :

- এম.টি.পি. আইন (মেডিক্যাল টারমিনেশন অব্ প্রেগন্যান্সি) সংসদের দ্বারা প্রবর্তিত আইনে নিরাপদে ও মাতৃত্বকালীন জীবনস্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে গর্ভপাতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই মর্মে নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ বিধি তৈরির অধিকার দান করেছে।
- এম.টি.পি. নিয়ম কেন্দ্র সরকার তৈরি করে থাকে এবং সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করা হয়।
- এম.টি.পি. নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকার আরোপ করে থাকে। সাধারণত গর্ভপাতের মতামত দান, প্রতিবেদন তৈরি ও গোপনীয়তা বজায় রাখার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই ধরনের নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য শিথিলতার কারণে কোন বিধি রচনা করা বা কোন নিয়ন্ত্রণ জারি করার ফলে সমস্যার আশু সমাধান করে আইন সংশোধনের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়।

নতুন পরিবর্তন যেহেতু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কেন্দ্রিক নয় সেহেতু উপযুক্ত নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সঙ্গো সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

৫.৮.৪ কখন গর্ভপাত করা যাবে

সৎ বিশ্বাসে, মতামতের উপর ভিত্তি করে এই আইনের ৩নং ধারা অনুসারে একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারকে এই কাজের জন্য বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৫.৮.৫ গর্ভাবস্থার মেয়াদ

সৎবিশ্বাসের ফলে এবং একজনের মতের ভিত্তিতে এই আইনের ৩(২) ধারা অনুসারে ১২ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করানো যাবে। ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে ড্রাগ কন্ট্রোলারের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে ৪৯ দিনের মধ্যে কোন এক পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে তা করানো সম্ভব।

৫.৮.৬ গর্ভপাতের কারণ

গর্ভপাত আইন ১৯৭১-এর ধারা ৩(২) অনুসারে গর্ভপাত করানো যাবে যদি—

- গর্ভ সঞ্চারের ফলে মায়ের জীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশাল আঘাত আসার সম্ভাবনা থাকে।
- শিশু জন্মালে শারীরিক বা মানসিকভাবে পঙ্গু হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গর্ভপাত আইন জোর করে কোন গর্ভপাতের অনুমোদন দেয়নি। মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসকের মতামতের উপর ভিত্তি করে এবং উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থার অনুকূলে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। এই প্রথা অবশ্যই ডাক্তারিমতে সিদ্ধ হবে।

৫.৮.৭ বৈধ আইনগত মতামত

এই আইনের ২(৪) নং ধারায় বৈধ আইনগত মতামত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এই মর্মে যে—

- ১৮ বছরের কমবয়সী কোন নাবালকের বা বদ্ধ উন্মাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের লিখিত মতামত আছে।
- বয়স্ক মহিলার (১৮ বছরের বেশি) গর্ভপাতে তার নিজের লিখিত মতামত নেওয়া হয়েছে।

৫.৮.৮ কোথায় গর্ভপাত করানো যেতে পারে

গর্ভপাত আইন ১৯৭১-এর ৪নং ধারায় নিম্নলিখিত স্থানে গর্ভপাত করানো যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

- সরকার পরিচালিত বা সরকার দ্বারা স্থাপিত হাসপাতালে।
- এই মর্মে কাজ করার জন্য সরকারের কোন আইন দ্বারা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান।

৫.৮.৯ সাজা

এই আইনে যা বিধান আছে সেই মতো গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ সে কাজ করে থাকলে ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫) বিধানে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এবং গর্ভপাত আইন ১৯৭১-এর ৫(২) ধারায় সংযুক্ত সংশোধনের ভিত্তিতে ও ভারতীয় দণ্ডবিধির উক্ত বিধানের অনুসারে সাজা বলবৎ হবে।

৫.৮.১০ আইনের পর্যালোচনা

সৎ বিশ্বাস ছাড়াই সন্তান থাকা মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত বা গর্ভস্রাবের ঘটনা ঘটালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১২ নং ধারায় তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এবং এক্ষেত্রে ওই মহিলার সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। পরবর্তী ধারা (৩১৩-৩১৫) (যা গর্ভস্রাবের সঙ্গো সংযুক্ত) অনুসারে গর্ভাবস্থায় বা গর্ভপাতের সময় মৃত্যু ঘটলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

এই আইন মূলত ক্ষমতায়নের আইন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে যেখানে গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীর, স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা সুরক্ষার কারণে গর্ভপাতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। গর্ভপাতের আগে ডাক্তারি ব্যবস্থার মাধ্যমে গর্ভপাতও এই আইনে স্বীকৃত হয়েছে। এই আইন বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দান করেছে। যার নিম্নোক্ত কারণ থাকা জরুরী—

- স্বাস্থ্যের পরিমাপ হিসাবে।
- মানবিকতার কারণে।
- সু-প্রজননশীলতার কারণে।

- **বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল—**

- ধারা ৩(২) অনুসারে গর্ভবতী মায়ের ঝুঁকি কতটা ধারাবাহিকভাবে হতে পারে এবং তার সম্ভাব্য বিপদ কতটা মাকে আঘাত করবে বা গর্ভাবস্থায় প্রকৃত অবস্থা কিরকমতা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা আছে।
- কোন মহিলা যিনি ১৮ বছর প্রাপ্ত নয় বা ১৮ বছর প্রাপ্ত হলেও মানসিক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে গর্ভপাতের আগে তাদের অভিভাবকের লিখিত মতামত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
- যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই আইনের ৪(এ) ধারায় কোন গর্ভপাত করানো হবে না যদি না গর্ভবতী মহিলার সম্মতি থাকে।
- কতজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার থাকবে তা কেবলমাত্র মতামত দানের সঙ্গোই সম্পর্কিত, একবার উপস্থিত রেজিস্টার্ড ডাক্তার সিদ্ধান্ত স্থির করে নিলেই গর্ভপাত করানোর কোন বাধা থাকবে না। একের বেশি ডাক্তার নিয়ে গর্ভপাত করানোর যৌথ প্রচেষ্টার কোন দরকার হয় না।
- ৩নং ধারায় এক বা একাধিক কারণে গর্ভপাত করাতে গেলে সরকারি হাসপাতালে করতে হবে বা
- এই বিষয়ে কাজের বৈধ অনুমতি আছে এমন কোন স্থানে।
- এই আইন কেন্দ্র সরকারকে নিয়মবিধি তৈরির বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে।

- ৩নং ধারার উপধারা (১) অনুসারে একজন চিকিৎসক এই আইন অনুসারে গর্ভপাত করানোর জন্য বিশেষ নিরাপত্তার অধিকারী বলে স্বীকৃত। সৎ বিশ্বাসে এই কাজের কোন খারাপ পরিণতি, জীবনহানি বা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার জন্য ওই চিকিৎসক কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। তবে ওই চিকিৎসককে নিশ্চিত হতে হবে যে এই কাজ সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে য- সহকারে করা হয়েছে।

মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গর্ভপাত আইন ১৯৭১ বিশেষ ধরনের সুবিধা দান ও সামাজিক মর্যাদালাভে সাহায্য করেছে। যারা কোনদিন কোন চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারে কাছে আসতেন না তাদের এই আইন আরও বেশি বেশি করে ডাক্তার কেন্দ্রিক হতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির কিছু বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় গর্ভপাত আইনের নিয়ম-নীতি, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। নিরাপদ গর্ভপাতের লক্ষ্যে গর্ভপাত আইনের বিভিন্ন বিধান, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণসমূহ উপযুক্তভাবেই প্রযোজ্য হয়েছে।

৫.৮.১১ সংশোধন

দুটো সংশোধনমূলক আইন প্রবর্তিত হয়, যা হল—

- গর্ভপাত আইন (সংশোধন) ২০০২ (২০০২-এর ৬৪)।
- প্রতিনিধিত্বমূলক আইনগত বিধান (সংশোধন) আইন ২০০৪ (২০০৫-এর ৪)

সর্বশেষ সংশোধন বিধান দিয়েছে যে সৎ বিশ্বাসের কারণে উপযুক্ত য- সহকারে গর্ভপাত করানোর ফলে কোন ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রাহ্য হবে না।

৫.৯ ❑ উপসংহার

যে-কোনো সামাজিক ও আইনি পদক্ষেপ মহিলাদের ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধান করবে, তাদের অবস্থার মান উন্নয়ন ঘটাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আইন থাকলেই যে সকলের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে, সকলের অধিকার সুরক্ষিত হবে, তা নয়। সমষ্টির সকল শ্রেণীর মানুষের সহৃদয় অংশগ্রহণ ও সমর্থনে সেই পথে এগোনো সম্ভব। তবেই এই ধরনের আইনি পদক্ষেপ সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হবে।

৫.১০ ❑ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায় থেকে যা জানলাম :

- সমাজে খুব দুঃস্থ শ্রেণী বলতে সাধারণত মহিলা ও শিশুদের বোঝায়।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও অধিকার সুরক্ষার জন্য নানান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, যথা—

- সংবিধানগত বিধান

যেসব আইন সম্পর্কে আলোচনা হল—

- আইনের সঙ্গো সম্পর্কিত শিশু
- য- ও সুরক্ষার সঙ্গো সম্পর্কিত শিশু
- কিশোর অপরাধীর বিচার (শিশুর য- ও সুরক্ষা) ২০০০
- শিশু শ্রমিক (নিবারণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৬
- পণ নিবারণ আইন ১৯৬১
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯
- সমান মজুরি আইন ১৯৭৬
- প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১
- গর্ভপাত আইন ১৯৭১

❒ পরিশেষে বলতে হয় যে সমষ্টির অংশগ্রহণ ছাড়া এইসব আইনগত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার ও মহিলা ও শিশুদের নানানরকমের অধিকার সুরক্ষার কাজে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। প্রতিটি স্তরে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার প্রয়োজন সবার আগে।

৫.১১ ❑ অনুশীলনী :

(ক) আপনার মতে মহিলা ও শিশুদের অবস্থা বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশে এতটা পশ্চাৎপদ কেন?

(খ) ধাপে ধাপে কিশোর অপরাধী বিচার (শিশুদের য- ও সুরক্ষা) আইনের (২০০০) রূপায়ণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

(গ) গর্ভপাত আইন ১৯৭১-এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

(ঘ) শিশু শ্রমিক (নিবারণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৬ বাস্তবে রূপায়ণে একজন সমাজকর্মী হিসাবে আপনার ভূমিকা কি হবে তা বর্ণনা করুন।

(ঙ) আপনি কি মনে করেন পণজনিত মৃত্যুর মোকাবিলায় পণপ্রথা নিবারণ আইন ১৯৬১-এর বিধানই যথেষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও?

(চ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯, খুবই প্রাচীন একটি আইন। দেশের বাল্য বিবাহ প্রথার মোকাবিলা আর কীভাবে করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

(ছ) ভারতীয় সংবিধানের ৩৯(সি) ধারার আলোকে সমান মজুরি আইন ১৯৭৬ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(জ) সামাজিক নিরাপত্তা মূলক আইন হিসাবে প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১-র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) মহিলাদের ও শিশুদের নানান অধিকার সুরক্ষায় তোমার পাঠ্যবইতে প্রদত্ত আইন ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

———

একক ৬ ❑ বার্ধক্যভাতা, প্রসূতিকালীন সুবিধা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও বেকারদের সহায়তাদানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ক্ষতিপূরণ ও সুবিধাদানের বিন্যাস

গঠন

৬.১ বার্ধক্যভাতা
৬.২ প্রসূতিকালীন সুবিধা
৬.২.১ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
৬.২.২ সুযোগ ও সুবিধার ধরন ও আইনের বিস্তৃতি
৬.২.৩ প্রসূতিকালীন সুবিধা কি ?
৬.২.৪ কে প্রসূতিকালীন সুবিধা পেতে পারেন ?
৬.২.৫ প্রসূতিকালীন সুবিধার জন্য প্রদত্ত নোটিশ
৬.২.৬ গর্ভবতী মহিলার নিয়োগের নিয়ন্ত্রণ
৬.২.৭ অপসারণ বা বহিষ্কার-বাতিলকরণ/অগ্রাহ্য
৬.২.৮ অন্যান্য সুবিধাসমূহ
৬.২.৯ নিয়োগকর্তার কর্তব্য
৬.২.১০ কর্মীদের অধিকার
৬.২.১১ নিয়োগকর্তার দ্বারা আইনের বিধানভঙ্গের জন্য সাজা
৬.৩ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ
৬.৩.১ আইনগত প্রতিবিধান
৬.৩.২ অক্ষমতা কি
৬.৩.৩ কর্মরত অবস্থায় ও কাজের বাইরে দুর্ঘটনা
৬.৩.৪ পেশাগত রোগের কারণে ক্ষতিপূরণ
৬.৩.৫ ক্ষতিপূরণের হিসাব
৬.৩.৬ কখন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ কমিশনারের কাছে জমা হবে
৬.৩.৭ শ্রমিককে বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যাক্তিকে সরাসরি প্রদেয় অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ
৬.৩.৮ ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তির নথিভুক্তকরণ
৬.৩.৯ চুক্তি নথিভুক্তকরণে ব্যর্থতার প্রভাব
৬.৩.১০ দাবি পেশ
৬.৩.১১ সীমাবদ্ধতা
৬.৩.১২ সংযোজন ও ক্ষতিপূরণ অর্পণ
৬.৩.১৩ নিয়োগকর্তার কর্তব্য
৬.৩.১৪ শ্রমিকের কর্তব্য

৬.৪ বেকারত্ব সহায়তা
৬.৪.১ জাতীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র/কর্মসংস্থান সেবা
৬.৪.২ শহুরে বেকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প
৬.৪.৩ গ্রামীণ যুবকদের স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষণ
৬.৪.৪ অন্যান্য বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্প
৬.৪.৫ স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা
৬.৪.৬ সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা
৬.৪.৭ স্বর্ণজয়ন্তী শহরী স্বরোজগার যোজনা
৬.৪.৮ জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প
৬.৫ অনুশীলনী

৬.১ ❑ বার্ধক্যভাতা :

বৃদ্ধ বয়সের আয়ের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে সরকার ক্রমশ গভীরভাবে নজর দেওয়া শুরু করেছে। বিশেষ করে বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সব মানুষেরই নানারকম অসঙ্গতি দেখা দেয়। কেবলমাত্র দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্কদের আয়ের ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করে স্বল্প সঞ্চয় ও ঋণদানের গোষ্ঠী গঠন ও জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সূত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। যেখানে বছরের পর বছর ধরে তাদের কষ্টে অর্জিত আয়ের সামান্য অংশ সঞ্চয় করতে করতে বড় পুঁজির জোগাড় করতে সক্ষম হলে বয়স্ক অবস্থায় সেই অর্থের সদ্ব্যবহার ও অসহায়তার দূরীকরণ সম্ভব হতে পারে।

(ক) সংবিধানের বিধান :

ভারতীয় সংবিধানের ৭ম তফসিলের তৃতীয় তালিকার ২৪নং উদ্ধৃতিতে "প্রসূতিকালীন সুবিধা, বার্ধক্যভাতা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, ভবিষ্যনিধি ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সহ শ্রমিক কল্যাণের" বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সংবিধানের ৪১নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিতে বৃদ্ধাবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে।

বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তাদানের বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ৪১নং অনুচ্ছেদে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল—"রাষ্ট্র তার আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে ও উন্নয়নসীমার মধ্যে থেকে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বার্ধক্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতার জন্য উপযুক্ত সরকারি সহায়তা দানের অধিকার রক্ষায় উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

(খ) ও.এ.এস.আই.এস. (OASIS) :

বার্ধক্যজনিত সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ভারতের বয়স্ক মানুষের আয়ের নিরাপত্তার বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন

সভাপতি ড. এস.এ. দেব-এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি মনোনীত করে এবং ও.এ.এস.আই.এস. (ওল্ড এজ সোসাল এন্ড ইন্‌কাম সিকিউরিটি) বা বার্ধক্যে আয় ও সামাজিক নিরাপত্তার জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণ করে।

এই প্রকল্পের বিধান অনুসারে একজন ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো মুহূর্তে পেনসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে এককভাবে ব্যক্তিগত অবসরজনিত হিসাবে (Individual Retirement A/C) খাতা খুলবেন। ওই ব্যক্তিকে (IRA নং) অবসরজনিত ব্যক্তিগত হিসাবের নম্বর দেওয়া হয় যা ওই ব্যক্তির জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চালু থাকে। ওই হিসাবের খাতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বছরের যে-কোন সময় ন্যূনতম ১০০ টাকা বা বছরে মোট ৫০০ টাকা করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারবেন। মাসে মাসে নির্দিষ্ট হারে কোন সঞ্চয়ের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সামর্থ্য অনুসারে কতবার টাকা জমা করবেন এবং জমা দেওয়া টাকার পরিমাণ স্থির করবেন। ব্যক্তির কাজের পবিবর্তন ঘটলে, বেকারত্ব ঘটলে, দেশের যে-কোনো প্রান্তে অন্য কোন কাজে যোগ দিলেও এই হিসাব (IRA) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বলবৎ থাকবে। তিনি কিভাবে বছরের বিভিন্ন সময়ে তাঁর হিসাবে (IRA) সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখার জন্য হিসাব বিবরণী চাইতে পারবেন। কীভাবে উক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবেন বা পেনশন সম্পদ তদারকি করবেন তা নিজেই ঠিক করবেন। কাজের থেকে অবসর গ্রহণের পরে উক্ত পেনশন সম্পদ দিয়ে বৃত্তিপ্রদানকারী/পেনশনপ্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে বৃত্তি কিনে মাসিক পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৬০ বছর পূর্ণ হলে একজন ব্যক্তি তার পেনশনের হিসাব থেকে অবসরকালীন সুবিধা পেতে পারেন। এই ব্যবস্থার অধীন প্রথম দুই লক্ষ (২০,০,০০০) টাকা পেনশন প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে পেনশন কেনার জন্য ব্যয় করা যাবে। যার ফলে ওই ব্যক্তি মাসে মাসে ১৫০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর বাকি টাকা অন্য যে-কোনোভাবে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ন্যূনতম (২০,০,০০০) অর্থ দিয়ে পেনশনপ্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে পেনশন কেনার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ বাজারের মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবমুক্ত করতে মাঝে মাঝে পুনর্বিবেচনা করা হয়। এমনকি ৬০ বছর বয়সের আগে সঞ্চিত অর্থ তোলা সম্ভব হবে যদি সেই অর্থের সম্পূর্ণ অংশ পেনশন কেনার জন্য ব্যয় করা হয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দানের সুযোগ পেনশন হিসাব থেকে পাওয়া যেতে পারে। যদি ব্যক্তির পেনশন হিসাবে (IRA) ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা থাকে তাহলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অনুমোদন দিয়ে থাকে। যদি হিসাবধারী ব্যক্তি ন্যূনতম ২০,০,০০০ টাকা তার ব্যক্তিগত অবসর হিসাবে (IRA) জমা থাকে তবে তিনি এককালীন নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেও টাকা তুলতে পারবেন। কেবলমাত্র দুইলাখ টাকার অতিরিক্ত জমার ৩০% টাকা বাড়ি তৈরি, চিকিৎসা, গুরুতর অসুখের খরচ বা নিয়ামক সংস্থার দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য কোনো ক্ষেত্রে তোলা যেতে পারে।

যাইহোক, বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞ কমিটির এক অংশের মতে ১০ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয়স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্মীসংখ্যা গণনার একক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। এই সংখ্যা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মচারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনীত সুবিধা প্রদানে ব্যবহার করা হবে।

একক গণনা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কর্মীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, সঞ্চয়, চাঁদার হিসাব,

সুযোগ-সবিধার বন্টন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও কর্মীদের স্থানান্তর, লিঙ্গা বৈষম্য ঋতুকালীন স্থানান্তর, পারিবারিক অবস্থা, আয়ের ধরন প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভবিষ্যনিধির কৌশলগত দিক ও কর্মপন্থা নির্ধারনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হবে।

(গ) বয়স্কদের জন্য জাতীয় কর্মপন্থা :

১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার বয়স্কদের জাতীয় কর্মপন্থা ঘোষণা করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ও সমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণের বিস্তৃত সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই কর্মপন্থায়। বিশেষ করে এই কর্মপন্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি পরিচর্যা, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা, বয়স্কদের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই কর্মপন্থায় অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের শুভ প্রয়াসকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

(ঘ) জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প :

জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা লাভের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তপূরণ করা আবশ্যক।

→ আবেদনকারীর বয়স (পুরুষ বা মহিলা) ৬৫ বছর বা তার বেশি হতে হবে।

→ আবেদনকারীর নিজের কোনো স্থায়ী জীবন ধারণের উপায় নেই বা পরিবারের বা অন্য সূত্র থেকে কোনোভাবে জীবিকা অর্জনের স্থায়ী অবলম্বন নেই এমন দুঃস্থ ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা)।

→ রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে রূপায়িত হয়। সুতরাং প্রকৃত ও দুঃস্থ বয়স্ক মানুষকে চিহ্নিত করা ও তাদের কাছে উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে। এই প্রকল্পের জন্য আবেদন পত্র পঞ্চায়েত বা পৌরসভার কার্যালয়ে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ভাতার পরিমাণ মাসে ১০০ টাকা।

● এই প্রকল্পের দুর্বলতার দিকগুলি হল—

- উপভোক্তা নির্বাচন এতটাই আমলাতান্ত্রিক ও এত বেশি বিভাগীয় জটিলতা যে, প্রকৃত ও অভাবগ্রস্ত বয়স্কজন অংশগ্রহণে উৎসাহ পান না।
- উপভোক্তা নির্বাচনে কিছু ক্ষেত্রে এত বেশি অসাধু চক্রের জাল ও অসৎ ব্যক্তিদের আনাগোনা, যার কবলে পড়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অহেতুক বিলম্ব হয়।
- প্রকল্পের সীমাবদ্ধ সুযোগ ও উপযুক্ত সচেতনতা গড়ে তোলার পরিবেশ সীমাবদ্ধ যার ফলে বেশিরভাগ উপভোক্তা অন্ধকারে থাকেন।
- প্রকল্পের সঙ্গো যুক্ত কর্মকর্তাদের গতানুগতিক আচার-আচরণ ও কুসংস্কার সমৃদ্ধি এবং হিসাব নিকাশের বোঝা বেশি থাকার ফলে এক শ্রেণির মানুষ তার সুযোগ কাজে লাগায়।
- এই প্রকল্পের সঙ্গো যুক্ত অন্যান্য সমস্ত বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও বোঝাপড়ার অভাব এই প্রকল্পের মন্থর গতির অন্যতম একটি কারণ।

● **কতকগুলো সুপারিশ—**

- পঞ্চায়েতভিত্তিক উপভোক্তার যাবতীয় তথ্য, পারিবারিক অবস্থা, ব্লকে রাখা অর্থনৈতিক খতিয়ানের নিয়মিত লিপিবদ্ধকরণ হলে অনেকটা গতি আনা সম্ভব হবে।
- এই প্রকল্পের সঙ্গো যুক্ত প্রত্যেক বিভাগ/সংস্থার উচিত BPL সার্ভে অনুসারে চিহ্নিত ও তালিকা ভুক্তদের সার্বজনীকভাবে গ্রহণ করা, যাতে কোনো অসঙ্গাতি দেখা দিলে তা মেটানো সম্ভব হয়।
- পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসহ উপভোক্তার তালিকা ও অগ্রগতির খতিয়ান তৈরি করা ও তা জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার।
- কোনো পেশাদারী সংস্থা বা বিভাগের সাহায্যে এই প্রকল্পের সঙ্গো যুক্ত বিভিন্ন বা সংস্থার সঙ্গো সুসমন্বয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

(ঙ) পেনশন ও পারিবারিক পেনশন :

ভারত সরকারের গ্রামীণ ক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পরিচালনায় ১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (National Social Assistance Pragramme) চালু হয়। এই কর্মসূচির তিনটি মূল প্রকল্প হল—

—জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প, (National Old Age Pension Scheme)

—জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্প (National Family Benefit Scheme)

—জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প (National Maternity Benefit Scheme)

২০০০-২০০১ সাল থেকে জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প, পরিবার কল্যাম দপ্তরের অধীনে স্থানান্তর করা হয়। যাইহোক পেনশন ও পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে বিন্যাস নিম্নলিখিত ধারায় তুলে ধরা হল—

(১) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য :

কেন্দ্র সরকার পঞ্চম 'পে-কমিশনের' সুপারিশের ভিত্তিতে পেনশন ও পারিবারিক পেনশন পুনর্বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সুবিধা দানের নির্দেশ জারি করে।

১.(ক) পেনশন :

০১.১.৯৬ সালে যাঁরা অবসর গ্রহণ করবেন তাঁর মূল মাহিনার (Basic Pay) ৫০ শতাংশ হারে পেনশন পাবেন। যাঁরা ০১.১.৯৬ সালের আগে অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁরা পুনর্বিবেচিত মূল মাহিনার ৫০ শতাংশ হারে (যে পে-স্কেলে অবসর নিয়েছেন তার নতুন নির্ধারিত পে-স্কেলের) পেনশন নির্দিষ্ট হবে। ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী যাঁদের অবসর গ্রহণের আগে ১০ মাস চাকরি সম্পন্ন হয়নি এবং নতুন মাহিনার সুবিধা (নিউ পে-স্কেল) গ্রহণে ইচ্ছুক সে ক্ষেত্রে পেনশন নির্ধারণের গড় মাহিনা লাভের শতকরা ৪০ ভাগ বাড়তি সুবিধা মূল মাহিনার উপর প্রযোজ্য হবে।

১.(খ) পারিবারিক পেনশন :

৩৩ বছর কর্মরত থাকার পর কোনো কর্মচারী ১-১-৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করলে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার নতুন পেনশন ফর্মুলা অনুসারে মৃত ব্যক্তির মোট মাহিনার ৩০ শতাংশ হারে পেনশন পাবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী যিনি স্থায়ীভাবে সরকারি অধিগৃহীত বা স্ব-শাসিত সংস্থায় নিযুক্ত ছিলেন।

২.(ক) পেনশন :

সরকারি অধিগৃহীত সংস্থায় সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন এবং অবসর গ্রহণের পর আলাদাভাবে পেনশন তুলেছেন তার ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ কার্যকরী হবে। তিনি নতুন নির্ধারিত হারে পেনশন পাবেন। ১৫.১২.১৯৯৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুসারে এই নতুন পেনশন হার প্রযোজ্য হবে না যদি সেই অধিগৃহীত বা স্ব-শাসিত সংস্থার কর্মী এককালীন পেনশন-এর খাতে কোনো থোক টাকা তুলে থাকেন এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ পেনশন ফেরৎ দেওয়ার জন্য বিবেচিত না হয়ে থাকেন।

২(খ) পারিবারিক পেনশন :

যদি কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো অধিগৃহীত সংস্থায় বা স্ব-শাসিত সংস্থায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না থাকেন, তাহলে সি.সি.এস. (পেনশন) রুলস-৭২ অনুসারে ওই সময়ের জন্য পারিবারিক পেনশন গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অথবা একই হিসাবে পরবর্তী স্তরে সর্বভারতীয় চাকরিতে যুক্ত কোনো ব্যক্তি (Cadre of All India Service) বা রেলওয়েতে কর্মরত কোনো ব্যক্তির অবসর গ্রহণের পর তার মৃত্যুতে পারিবারিক পেনশন এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

(চ) বীমা প্রকল্প :

জীবনধারা : স্বনিযুক্ত ব্যক্তি, শিল্পী, চলচ্চিত্র অভিনেতা/অভিনেত্রী, কারিগর, ব্যবসায়ী, পেশাদার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরকারি কর্মচারীদের মতো পেনশন সুবিধার আওতাভুক্ত না হওয়ার ফলে, তাদের জন্য পেনশন পরিকল্পনা সমৃদ্ধ জীবনধারা প্রচলন করা হয়েছে।

(ছ) ১৯৯৫ সালের কর্মচারী পেনশন প্রকল্প :

১৬.১১.৯৫ সালে চালু হয় কর্মচারী পেনশন প্রকল্প এবং পারিবারিক পেনশন সকল সদস্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়। যিনি ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সদস্য এবং অন্তত ১০ বছর ভবিষ্যনিধির সদস্যপদে আছেন এমন হলে তাঁর ক্ষেত্রেও এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় পেনশন প্রদান বাধ্যতামূলক।

সাধারণভাবে কর্মচারীদের ৫৮ বছর বয়স পূর্ণ হলে অবসর গ্রহণ ও পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও কোনো কর্মচারী ৫০ বছর বয়স পূর্ণ হলেই তিনি অবসর গ্রহণ করতে চাইলে আনুপাতিক হারে অপেক্ষাকৃত কম হিসাবে তিনি পেনশন পাবেন। কর্মচারীর মৃত্যু বা স্থায়ীভাবে অক্ষমতার কারণেও মাসে মাসে পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা এই প্রকল্পে করা হয়েছে। পেনশনযোগ্য মাহিনার উপর ও কর্মরত সময়কালের উপর ভিত্তি করেই পেনশনের মাত্রা নির্ধারিত হয়। ৩৩ বছর অংশ প্রদানমূলক চাকরিতে থাকার পর ৫০ শতাংশ হারে পেনশন পাওয়ার যোগ্য। ৩৩ বছর পূর্ণ হওয়া সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন ও কর্মীর মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রী ৪৫০ টাকা প্রতিমাসে পেনশন পাবেন। যিনি পেনশন তহবিলে অন্তত এক মাস অংশ প্রদান করেছেন তাঁর ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রীকে পারিবারিক পেনশন বাবদ মাসে ১৭৫০ টাকা পর্যন্ত পেনশন প্রদান করা যেতে পারে। বিধবার জন্য পেনশন ছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ পেনশনের ২৫ শতাংশ সর্বাধিক দুজন সন্তান তাদের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পাওয়ার অধিকারী।

মূল পেনশনের ১০০ গুণের সমান মূলধন সহ ১০ শতাংশ কম হারে পেনশন বা ন্যায্য পেনশন গ্রহণ দুই-এর যে-কোনো একটা দিক বেছে নেওয়ার সুযোগ কর্মীদের দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের মূল বেতনের ৮.৩৩% হারে ভবিষ্যনিধি যোজনায় অংশ প্রদানের ভিত্তিতে পেনশন প্রকল্পের আর্থিক সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়। মৃত পারিবারিক পেনশনের সংস্থান ও একত্রীকরণ-এর ফলে নতুন পেনশন তহবিল গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারও এই পেনশন খাতে কর্মীদের বেতনের ১.১৬% হারে পেনশন তহবিলে জমা দিয়ে থাকে।

৬.২ ❑ প্রসূতিকালীন সুবিধা :

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জনদরদী সরকারি নীতি বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রয়াস হিসাবে প্রসূতিকালীন সুবিধা সমগ্র বিশ্বে সর্বজনবিদিত। ভারতীয় সংবিধান (১৯৫০)-এর ৪২নং অনুচ্ছেদে উপযুক্ত ও মানবীয় কাজের পরিবেশ ও প্রসূতিকালীন পরিত্রাণের জন্য রাষ্ট্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের এই বাধ্যবাধকতার বিষয়টি মাথায় রেখে ১৯৬১ সালে সংসদে মহিলা কর্মীদের প্রসূতির সময় এবং তার আগে ও পরে উপযুক্ত সুবিধাদানের জন্য প্রসূতি কালীনসুবিধা আইন পাশ হয়।

৬.২.১ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

প্রসূতিকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা দানের মূল উদ্দেশ্য মাতৃত্বের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা এবং কাজে না থাকা কালীন মায়ের স্বাস্থ্য ও তার গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। দিন বদলের সঙ্গো সঙ্গো কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ার ফলে এই ধরনের প্রসূতিকালীন সুবিধা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যে সমস্ত মহিলারা কারখানায়, কয়লাখনিতে ও শস্যরোপণে নিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ও এই বিধানের ফলপ্রসূ প্রয়োগ যথার্থভাবে হয়ে ওঠেনি।

এই প্রসূতিকালীন সুবিধা আইনের লক্ষ্য হল বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত মহিলা কর্মীদের সন্তান প্রসবের আগে ও পরে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

৬.২.২ সুযোগ ও সুবিধার ধরন ও আইনের বিস্তৃতি :

সমগ্র ভারতবর্ষের এই আইন প্রযোজ্য হবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে—

- প্রত্যেক কারখানা, খনি ও খামার (সরকারি অধনীস্থ প্রতিষ্ঠানসহ)।
- যে-কোনো প্রতিষ্ঠান যা কিনা অশ্বারোহণ সংক্রান্ত খেলা, ব্যায়াম বা দড়াবাজির সঙ্গো যুক্ত বা ওই জাতীয় কোনো কাজ করে থাকে সেখানে কর্মীসংখ্যা যাইহোক।
- যে-কোনো দোকান বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেখানে ১০ বা তার বেশি লোক কাজ করে বা বিগত ১২ মাসের মধ্যে যে-কোনো দিন ১০ জন বা তার বেশি লোক কাজ করেছে এমন।

রাজ্য সরকার এই আইনের বিস্তৃতি যে-কোনো প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক সংস্থা, শিল্প, কৃষিক্ষেত্র বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কার্যকরী ও বলবৎযোগ্য, ঘোষণা করতে পারে।

যাইহোক যেখানে বা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন বলবৎ আছে সেইসব প্রতিষ্ঠানে বা

সংস্থায় বা কারখানায় প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন প্রযোজ্য হবে না। কর্মচারী রাজ্য বীমা আইনের আওতাভুক্ত সংস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো মহিলা কর্মরত হলেও এই আইনের ৫০নং ধারা অনুসারে প্রসূতিকালীন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য না হলে, কারণ তার বেতন মাসে ৩০০০ টাকার বেশি (বা ২। ৯ ধারায় বর্ণিত অর্থ) বা অন্য কোনো কারণে কর্মরত মহিলার যোগ্যতা অর্জন না হলে, যতদিন পর্যন্ত কর্মচারী রাজ্য বীমা আইনের অধীন প্রসূতি সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হন ততদিন তিনি প্রসূতিকালীন সুবিধা আইনের অধীন যাবতীয় সুবিধা ও ছুটি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬.২.৩ প্রসূতিকালীন সুবিধা কি ?

প্রত্যেক মহিলাকর্মী এই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ও প্রত্যেক নিয়োগকর্তা এই সুবিধা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। দৈনিক প্রদত্ত মজুরির গড় হিসাবে প্রকৃত কারণে যে কয়দিন অনুপস্থিত থাকবেন, সেই কয় দিনের মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।

সর্বাধিক একজন মহিলা কর্মী প্রসবের আগে ও পরে মিলে ১৮ সপ্তাহ ছুটি পেতে পারেন। সম্ভাব্য প্রসবের দিন থেকে ৯ সপ্তাহের আগে ছুটি নিতে কোনো মহিলা পারেন না।

১৯৮৯ সালের সংশোধন আইনের আগে কোনো মহিলাই প্রসবের আগে ছুটি নিতে পারতেন না। কেবলমাত্র প্রসবের দিন থেকে ৬ সপ্তাহ ছুটি পেতেন। যাইহোক উল্লিখিত সংশোধনের পরে যদি কোনো মহিলা তাঁর সন্তান প্রসবের আগে ছুটি না নিয়ে থাকেন তাহলে প্রসবের পরে তাঁর প্রাপ্য প্রসূতিকালীন ছুটির পুরোটাই (১৮ সপ্তাহ) ছুটি হিসাবে নিতে পারবেন।

৬.২.৪ কে প্রসূতিকালীন সুবিধা পেতে পারেন :

- প্রত্যেক কর্মরত মহিলা, প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত বা ঠিকাদারের মাধ্যমে অন্তত ৮০ দিন কোনো সংস্থায়/প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকলে এই সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত।
- ন্যূনতম ৮০ দিনের কাজ করার যোগ্যতা সেইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যারা আসাম রাজ্যে বসবাসের জন্য অভিবাসনে এসেছেন এবং অভিবাসনের (immigration) সময় গর্ভবতী ছিলেন।
- বিগত ১২ মাসের মধ্যে কতদিন কাজে যুক্ত ছিলেন তা হিসাব করার সময় ঐ মহিলা কোনো ছুটি নিয়ে থাকলে বা কোনো ছুটির দিন থাকলে, যে সময়ে তার বেতন কাটা হয়নি—এমন দিনকেও কাজের দিন হিসাবে ধরা হবে।

এই আইনে মজুরির পরিমাণ যেমন বিবেচিত হয়নি অন্যদিকে তেমনি কি ধরনের কাজে মহিলাকে যুক্ত করা হয়েছে তাও উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

৬.২.৫ প্রসূতিকালীন সুবিধার জন্য প্রদত্ত নোটিশ :

নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করে প্রসূতিকালীন ছুটি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলা লিখিতভাবে (নির্দিষ্ট ফর্মে) নোটিশ দেবেন—

- যাতে তাঁর প্রাপ্য প্রসূতিকালীন সুবিধা তাঁকে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি (নোটিশে উল্লিখিত)-কে দেওয়া হয়।

- যে সময়ের জন্য প্রসূতিকালীন সুবিধা নিচ্ছেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি অন্য কোনো সংস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন না।
- যাতে, তাঁর সম্ভাব্য প্রসবের দিন থেকে ৯ সপ্তাহ আগে থেকেই (যা নোটিশে উল্লেখ করবেন) তিনি অনুপস্থিত থাকতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় এই নোটিশ দেওয়া বা সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোটিশ দেওয়া আবশ্যক। এই নোটিশ পাওয়ার পর নিয়োগকর্তা তাঁকে প্রসূতিকালীন ছুটিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। কোনো কারণে নোটিশ না দেওয়া হলে ঐ মহিলা প্রসূতিকালীন ছুটির যোগ্যতা হারাবেন।

৬.২.৬ গর্ভবতী মহিলার নিয়োগের নিয়ন্ত্রণ :

- কোনো নিয়োগকর্তাই জেনে শুনে কোনো মহিলাকে তাঁর প্রসবের বা গর্ভস্রাবের বা গর্ভপাতের ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করতে পারবেন না।
- কোনো নিয়োগকর্তাই সম্ভাব্য প্রসবের ৯ সপ্তাহ আগের একমাস কোনো মহিলাকে কোনো ভারি কাজ করতে দিতে পারেন না যার ফল হিসাবে তাঁর স্বাস্থ্যের, তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে বা গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বা গুরুতর কোনো স্বাস্থ্যহানিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এমনকি কোনো গর্ভবতী মহিলাকর্মী তার সম্ভাব্য প্রসবের ৯ সপ্তাহ আগে যদি প্রসূতিকালীন ছুটি না নিয়ে থাকেন তাহলেও এই সময়ের মধ্যে কোনো ভারি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হবে তা করানো যাবে না।

৬.২.৭ অপসারণ বা বহিষ্কার-বাতিলকরণ/অগ্রাহ্য :

এই আইনের বিধান অনুসারে কোনো মহিলা তাঁর কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকেন, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার পক্ষে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত বা বহিষ্কার করার বিষয়টি সম্পূর্ণ বে-আইনি বলে পরিগণিত হবে। এমনকি ওই অনুপস্থিতির সময় সংশ্লিষ্ট মহিলাকর্মীকে বরখাস্ত করার নোটিশ এমন দিন জারি করলেন যার কার্যকারিতা অনুপস্থিতির সময়কালে শেষ হয়ে যায় বা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন যা ওই মহিলার বিপক্ষে যায়—তেমন কোনো বিষয় আইনত বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

অন্য কোনো কারণ ব্যতীত কোনো গর্ভবতী মহিলা কর্মীকে বরখাস্ত বা বহিষ্কার করা কোনোভাবেই তার প্রসূতিকালীন সুবিধা ও চিকিৎসার বোনাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে না। সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সুবিধা তিনি পাবেন।

৬.২.৮ অন্যান্য সুবিধাসমূহ :

- **গর্ভস্রাব বা অসুস্থতার জন্য ছুটি :** গর্ভস্রাব বা স্বাস্থ্যগত ভ্রূণ নাশের কারণে কোনো মহিলাকর্মী উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করে গর্ভস্রাব বা ভ্রূণ নাশের দিন থেকে ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতিকালীন সুবিধা হিসাবে স-বেতনে ছুটি নিতে পারেন।
- **ডিম্বনালী অপসারণে শল্যচিকিৎসার জন্য ছুটি :** শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে ডিম্বনালী অপসারণে (tubectomy)-র জন্য কোনো মহিলাকর্মী উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করে প্রসূতিকালীন সুবিধা হিসাবে

স-বেতনে অপারেশনের দিন থেকে দু'সপ্তাহের জন্য ছুটি নিতে পারেন।

- **অসুস্থতার জন্য ছুটি :** গর্ভাবস্থায় কোনো অসুস্থতা, প্রসবের সময় বা প্রাক্-প্রসবের ফলে উদ্ভূত কোনো জটিলতার কারণে বা গর্ভস্রাব বা স্বাস্থ্যগত ভ্রূণ নাশের ফলে কোনো অসুবিধার কারণে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করে সর্বাধিক এক মাস সংশ্লিষ্ট মহিলাকর্মী স-বেতনে প্রসূতিকালীন সুবিধার হারে ছুটি নিতে পারেন।
- **চিকিৎসা বোনাস :** যদি কোনো নিয়োগকর্তা কোনো মহিলা কর্মীকে তাঁর প্রাক্-প্রসব বা প্রসবোত্তর পরিচর্যা বিনা খরচে না ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে প্রসূতিকালীন সুবিধা হিসাবে ২৫০ টাকা চিকিৎসা বোনাস পেতে পারেন।

৬.২.৯ নিয়োগকর্তার কর্তব্য :

এই আইনের অধীন নিয়োগকর্তার যে দায়বদ্ধতা থাকে তা হল—

- এই আইনের বিধান অনুসারে প্রসূতিকালীন সুবিধা/এবং চিকিৎসা বোনাস ও প্রসূতিকালীন ছুটি ও যে-র ব্যবস্থা করবেন।
- আইনের ৪নং ধারা লঙ্ঘন করে গর্ভবতী মহিলাকে কাজে নিয়োগ করা বা মহিলাকর্মীর প্রসূতিকালীন ছুটিতে থাকার মুহূর্তে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেবেন না।

৬.২.১০ কর্মীদের অধিকার :

কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো হল—

- ইন্সপেকটরের কাছে অভিযোগ জানানোর ও অযৌক্তিকভাবে আটকে রাখা প্রসূতিকালীন সুবিধার দাবি করা।
- নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রসূতিকালীন সুবিধার বঞ্চনা বা চিকিৎসা বোনাস না দেওয়া বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত বঞ্চনা বা বরখাস্তের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আবেদন পেশ করা।

৬.২.১১ নিয়োগকর্তার দ্বারা আইনের বিধানভঙ্গের জন্য সাজা :

- এই আইনে প্রবর্তিত প্রসূতিকালীন সুবিধা দিতে ব্যর্থ হলে নিয়োগকর্তার একবছর পর্যন্ত জেল ও ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ন্যুনতম তিনমাস জেল ও ২০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।
- কোনো মহিলা এই আইনের বিধান অনুসারে ছুটিতে থাকলে এবং সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে বরখাস্ত করলে নিয়োগর্তার ন্যূনতম ৩ মাস জেল যা সর্বাধিক এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং ন্যূনতম ২০০০ টাকা জরিমানা যা সর্বাধিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
- আইনে বর্ণিত কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য কোনো মহিলাকে অযোগ্য বিবেচনা করলেও তা দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত আইনগত বিধান ব্যতীত যা কেবল বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে বেশির ভাগই প্রযোজ্য হয়ে থাকে,

অবিধিবদ্ধ সংস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এমন এক ধরনের কর্মসূচিও সরকার গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির নাম হল—জাতীয় মাতৃত্বজনিত সুবিধা প্রকল্প (National Maternity Benefit Scheme)। এই প্রকল্পের অধীন দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী সন্তানসম্ভবা মাকে সর্বাধিক দুটো জীবিত সন্তানের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম দুটি জীবিত সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত প্রত্যেকটি গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে এককালীন ৫০০ টাকা সন্তান প্রসবের ১২ সপ্তাহ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মায়ের বয়স ন্যূনতম ১৯ বছর হওয়া দরকার।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃত্বজনিত সুবিধা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকল্পটি চালু করে। পরবর্তীকালে বিশেষ কমিটিতে ডেপুটি কমিশনার (উত্তর) ও বিধায়ক বৃন্ধ সহ কাউন্সিল, CDMO, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, সহ অধিকর্তা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সরকারি হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার কমানো ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্প চালু করা হয়। ২০০৪-০৫ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ২০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যাদের BPL কার্ড আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রসবের ১২ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে, অন্যান্য ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে প্রসবের পরেও এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের অধীন প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা লাভের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তপূরণ করা দরকার—

- একটি গ্রামের/এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী হতে হবে।
- কেবলমাত্র প্রথম বা দ্বিতীয় জীবিত সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৮ থেকে ৯ মাসের গর্ভাবস্থার সময় আবেদন করতে হবে।

৬.৩ ❑ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ

সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (১৯২৩) পাশ হওয়ার পরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা বা পেশাগত কারণে নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের পরিবারের ভরণপোষণের সমস্যা মোকাবিলা করাই ক্ষতিপূরণ আইনের মূল উদ্দেশ্য।

এই আইন শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য, স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধকতার জন্য ও সাময়িক প্রতিবন্ধকতা/অক্ষমতার জন্য আলাদা আলাদা হারে ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করেছে। কর্মচারী রাজ্যবীমা (১৯৪৮) আইনের আওতাভুক্ত নয় এমন পেশা বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন প্রযোজ্য হবে। এই আইন শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও কম খরচে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে যা ফৌজদারী আদালতের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই আইনে নিয়োগকর্তার দ্বারা তার শ্রমিককে প্রদেয় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণকে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ও ত্রাণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কোনো কর্মচারীর অবহেলার বিষয়টি এখানে কোনো বিবেচনার মধ্যে আসে না। দুর্ঘটনার ধরন ও ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিপূরণের মাত্রা প্রয়োগে এই আইন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নিয়োগকর্তা এখন বুঝে গেছেন যে শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে যা

এই আইন প্রণয়নের আগে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্তকে কার্যকরী করা এবং নানান ধরনের দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের আদালতের ব্যয় বহনের অক্ষমতার কারণে তাদের ন্যায্য বিচার পাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। কর্মী ও মালিক পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও উভয়ের মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তুলতে এই আইন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে ক্ষতিপূরণের ঝামেলা মেটানো ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে শ্রমিকপক্ষকে যাবতীয় ঝামেলা থেকে এই আইনে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে পেশাগত অসুখ-বিসুখের কারণে কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে শ্রমিককে বা তার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই আইন রেলওয়ে কর্মচারীর ক্ষেত্রে এবং আইনের II-তফশিলে উল্লিখিত ব্যক্তি যারা কারখানায়, খনিতে, আবাদ-কর্মে, নির্মাণকর্মে, গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ কারখানায়, ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মরতদের কথা বলা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় কর্মীর বয়স, মাসের গড় মজুরী, দুর্ঘটনা বা আঘাতের ধরনের উপর ভিত্তি করে। ন্যূনতম ও সর্বাধিক ক্ষতিপূরণের মাত্রা বিশেষ করে মৃত্যুর জন্য (এক্ষেত্রে কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে) ও স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে যা সময় সময়ে পুনর্বিবেচিত হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ গঠন করা হয়েছে। যার মূল কাজ হল শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মপন্থা রচনা করা ও নানান রকমের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। এমনকি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন বলবৎকরণেও এই বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজ্য সরকারের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ কমিশনারের মাধ্যমে এই আইন পরিচালিত হয়ে থাকে।

৬.৩.১ আইনগত প্রতিবিধান :

- একজন নিয়োগকর্তা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য যদি
  - কাজের মধ্যে বা তার নিয়োগ থাকাকালীন কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনার কারণে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হন।
  - কোনো শ্রমিক এমন কোনো ক্ষেত্রে কাজ করতে নিযুক্ত হয়েছেন যেখানে কাজ করার ফলে রোগের সংক্রমণের শিকার হলেন বা আইনে বর্ণিত কোনো পেশাগত রোগের কবলে পড়লেন।
- যাইহোক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।
  - যদি কোনো আঘাত বা দুর্ঘটনার ক্ষত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তিনদিনের বেশি শ্রমিককে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
  - যদি কোনো আঘাত স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বা মৃত্যু না ঘটে এবং যে দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বোঝা যায় যে—
    - দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক নেশাগ্রস্ত ছিলেন বা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।
    - শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রবর্তিত বিধান লঙ্ঘন করে বা কোনো নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে।

● শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রদত্ত কোনো নিরাপদ সামগ্রী বা নিরাপদ আবরণ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করলে।

● রাজ্য সরকার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোনো একটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ কমিশনার নিয়োগ করতে পারে এবং উক্ত গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁকে বহাল করতে পারে। তাঁর কাজের সুবিধার জন্য শ্রম কমিশনার শ্রমিকদের মধ্যে যার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা আছে এমন দু-একজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আসতে পারেন।

- যেদিন থেকে ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে সেই দিন বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। যেখানে ক্ষতিপূরণ দাবির পরিমাণ নিয়োগকর্তার পক্ষে এককালীন দেওয়া সম্ভব হবে না, তিনি তা কিস্তিতে শ্রমিকদের দেবেন বা কমিশনারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।
- যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে (কোন ব্যক্তি প্রকৃত আহত কিনা তা নিয়েও) বা কতটা পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে (আহত হওয়ার ধরন নিয়েও) প্রভৃতি বিষয়ের যা কিছু সমস্যা সংশ্লিষ্ট কমিশনার তা মেটানোর ব্যবস্থা করবেন। কোন ফৌজদারী আদালতের তা মেটানোর এক্তিয়ারে পড়বে না। এই আইনের অন্য যে-কোনো দায়বদ্ধতার বিষয়ে কমিশনারের সিদ্ধান্ত বা মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্য সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেবেন যে, যে-কোনো ব্যক্তি যখন শ্রমিক নিয়োগ করছেন বা ওই জাতীয় কোন লোক নিযুক্ত করছেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ফর্মে, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কতজন আহত হয়েছেন, কি ধরনের আঘাত পেয়েছেন, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কতটা ঠিক হয়েছে, বিগত বছরে নিয়োগকর্তা ক্ষতিপূরণ বাবদ শ্রমিকদের কত টাকা প্রদান করেছেন, অন্যান্য কোন উপায়ে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকলে তা ধরে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিটার্ন দাখিল করবেন।
- যদি কোন নিয়োগকর্তা নোটিশ রাখতে অসমর্থ হয় বা যে বিবরণ কমিশনারের কাছে পাঠানোর কথা তা না পাঠিয়ে থাকেন, বা যে প্রতিবেদন পাঠানোর ছিল তা যদি না পাঠিয়ে থাকেন, বা যদি রিটার্ন দাখিল না করে থাকেন তাহলে আইনত তিনি দণ্ডনীয় হবেন। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন শ্রমিকদের কাজ করতে গিয়ে কোন দুর্ঘটনার কারণে আহত/অঙ্গহানি ঘটলে বা জীবনহানি ঘটলে বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজের জন্য কোন অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হলে, তাদের পরিত্রাণ করা ও তাদের পরিবারকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই প্রবর্তন করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে বিশেষ কিছু শ্রেণীর নিয়োগকর্তাকে তাদের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছে—

(ক) একজন শ্রমিক কে :

শ্রমিক কথার অর্থ যে-কোনো ব্যক্তি (যার নিয়োগ ক্যাজুয়া প্রকৃতির বা নিয়োগকর্তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ) যিনি—

- ১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইনের ৩নং ধারায় বর্ণিত একজন রেলের কর্মচারী যিনি রেলওয়ের প্রশাসনিক, জেলা বা মহকুমা কার্যালয়ে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত নয় এবং তফসিল-২-এ বর্ণিত ওই জাতীয় অন্য কোন ক্ষমতার পদে নিযুক্ত নয়।

- তফসিল-২-এ বর্ণিত ক্ষমতার যে-কোনো স্তরে নিযুক্ত যে-কেউ।

এই আইন প্রবর্তনের আগে বা পরে নিয়োগের চুক্তি হয়েছে কিনা বা ঐ চুক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে, প্রযোজ্য হয়েছে মুখেমুখে বা লিখিত আকারে কিনা।

এই আইন হোটেল ও রেস্তোরাঁতে যেখানে শক্তির মাধ্যমে, জ্বালানি গ্যাসের মাধ্যমে বা অন্য কোন কারিগরি রান্নার শক্তির মাধ্যমে রান্না-বান্না করা হয়ে থাকে ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে।

(খ) কোন্ কোন্ শ্রমিক ক্ষতিপূরণের অধিকারী :

যে-কোনো কর্মী (ঠিকাদারের নিয়োগ করা কর্মীসহ কিন্তু ক্যাজুয়াল কর্মী ব্যতীত) যিনি নিয়োগকর্তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত এবং যিনি কর্মরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনার শিকার হন ও আহত হয়ে থাকেন।

(গ) নিয়োগকর্তার ক্ষতিপূরণ (দুর্ঘটনার) দেওয়ার দায়বদ্ধতা :

এই আইনের আওতাভুক্ত যে-কোনো নিয়োগকর্তা একজন কর্মীকে ক্ষতিপূরণ তখনই দেবেন যদি—

- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণে তিনি মারা যান, সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম হন, স্থায়ীভাবে আংশিক অক্ষম হন, বা সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা অল্প কিছুদিনের জন্য হয়ে থাকে।
- যিনি কর্মরত অবস্থায় পেশাজনিত অসুস্থতার শিকার হন।

(ঘ) নিয়োগকর্তা যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না :

- ❒ সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতার কোন আঘাত তিনদিনের বেশী স্থায়ী না হলে।
- ❒ কোন দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটেনি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দুর্ঘটনার কারণ—
- ওই সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মী কোন নেশার প্রভাবে ছিলেন।
- কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য প্রযোজ্য কোন বিধান বা নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করলে,
- কর্মীর জীবন ও নিরাপত্তার কারণে প্রস্তুত কোন আচ্ছাদন বা নিরাপদ সরঞ্জাম ইচ্ছাকৃতভাবে খুলে রাখলে বা ব্যবহার না করলে।

এইসব ক্ষেত্রে কর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মভঙ্গা বা বিধিভঙ্গোর বিষয়টি প্রমাণ করার দায় নিয়োগ-কর্তার উপর বর্তায়।

- কর্মী এমন একধরনের অসুখে আক্রান্ত যা প্রত্যক্ষভাবে তার কাজের জায়গা থেকে সংক্রমিত নয় বা দুর্ঘটনার ফলে ঘটেছে এমন নয়।
- যখন কোন শ্রমিক তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে ক্ষয়ক্ষতির মামলা রুজু করেছেন।

(ঙ) চুক্তিভঙ্গা :

যদি কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার খর্ব করে, যেহেতু এই আইন অনুসারে নিয়োগকর্তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে বা দায়িত্ব কমিয়ে দিচ্ছে, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.৩.২ অক্ষমতা কি :

কোন দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিকদের আঘাত লাগার ফলে উপার্জন করার ক্ষমতা হারানোই অক্ষমতা বলে বিবেচিত হয়।

- অক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ও আংশিক অক্ষমতা হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। আবার অন্যভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী অক্ষমতা হিসাবেও ভাগ করা যায়। স্থায়ী বা অস্থায়ী অক্ষমতা তখনই সম্পূর্ণ অক্ষমতা হবে যখন কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার ফলে কোন ধরনেরই কাজ করতে না পারেন।
- সম্পূর্ণ অক্ষমতা স্থায়ী অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে যদি একজন শ্রমিক এই আইনের একনম্বর (Part-I of Schedule-1) তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত আঘাত ভোগ করে থাকেন বা একনম্বর তফসিলের দ্বিতীয় অংশে (Part-II of Schedule-I) বর্ণিত উপার্জনক্ষমতার সম্পূর্ণটাই হারিয়ে যায়। স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা বলতে যে-কোনো কাজেই দুর্ঘটনার আগে একজন শ্রমিক যা কাজ করার ক্ষমতা রাখতেন দুর্ঘটনার পরে সেই কাজ করার ক্ষমতা কমে যাওয়া, যে-কোনো আঘাত তফসিল ১-এর দ্বিতীয় অংশে স্থায়ী আংশিক অক্ষমতার বিষয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- অস্থায়ী অক্ষমতা কর্মীদের রোজগারের ক্ষমতা হ্রাস করায় যেখানে দুর্ঘটনার আগে তিনি সম্পূর্ণ রোজগারের ক্ষমতা অধিকারী ছিলেন।

৬.৩.৩ কর্মরত অবস্থায় ও কাজের বাইরে দুর্ঘটনা :

কাজের বাইরে দুর্ঘটনার প্রভাব আঘাত ও দুর্ঘটনার সঙ্গো কর্মরত অবস্থায় কাজ করার মধ্যে খুব সামান্যই পড়ে। নিয়োগ হবে সম্পূর্ণ পৃথক ও দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি। কাজের মধ্যে বা কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য তিনটি পরীক্ষা হল—

- দুর্ঘটনার সময়ে শ্রমিককে নিয়োগকর্তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। তার ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত থাকবে না।
- দুর্ঘটনা এমন জায়গায় ঘটেছে যেখানে শ্রমিক কর্মব্যস্ত ছিলেন।
- আঘাত কোন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনের ফলে বা কাজের প্রকৃতি অনুসারে প্রাপ্ত হতে পারে।

সাধারণ নীতির উপর যা নির্ভরশীল তা হল—

- কাজ করার সময় কাজের সঙ্গো দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের খুব আলগা সম্পর্ক ছিল।
- আবেদনকারীর উপর তার কাজ করার ফলে বা কাজের চাপ নেওয়ার ফলে প্রাপ্ত আঘাতের যথার্থ কারণ দেখানোর দায়িত্ব বর্তায়।
- কাজের সময় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে কিনা, বা মৃত্যুর সময় শ্রমিক কর্মরত ছিলেন কিনা বা মৃত্যুর সময় শ্রমিক কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কিনা তা জানার কোন প্রয়োজন হয় না।

যেখানে সাক্ষ্যদান ভারসাম্য অবস্থায় বা যদি দেখা যায় যে ওই সময় নিযুক্ত কাজে শ্রমিকের ব্যক্তিগত আঘাত লাগার সম্ভাবনা প্রবল ছিল তাহলে ক্ষতিপূরণ লাভে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে অন্যান্য মানুষের মতো এই দুর্ঘটনায় আঘাত লাগা একটি স্বাভাবিক ঘটনা, কোন জটিলতার সুযোগ নেই, বা যেখানে শ্রমিকের নিজের ব্যবহার এমনভাবে প্রদর্শন করতে গেছেন যার ফলে আঘাত পেয়েছেন বা স্বাভাবিক

কর্তব্য সম্পাদনের অঙ্গা হিসাবে যে দুর্ঘটনাকে আঘাত লাগার কারণ হিসাবে দাবি করা যায় না তেমন ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না।

৬.৩.৪ পেশাগত রোগের কারণে ক্ষতিপূরণ :

শ্রমিকদের এমন কিছু ক্ষেত্রে কাজ করতে হয় যেখানে নানান রকমের অসুখ-বিসুখ সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে এবং যা কিনা ওই পেশায় যুক্ত হলেই ছড়ায়, এমন অদ্ভুত রকমের অসুখে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন। এই ধরনের রোগে ভুগলে একজন শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হবেন—এই ক্ষেত্রে তার নিয়োগকর্তা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩নং তফসিলের ক, খ ও গ অংশে (A,B,C of Schedule-III) পেশাগত অসুখের শ্রেণিভেদ করা হয়েছে :

(ক) কোন একজন নিয়োগকর্তার অধীন কর্মরত অবস্থায় তফসিল ৩নং-এর 'খ' অংশে বর্ণিত কোন পেশাগত অসুখে আক্রান্ত হয়ে ছয়মাস ধরে ভুগলে (একই জাতীয় কাজের অন্য নিয়োগকর্তার অধীনে থাকলেও তা সময়কাল এখানে বিবেচিত হবে না)।

(খ) ৩নং তফসিলের 'গ' অংশে বর্ণিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের কর্মরত অবস্থার মধ্যে পেশাগত রোগের সংক্রমণ হলে, তা সে একই বা একাধিক নিয়োগকর্তার অধীন হলেও (সকল নিয়োগকর্তার আনুপাতিক হারে যদি একাধিক নিয়োগকর্তার অধীন কাজ করে থাকেন তাহলে তারাও ক্ষতিপূরণ দেবেন)।

যদি কোন কর্মী কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পেশাগত রোগের সংক্রমণে পড়েন এবং ৩নং তফসিলের ক, খ, ও গ, অংশে বর্ণিত অদ্ভুত ধরনের অসুখ হয় ও সেটা কর্মাবস্থার বাইরে আক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে এই আইনের বিধান অনুসারে তা দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৩.৫ ক্ষতিপূরণের হিসাব :

একজন নিয়োগকর্তার দ্বারা তার শ্রমিককে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের হিসাব নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়ে থাকে—

(ক) মৃত্যু ঘটলে মাসিক বেতনের ৫০% × প্রাসঙ্গিক কারণ বা ৫০,০০০ নগদ যা বেশি হবে এবং ১০০০ টাকা দাহ বা সৎকারের জন্য।

(খ) একনম্বর তফসিলে (Schedule-I) বর্ণিত স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ৬০% × প্রাসঙ্গিক উপাদান বা ৬০,০০০ টাকা যা বেশি হবে।

(গ) আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে (তফসিল-১এর বর্ণনা অনুসারে) যেহেতু লোকসানের শতকরা অংশ উপার্জনক্ষমতার উপর বর্তায় সেহেতু 'খ' অংশের ক্ষতিপূরণ হারেই তা প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে (যা তফসিল ১-এ বর্ণিত হয়নি) যেহেতু লোকসানের শতকরা অংশ উপার্জনক্ষমতার উপর বর্তায় সেহেতু উপরে উল্লিখিত 'খ' অংশের হারেই ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) অস্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে (সামগ্রিক বা আংশিক) মাসিক বেতনের ২৫% এর সমান অর্ধ-মাসিক কিস্তিতে অক্ষমতার কাল পর্যন্ত বা ৫ বছর পর্যন্ত যেটা কম হবে সেই সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।

৬.৩.৬ কখন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ কমিশনারের কাছে জমা হবে :

ক্ষতিপূরণের অর্থ শ্রমিককে সরাসরি প্রদান করা হয় না। সাধারণত নির্দিষ্ট বিবরণী সহ মোট আর্থিক হিসাব কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হয়। কমিশনার তা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের হাতে তুলে দেন। যদি কোন শ্রমিককে বা তার নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সরাসরি কোন অর্থ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় তাহলে তা ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে না। যেমন—

- শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে।
- যদি বড়সড় পরিমাণে কোন অর্থ কোন মহিলাকে বা নাবালককে বা মানসিক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যার প্রাপ্তির যোগ্যতা নিয়ে বিরোধ আছে বা আইনত কোন ব্যক্তি অক্ষমতার অধীন।

এছাড়াও ১০ টাকা বা তার বেশি ক্ষতিপূরণের অর্থ যে ব্যক্তির প্রাপ্য তার অনুকূলে কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে। নিয়োগকর্তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ঐ অর্থের রসিদ উপযুক্ত প্রমাণ বলেই বিবেচিত হবে।

৬.৩.৭ শ্রমিককে বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সরাসরি প্রদেয় অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ :

কোন শ্রমিককে বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত পরিমাণের অর্থ প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া যেতে পারে—

(ক) শ্রমিকের মৃত্যুতে অগ্রিম ক্ষতিপূরণ হিসাবে (ঐ শ্রমিকের তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ) দেওয়া যেতে পারে।

(খ) কোন আইনগত অক্ষমতার শিকার নয় এমন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কর্মীকে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যেতে পারে। অর্ধ মাসিক বেতন যে-কোনো কর্মীকেই প্রদান করা যেতে পারে।

৬.৩.৮ ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তির নথিভুক্তকরণ :

(ক) যেখানে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদেয় আর্থিক বিষয় চুক্তিভুক্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে তার একটি কপি নিয়োগকর্তা কমিশনারের কাছে প্রেরণ করবেন। যিনি তা পাওয়ার পর যথার্থতা বিচার করে নথিভুক্ত আকারে তা লিপিবদ্ধ করণ করে রাখবেন।

(খ) কমিশনার সেই চুক্তিপত্র নথিভুক্ত আকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যদি দেখেন যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের ক্ষতিপূরণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বা ভুল তথ্য ও অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বা অন্য কোন অযৌক্তিক কারণে তা লিপিবদ্ধকরণে কমিশনার প্রত্যাখ্যান করেছেন তাহলে এক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রদান হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(গ) কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তি কমিশনারের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের পরে এই আইন অনুসারে তা

বলবৎযোগ্য হবে এবং এই বলবৎকরণের জন্য ভারতীয় চুক্তি আইন বা অন্য কোন আইন কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

৬.৩.৯ চুক্তি নথিভুক্তকরণে ব্যর্থতার প্রভাব :

যদি কোন ক্ষতিপূরণের চুক্তিপত্র কমিশনারের কাছে লিপিবন্ধকরণের জন্য না পাঠানো হয় তাহলে সেই নিয়োগকর্তা এই আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৬.৩.১০ দাবি পেশ :

- কমিশনারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হবে।
- নিম্নলিখিত পরিস্থিতি ব্যতীত কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে কমিশনারের কাছে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের কোন দাবি গ্রাহ্য হবে না। যেমন—

  (ক) শ্রমিকের কর্মস্থলে দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটলে, নিয়োগকর্তার কাজের এলাকার মধ্যে হলে বা যে-কোনো জায়গায় যেখানে শ্রমিক কাজ করতে করতে মারা গেছেন বা নিয়োগকর্তার এলাকার খুব কাছে কোন জায়গায় মারা গেলে।

  (খ) দুর্ঘটনা ঘটার সময় নিয়োগকর্তার কাছে সে সম্পর্কে নিয়োগকর্তার জ্ঞান থাকলে,

  (গ) যদি আগাম নোটিশ দিতে বা দাবি পেশ করতে ব্যর্থ হয় বা উপযুক্ত কারণ ছাড়াই, হয়ে থাকে।

৬.৩.১১ সীমাবন্ধতা :

শ্রমিক, নির্দিষ্ট ফর্মে দুর্ঘটনা ঘটার দু'বছরের মধ্যে কমিশনারের কাছে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। এই দাবি পেশ হবে নিম্নলিখিত সংযোজন সহ—

(ক) দুর্ঘটনার নোটিশ এবং

(খ) দাবিদার কর্মী প্রয়োজনে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিজেকে হাজির করবে।

৬.৩.১২ সংযোজন ও ক্ষতিপূরণ অর্পণ :

এই আইন অনুসারে কোন ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ব্যতীত অন্য কাউকে যুক্ত করা, দায়িত্ব দেওয়া বা অন্য ব্যক্তি হস্তান্তর করা যাবে না বা অন্য কোন দাবির সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে না।

৬.৩.১৩ নিয়োগকর্তার কর্তব্য :

- আইনের বিধান অনুসারে দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- নির্দিষ্ট ফর্মে কমিশনারের কাছে বিবরণী পেশ করা (নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে) যেখানে শ্রমিকের দুর্ঘটনার কারণে আঘাত বা প্রাণহানির পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতিসহ তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বন্ধ কিনা তা জানাতে হবে।
- দুর্ঘটনা ঘটার কারণে শ্রমিকের প্রাণহানি বা শারীরিকভাবে গুরুতর আঘাত লেগেছে এমন পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটার ৭দিনের মধ্যে কমিশনারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা।
- শ্রমিকদের কর্মস্থলে সহজে পাওয়া যাবে এমন জায়গায় নোটিশ বই রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- সারা বছর ধরে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং দুর্ঘটনার কারণে কত টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে তা জানিয়ে বার্ষিক রিটার্ন পেশ করা।

৬.৩.১৪ শ্রমিকের কর্তব্য :

- দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে নির্দিষ্ট ফর্মে কমিশনারের কাছে নোটিশ পাঠানো এবং যত তাড়াতাড়ি তার পক্ষে সম্ভব হবে, তা করতে হবে।
- প্রয়োজন হলে নিজেকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করা।

৬.৪ ❑ বেকারত্ব সহায়তা :

উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপযুক্ত ও যোগ্য কর্মসংস্থান নীতির অভাবে দিনে দিনে বেড়ে চলা বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলা করা দু-সাধ্য হয়ে পড়েছে। সম্প্রতিকালের একটি পরিসংখ্যান হল নিম্নরূপ।

টেবিল : ১০.৫ : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠনের ৫৫তম (১৯৯৯-২০০০) ও ৬১তম রাউন্ড অনুসারে বেকারত্বের অবস্থা (সর্বভারতীয়)

গ্রামীণ						
পুরুষ				মহিলা		
রাউন্ড	সাধারণ হিসাব	সদ্য সাপ্তাহিক হিসাব	সদ্য দৈনিক হিসাব	সাধারণ হিসাব	সদ্য সাপ্তাহিক হিসাব	সদ্য দৈনিক হিসাব
৫৫তম রাউন্ড (১৯৯৯-২০০০)	২.১	৩.৯	৭.২	১.৫	৩.৭	৭.০০
৬১তম রাউন্ড (২০০৪-২০০৫)	২.১	৩.৮	৮.০	৩.১	৪.২	৮.৭
	পুরুষ		শহুরে		মহিলা	
রাউণ্ড	সাধারণ হিসাব	সদ্য সাপ্তাহিক হিসাব	সদ্য দৈনিক হিসাব	সাধারণ হিসাব	সদ্য সাপ্তাহিক হিসাব	সদ্য দৈনিক হিসাব
৫৫তম রাউণ্ড (১৯৯৯-২০০০)	৪.৮	৫.৬	৭.৩	৭.১	৭.৩	৯.৪
৬১তম রাউন্ড	৪.৪	৫.২	৭.৫	৯.১	৯.০	১১.৬

সাধারণ হিসাব : Usual Principal Status
সদ্য সাপ্তাহিক হিসাব—Current Weekly Status
সদ্য দৈনিক হিসাব—Current Daily Status

সূত্র : ৬১তম রাউন্ড সার্ভে করা হয় জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৫ পর্যন্ত।

বেকারত্ব জনিত সহায়তার ধারণা বলতে প্রথমেই মনে আসে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে বেকারদের হাতে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান। বিশ্বের বহু দেশে বেকারত্বের সহায়তাকে ভরণপোষণ নীতি হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। ভারতের মতো ঋণজর্জরিত দেশের পক্ষে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক বেকারত্ব সহায়তা দিয়ে সকলের ভরণপোষণ সুনিশ্চিত করার সামর্থ্য নেই। তবুও এই দেশের বেকারদের কথা মাথায় রেখে নানান রকমের প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নানান উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে। নিম্ন আয়ের স্তরে থাকা মানুষের জন্য ও বেকারদের জন্য শ্রম-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে দেশীয় বিনিয়োগ ব্যবস্থার মূলস্রোতে বেশীরভাগ নাগরিকের ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে। সামাজিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে ও দেশীয় উৎপাদনশীলতার প্রতি গুরুত্বরোপ করে বেশ কিছু বড় আকারের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে ৯০-এর দশকে দেশের প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ অনুন্নত জেলাকে এর আওতায় এনে মাথাপিছু বছরে গড়ে ২০ দিনের কাজের সহায়তা দেওয়া হয়।

বেকারত্বের সহায়তা ও পাশাপাশি ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ :

১৯৫০ সালের পর থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সময় থেকে ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো ও বেকারত্ব দূরীকরণে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বিগত তিন দশক ধরে বেকারত্ব দূরীকরণের নানারকম সমস্যা ও তার মোকাবিলায় পরবর্তীকালের সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে ও উপযুক্ত প্রকল্প রচনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে বেকারদের সমস্যা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। কমিশনের (১৯৭০) বিশেষ নজর দেশের বেকার সংখ্যার উপর পড়ে। দেখা যায় শিক্ষিত বেকার, বিশেষ করে যাঁরা মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন এঁদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বেকার সমস্যাকে দেশের বৃহত্তম সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কিছু বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে ও উদ্যোগ স্থাপনের সহায়তা দিয়ে স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের সুযোগ তৈরি করা, ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত আইনানুসারে শিক্ষানবিশ (Apprenticeship Training Scheme) প্রকল্প চালু করা যা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে আবার সংশোধন করা হয়। কেন্দ্রীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment) ও SEEVY (Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youth in Urban Areas) প্রকল্প দুটো রূপায়ণ করা হয়। উভয় প্রকল্পই শিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বনের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রকল্পের নানান দিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের মাধ্যমে প্রয়োজনভিত্তিক পরিমার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও বর্তমানে তাদের বেশ কিছু প্রকল্প চালু আছে। আবার বেশ কিছু প্রকল্পকে একসঙ্গো সংযুক্ত করে সংহতিমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। এদের কয়েকটি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

৬.৪.১ জাতীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র/কর্মসংস্থান সেবা :

সারা দেশ জুড়ে শ্রম মন্ত্রকের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ডাইরেক্টরেটের আওতায় প্রায় ৯০০ কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মীদের সঙ্কট ও বেকার মানবশক্তির সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যাইহোক প্রত্যেক বছর কাজের আশায় নিবন্ধনকৃত বেকারের তুলনায় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ পাওয়া লোকের সংখ্যা খুবই সামান্য। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৫ সালে প্রায় ৮৯৫টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র ৫.৯ মিলিয়ন কর্মপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করে কিন্তু শূন্যপদের সংখ্যা বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয় যে ৩,৮৬,০০০ হাজারের বেশি হবে না। এমনকি ঐ সব পদে ৩.৬ মিলিয়ন আবেদনের ভিত্তিতে ২,১৫,০০০ পদে কর্মসংস্থান হয়। ঐ বছরের শেষে ৬.৭ মিলিয়ন কর্মপ্রার্থী জীবন্ত নিবন্ধীকৃত (Live Registered) ছিলেন। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচনায় সরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে (সরকারি প্রশাসনিক বিভাগসহ) কর্মী বাছাইয়ের কাজে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র কার্যত অস্তিত্বহীন (পরিকল্পনা কমিশন-১৯৯৮, ভলিউম-II, পৃ ৪৫৩)

৬.৪.২ শহুরে বেকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প :

১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ পর্যন্ত শহুরে বেকারদের জন্য ভারতবর্ষে একটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু ছিল যার নাম ছিল প্রধানমন্ত্রীর শহুরে বেকারদের জন্য প্রকল্প (Prime Minister's Scheme for Unemployed Urban Youth)। ১৯৯৪-১৯৯৫ সাল থেকে এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তিত হয় এবং ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী শহুরে বেকারদের সহায়তার জন্য (যেসব শহরে এক মিলিয়ন লোকের বাস এবং বার্ষিক গড় পারিবারিক আয় ১০,০০০ টাকা) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা চালু করা হয়। ব্যবসা, সেবাপ্রদানকারী ও শিল্পজাতীয় স্বনির্ভর উদ্যোগ গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক লোনের পাশাপাশি এই প্রকল্পের অধীন মূলধনের ২৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এখানে উদ্যোগীদের কোন প্রান্তিক অর্থের (Margin money) প্রয়োজন হয় না। দেখা যায়, এক দশকের মধ্যে ৩৯১.৬ মিলিয়ন বেকার যুবক-যুবতীকে মোট ৩১.৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মাথা পিছু সাহায্যের গড় হিসাব ২০,০০০ টাকার বেশি (পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৮৪)।

শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক মিলিয়ন-কে স্বনিযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২রা অক্টোবর ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা ও শিক্ষিত বেকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প চালু করা হয়। সাধারণত ১৮-৩৫ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির জন্য এই সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থের সীমারেখায় থেকে যে-কোনো উদ্যোগ স্থাপনের জন্য যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ২৪,০০০ টাকা বা তার কম তাদের কোন সমান্তরাল জামিন ছাড়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এমনকি দুই বা তার বেশী বেকার যুবক-যুবতী একসঙ্গে কোন কাজ করলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বাড়তেও পারে বা অনেক বড় টাকার প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কঋণের জন্য প্রদত্ত প্রকল্পব্যয়ের ৫% তাদের বহন করতে হবে এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫% অনুদান (যা ৭৫০০ টাকার বেশি হবে না) দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এর জন্য যে-কোন শিক্ষিত বেকার যিনি মাধ্যমিক পাশ বা ফেল এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (I.T.I)

থেকে বা যে-কোনো সরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে অন্তত ৬ মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া দরকার। শহরে বা গ্রামের একটি অঞ্চলে অন্তত তিন বছর ধরে বসবাসকারী ও সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প কেন্দ্র বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো যোগাযোগ রেখে এই সহায়তা পেতে পারেন। এই প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়ার পর অন্তত চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং এই চার সপ্তাহে ৩০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। বছরের শুরুতে নির্দিষ্ট করা লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ভারতের তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আওতায় এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থাৎ প্রথম বছরে প্রায় ৩২,০০০ যুবককে ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে ২,২০,০০০ বেকারকে সহায়তা দানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়। SEEUY ও PMRY প্রকল্পের মাধ্যমে আরও বেশি বেশি গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় (মেট্রোপলিটন শহরসহ) স্বনিযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

৬.৪.৩ গ্রামীণ যুবকদের স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষণ (Training of Rural Youth for Self Employment) :

১৯৭৯ সালের ১৫ই আগস্ট এই প্রকল্প চালু করা হয় গ্রামীণ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বেকার যুবকযুবতীদের ন্যূনতম কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষি ও সংযুক্ত ক্ষেত্র, ব্যবসা, কারখানায় ও শিল্পের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির বা মজুরিভিত্তিক নিয়োগের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক, অনাথদের ক্ষেত্রে ১৬ বছরের বেশি, বিধবা বা বন্দী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পর্যন্ত ও কোন কলকারখানা থেকে উৎখাত হওয়া লোকেদের ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পের অধীন অন্তত ৫০% তফসিলি উপজাতিভুক্ত পরিবারের এবং ৩% প্রতিবন্ধীভুক্ত বেকারদের সহায়তা দেওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোন না কোন শিল্পকেন্দ্র, সেবা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা মাস্টার কারিগর-এর মাধ্যমে প্রথাগত উপায়ে প্রদান করার কথা বলা হয়।

জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র এই ধরনের প্রশিক্ষণের সূচি ও আলোচ্য বিষয় ঠিক করে থাকে এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য সমন্বয় কমিটি (State Level Coordination Committee) -র বিশেষ অনুমোদন ছাড়া এই প্রকল্পের কোন প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাসের বেশি হয় না। মোট খরচের ৫০% রাজ্য সরকার ও ৪০% বহন করে কেন্দ্র সরকার বা বাকি পুরোটাই বহন করে (কিন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর ক্ষেত্রে পুরো প্রশিক্ষণ প্রকল্পব্যয় কেন্দ্র সরকার বহন করে থাকে)। প্রশিক্ষার্থীকে স্টাইপেন্ড দেওয়ার, প্রশিক্ষকের সাম্মানিক ভাতা প্রদান, প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্যদিনের খরচ সরকার বহন করে থাকে।

প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ সামগ্রী (১৯৯৪-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ২০০০ টাকা পর্যন্ত মাথা-পিছু ব্যয় এবং ৩১শে মার্চ ১৯৯৪ পর্যন্ত মাথাপিছু ৬০০ টাকা ব্যয়) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের প্রতিটি জেলায় প্রচলিত সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও ব্যাঙ্কঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ বছরের মধ্যে প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন গ্রামীণ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৯০-১৯৯২ সালের (যখন ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচনা হয়) প্রতিবেদনে বলা হয় যে

প্রশিক্ষণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রায় বেশিরভাগটাই পূরণ করা গেছে। দেখা গেছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের ৫৩% স্বনিযুক্ত হতে পেরেছেন যাদের প্রায় ১/৪ অংশ মজুরিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত। মাথাপিছু প্রশিক্ষণব্যয় প্রায় ১৫৩৫ টাকা (১২১০ টাকা বা ৭৯% হল নিয়মিত খরচ ও বাকি অংশ স্থায়ী সম্পদ খরচ)। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় ৪২ শতাংশ প্রশিক্ষার্থী মহিলা ও ৩৯% প্রশিক্ষার্থী তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত সম্পদায়ের যুবক-যুবতী। ৮ম পরিকল্পনা কালে (৯২-৯৭) প্রায় ১.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যাদের প্রায় ৪৯% কোন না কোন জায়গায় নিযুক্ত (এদের প্রায় ৬৯% স্বনিযুক্ত)। দেশের ১০টি প্রধান রাজ্য থেকে ৬১টি জেলাকে নিয়ে ১২২টি ব্লক চিহ্নিত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মনিটরিং বিভাগের উদ্যোগে ১২২০ জন উপভোক্তার সঙ্গে (১৯৯৩ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত) কথা বলা হয়। 'তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন'-এর নামে মন্ত্রকের এই উদ্যোগে দেখা যায় কেবলমাত্র ৪% উপভোক্তা কোন না কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের প্রায় ১/৩ অংশ উপভোক্তা কারিগরি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বাকিদের ১/৩ অংশ হস্তশিল্পে, প্রায় ১৮% তাঁত-বুনন, ২% প্রাণী পালন ও ২% খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ১১% অন্যান্য শিল্প সামগ্রীর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এদের বাদ দিয়ে দেখা গেছে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রায় ৪৮% স্বনিযুক্ত ও বাকি ৫২ শতাংশ কোথাও নিযুক্ত হতে পারেননি। স্বনিযুক্তদের মধ্যে ২৮ শতাংশ মজুরিভিত্তিক নিযুক্ত। এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা ট্যাবুলেশনে দেখা যাচ্ছে যে, ১/৩ অংশ উপভোক্তা স্বনিযুক্ত হয়েছেন যাদের বেশির ভাগটাই যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেই ক্ষেত্রেই নিযুক্ত। (প্রায় ৬২% প্রশিক্ষার্থী অপ্রধান ক্ষেত্রে/আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে ও ১/৩ অংশ শিল্প/বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বনিযুক্ত) প্রায় ৬৩% প্রশিক্ষার্থী জানিয়েছে তাদের মাসিক ভাতা (stipend) অপর্যাপ্ত। যদিও ২১% জানিয়েছেন যে তারা প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৯২% জানিয়েছেন যে তাদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন হয়েছে ও বাকিদের উদ্যোগপতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন হয়েছে। প্রায় ২/৩ অংশ প্রশিক্ষার্থী লক্ষ করেছেন যে প্রশিক্ষণের মেয়াদটা পর্যাপ্ত নয়, অন্যদের মতামত হল প্রশিক্ষণজনিত সহায়তা উপযুক্ত নয়, হাতে নাতে কাজ শেখার সুযোগ কম, প্রভৃতি।

৬.৪.৪ অন্যান্য বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্প :

শিক্ষিত বেকার ও অন্য বেকারদের জন্য কেন্দ্র সরকারের ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিশেষ ধরনের কিছু কর্মসংস্থান প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে তারা বিশেষ সহায়তা পেতে পারেন। তা হলো—

(ক) শহুরে ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প (বা Scheme of Urban Microenterprise)—যার অধীন সমস্ত শহরাঞ্চলের উপযুক্ত উপভোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সরকার প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা ও ব্যাঙ্কঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

(খ) শহুরে মজুরিভিত্তিক নিয়োগ প্রকল্প (Scheme for Urban Wage Employment)—এর মূল লক্ষ্য ১,০০,০০০ এর বেশি জনসংখ্যাযুক্ত শহরাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাব গড়ে তোলা সম্পদের মাধ্যমে গরীব ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের মজুরিযুক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(গ) বাসস্থান ও আবাসের মান উন্নয়ন প্রকল্প (Scheme for Shelter and Housing Upgradation)-এর মাধ্যমে ১,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ জনবসতিপূর্ণ শহরের উৎসাহী ব্যক্তিদের নির্মাণক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ

দেওয়া ও দারিদ্র শ্রেণীর মানুষের বাসস্থান বা আবাসনের মানোন্নয়ন বা মেরামতির কাজে HUDCO (Housing and Urban Development Corporation) সহায়তায় তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) উপরোক্ত শহুরে নানান রকমের প্রকল্প ব্যাতীত কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (মহারাষ্ট্রে)-এর পাশাপাশি জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করা হয় ১৯৯৩ সালে। মূলত চাহিদাভিত্তিক কর্মনিশ্চয়তার এই প্রকল্পে একটি পরিবারের ১৮ থেকে ৬০ বছরের যে-কোনো দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের বছরের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য ফাঁকা সময়ে ১০০দিনের কাজের সংস্থান হবে। এই প্রকল্পের অধীন প্রথমে ২৬১টি জেলার পিছিয়ে পড়া ১৭৭৫টি ব্লক চিহ্নিত করা হয় এবং পরে তার সুযোগ আরও ৬৬৮টি ব্লকে বিস্তৃত করা হয় যেখানে বন্যাকবলিত ১৭টি ব্লককেও এর আওতায় আনা হয়। ১৯৯৬ সালের জওহর রোজগার যোজনায় ১২০টি জেলার ৭২২টি ব্লককে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে যুক্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১লা এপ্রিল সমগ্রদেশের গ্রামীণ অঞ্চলকে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় আনা হয় (পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯৮)।

৬.৪.৫ স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা :

১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল অতীতের সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পকে একই ছাতার তলায় এনে সামগ্রিক কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প হিসাবে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা প্রচলিত হয়। মূল ফোকাস দেওয়া হয় দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বনির্ভর দলগঠন ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন বাড়ানো, নিজেদের মধ্যে ঋণ দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি বহুমুখী কাজের উপর। ইন্দিরা আবাসের মতো কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আর্থিক সহায়তাদানের ৭৫ : ২৫ অনুপাতে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ২৪.৩৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে সারা দেশে যাদের মধ্যে ৭৩.২৫ লক্ষ স্বরোজগারীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট ১৬,৪৪৩.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই খাতে।

৬.৪.৬ সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা :

গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য ২০০১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প চালু হয় যার অধীন মজুরি হিসাবে নগদ অর্থ ও খাদ্যশস্য দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ইন্দিরা আবাস যোজনা বা স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার-এর মতো এই প্রকল্পেও কেন্দ্র ও রাজ্য ৭৫:২৫ অনুপাতে তহবিল বণ্টন ব্যবস্থা করা হয়। কেবলমাত্র খাদ্যশস্য রাজ্যগুলিতে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পুরোটাই কেন্দ্র সরকার দিয়ে থাকে, ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে মধ্যে মোট ৮২.১৮ কোটি শ্রমদিবসে শ্রমবিনিয়োগ করা হয় যার জন্য মোট নগদ অর্থ ৫৪৯৭.৪৩ কোটি টাকা এবং প্রায় ৩৭.৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রাজ্যগুলিকে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিটিং অনুসারে বিশেষ উপাদান হিসাবে এস.জি.আর. ওয়াই-এর অধীন ১১টি দুর্যোগপ্রবণ রাজ্যের জন্য ১৫.৬৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বণ্টন করা হয়। ৩১শে অক্টোবর ২০০৬ সালের মধ্যে ১৮.৪১ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করা হয়। যেখানে কেন্দ্র সরকার খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ বাবদ ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেয় যথাক্রমে ১৬.৬৭ লক্ষ টন ও ২৭৬২ কোটি টাকা। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ উপাদান হিসাবে দুর্যোগপ্রাপ্ত রাজ্যগুলোর জন্য ৪.৪৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেওয়া হয়।

৬.৪.৭ স্বর্ণজয়ন্তী শহরী স্বরোজগার যোজনা :

অতীতের শহরী স্বনিযুক্তি প্রকল্প ও শহুরে কর্মসংস্থান প্রকল্পের মতো দুটো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে একত্রে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর স্বর্ণজয়ন্তী শহরী স্বরোজগার যোজনা নামে একটি প্রকল্পের রূপদান করা হয়। শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের মধ্যে এই প্রকল্প একটি সামগ্রিক ও সুসংহত প্রকল্প হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ৭৫:২৫ অনুপাতে প্রকল্পব্যয় বহনের শর্তে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। শহুরে দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষকে আর্থিক সহায়তা দান, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠীতে সংগঠিত করা ও নানান ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৫-০৬ সালে ০.৯৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা দেওয়া হয় যেখানে ০.৮০ লক্ষ দরিদ্র মানুষের সহায়তা দানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর (২০০৬) সমাপ্ত বছরে ১.২০ লক্ষ্য দরিদ্র মানুষের সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ০.৫৩ লক্ষ মানুষকে সহায়তা দানের লক্ষ্য মাত্রা পূরণ হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে ১ লক্ষ বেকারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০০৫-০৬ সালে ১.৪২ লক্ষ বেকারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০০৫-০৬ সালে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ৪৩.৪৮ লক্ষ ও বছরের (২০০৬) শেষে ১.৭৮ লক্ষে উপনীত হওয়া গেছে। ২০০৫-০৬ সালে ও ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৬ সাল পর্যন্ত সমস্ত হিসাব মিলে সমষ্টিভিত্তিক পরিকাঠামো খাতে ৩৩৭.৪ লক্ষ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়।

৬.৪.৮ জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প :

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রবর্তিত জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন পাশ হয় এবং ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া ২০০টি জেলাতে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের বছরে অন্তত ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দানের জন্য জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্প অতীতের সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা ও জাতীয় খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্প দুটি প্রাথমিকভাবে এই ২০০টি জেলায় একই ছাতায় আনা হয়। ৫বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত জেলায় জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেহেতু গ্রামীণ চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প সেহেতু এই প্রকল্পের মুল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে—জল সংরক্ষণ, খরা প্রতিরোধ, বনসংরক্ষণ/বৃক্ষরোপণ, ভূমির উন্নয়ন, বন্যা প্রতিরোধ, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা (পথঘাট) প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়। ২০০৬-০৭ সালে অনুমোদিত ১১৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩১শে জানুয়ারী ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৬, ১৭৪ কোটি টাকা ছাড়া হয়। ঐদিন পর্যন্ত ৩.৪৭ কোটি জব কার্ড বণ্টন করা হয় এবং ১.৫ কোটি কাজ চাওয়া পরিবারের মধ্যে ১.৪৭ কোটি পরিবারকে কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৩.৬৫ কোটি শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ২১.১৩ কোটি ছিল মহিলাদের জন্য। অন্যদিকে ৫.৮১ লক্ষ কাজ হাতে নিয়ে ২.৩৪ লক্ষ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি ছাড়াও সারা বছর ধরে ভারত সরকার স্বনিযুক্তির জন্য উদ্যোগ স্থাপন ও বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ধরনের উপায় অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু কোন প্রকল্পের পক্ষেই ভারতের মতো জনবহুল দেশের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একদিকে অভাবগ্রস্ত মানুষের ঢল অন্যদিকে সম্পদের অপর্যাপ্ত অবস্থার মাঝখানে পড়েও দেশের সরকার পরোক্ষভাবে

ও পরোক্ষ উপায়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বনিযুক্তির প্রক্রিয়ায় আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার চেষ্টা করে। এগুলি হল নিম্নরূপ—

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকারীদের সংগঠনের ভূমিকা :

দেশের শ্রমিক সংগঠন/ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও দরিদ্র বেকারদের জন্য নতুন কাজের সুযোগ তৈরির স্বার্থে তাদের আগ্রহ তেমন দেখা যায় না। নিয়োগকারী সংগঠনগুলি তাদের নতুন ও তরুণ কর্মীদের নানান ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করার চেষ্টা করে থাকে। তাদের অনেকে এই দক্ষতাকে তাদের সংগঠনের স্বার্থে ব্যবহার করে ও দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করে, এমনকি আসন্ন বছরগুলিতে এই দক্ষতা কত বেশি কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা করে। যাইহোক সমস্যার মাত্রা নিয়োগকর্তার সক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়। যার ফলে আরও বেশি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পথপ্রদর্শন :

সাদা পোশাকের চাকরির চাহিদার সঙ্গো চাকরি করার লোকের মধ্যে হিসাবের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ১৯৫০ সালের পর থেকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পূর্বে বর্ণিত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে কর্মসংস্থান দেওয়ার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরামর্শ ও পথপ্রদর্শনের কাজ করা হয়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৮৯৫টি কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের মধ্যে ৩১৪টি কেন্দ্র ও ৮৪টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র ঐ সেবা প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশত এইসব কেন্দ্রে যারা আসেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খবর ও সেবা প্রদান করলেও বিদ্যালয় ও কলেজস্তরে যাদের যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয় তারা এই কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মূলত শহরকেন্দ্রিক পরিষেবা হয়ে দাঁড়ায় (ব্যতিক্রম শুধুমাত্র যেসব গ্রামের শিক্ষিত মানুষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করেছেন ও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন)। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি যা ১৯৯২ সালে পুনর্বিবেচিত হয়, তা প্রবর্তনের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকে বৃত্তিকরণ শিক্ষায় (Vocationalisation) রূপান্তরের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৫ ও ২০০০ সালের বিশেষ উদ্যোগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অন্তত ১০ থেকে ২৫ শতাংশের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কর্মপ্রার্থীর সংখ্যার সঙ্গো বাজারে কর্মসংস্থান সুযোগপ্রাপ্ত ও প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গো সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার আশু সমাধানের ব্যবস্থা করা। এমনকি উচ্চশিক্ষা লাভের দিকে না গিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে ঝোঁকে তা দেখাও অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল। কৃষি, শিল্প, কারিগরি, প্রযুক্তিগত, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়ক পরিষেবার এবং গৃহবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১৫০ রকমের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ/শিক্ষার সুযোগ করা হয়। ১৯৬১ সালের এ্যাপ্রেনটিসশিপ আইনেও প্রায় ৬০টি অতিরিক্ত পেশাগত শিক্ষার বিষয় চিহ্নিত হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় ১.১৬ মিলিয়ন মাধ্যমিক পাশ ছেলে-মেয়েকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে উৎসাহ দানের লক্ষ্য স্থির করে। ৩১শে মার্চ ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ৫৭০১টি স্কুলের ১৬,৪৫০টি বৃত্তিমূলক

ক্ষেত্রে প্রায় ০.৯১ মিলিয়ন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। যদিও গুণগত বিষয় নিয়ে এই বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের নানান প্রশ্ন ওঠে তবুও বলা যায় যে সরকারিভাবে এই উদ্যোগ স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে আশার আলো দেখিয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা ও নানা রকমের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে ভূপালে একটি কেন্দ্রীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয় (পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯৬)।

৬.৫ ❑ অনুশীলনী :

(ক) বার্ধক্যজনিত ভাতার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(খ) প্রসূতিকালীন সুবিধার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতরকমের প্রসূতিকালীন সুবিধা আছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(ঘ) বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারি উদ্যোগগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন। বেকার সমস্যার মোকাবিলায় আরও কি করা যেতে পারে, তা বর্ণনা করুন।

একক ৭ ❑ তফসিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের উপায় পর্যালোচনা

গঠন

৭.১ সামাজিক নিরাপত্তার প্রাসঙ্গিকীকরণ

৭.২ প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নশীল দেশ

৭.৩ উন্নয়নশীল দেশের উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৪ মহিলাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৫ তফশিলি জাতি ও সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৬ তফশিলি উপজাতিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৭ প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৮ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.১০ অনুশীলনী

৭.১ ❑ সামাজিক নিরাপত্তার প্রাসঙ্গিকীকরণ

উন্নত দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে সামাজিক নিরাপত্তার একটি দীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে বার্ধক্যভাতা, বীমা, স্বাস্থ্যজনীন নানা রকমের সুবিধা প্রভৃতি দানের মাধ্যমে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ও দরিদ্রদের জন্য নানান ধরনের নিরাপত্তাজনিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে সমসাময়িক গবেষণা বা নীতি প্রণয়নের প্রশ্নে যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে ওঠেনি। পরিকল্পনার কাগজপত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তার তেমন প্রতিফলন ঘটেনি। সেই কারণে, এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানা, সমস্যার দিকগুলো খতিয়ে দেখা, উপযুক্ত ও কার্যকরী সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানমুলক কর্মসূচি রচনা ও নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

১৯৯১ সালের আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতকে সবদিক দিয়ে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, পাশাপাশি কার্যকরী সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচী গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের পক্ষে এই অর্থনৈতিক সংস্কার অনেক পথের দিশা দেখিয়েছে। বহু সরকারি অধিগৃহীত সংস্থাকে বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করার ফলে বহু শ্রমিককে ছাঁটাই করতে হয় যাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার দায়বদ্ধ ছিল। এমনকি নানান ধরনের আইনগত প্রতিবিধানের ফলে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অনুদানযুক্ত ঋণদান প্রকল্পের সুবিধা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও অনুদানযুক্ত ঋণদান প্রকল্প

ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, উন্মুক্ত অর্থনীতির ফলে চাহিদা অনুযায়ী কৃষিজপণ্য কম হওয়ার দরুন বাজারে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। দেশের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে বেশি দামের জিনিসপত্র কেনা ও জীবনযাপনের বর্ধিত ব্যয়ভার বহন করে জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক সংস্কার প্রচলিত হওয়ার আগে দেশের একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করে। অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হোক বা না হোক সামাজিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি আরও বেশি করে মাথাচাড়া দেয়। এক শ্রেণির চিন্তাবিদদের ধারণায় অর্থনৈতিক সংস্কার দেশের বহু দিকে সুবিধা দান করলেও বহু নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। একদিকে যেমন কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অন্যদিকে তেমন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত বা ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (International Labour Organisation) প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান ছিল। মূলত সরকারি উদ্যোগে সামাজিক সহায়তা ও সামাজিক বীমা সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণ। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় যে, খেয়ে-পরে-বেঁচে থাকার অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা সমাজের সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সেখানে কেবলমাত্র সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমাজের সংশ্লিষ্ট মানুষকে সহায়তা দান করা হচ্ছে। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কেবলমাত্র দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সরকারি সহায়তা, অন্যথায় দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির আয়ের ও কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে উন্নত দেশগুলোর নানান সম্প্রদায়/সমষ্টিস্তরে নানান রকমের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যেহেতু বিশালসংখ্যক অবহেলিত ও নানান রকমের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নিরাপত্তামূলক সামাজিক উদ্যোগ তেমন সক্রিয় নয়, সেহেতু উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নিরাপত্তার মতো বিষয়ের গুরুত্ব বেশি বেশি করেই অনুভূত হয়। বিশ্বায়নের সঙ্গো সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তারও বিশ্বায়ন ঘটে। কোন দেশ কত বেশি সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করছে তারই অনুসন্ধান শুরু হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন ধারণা ও সংহতি স্থাপনের কাজে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্প (United Nation's Development Programme) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার মূল ক্ষেত্রে হিসাবে সামাজিক ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা ও মানব নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Social Risk Management) বলতে কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীকে তাদের অসহায় অবস্থার দূরীকরণের জন্য আয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার, পর্যাপ্ত ভোগ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান অব্যাহত রাখতে সাম্য ও সংহতির মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়। যেহেতু একটি বিশেষ পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা, মানব নিরাপত্তা এখানে মূলত সকল মানুষের নিরাপদ জীবনযোপনের সঙ্গো সম্পর্কিত। বিশেষ করে ক্রমাগত অনাহার, রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা, বাড়িতে বা কর্মস্থলে দৈনন্দিন ভয়ানক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষা করা প্রভৃতির মাধ্যমে মানব নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসাবে মানব নিরাপত্তা বিধানের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা ভিত্তি করে মানুষের বঞ্চনার মোকাবিলা ও মানব উন্নয়নের জন্য প্রবর্তিত যে-কোনো উদ্যোগকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানব

উন্নয়ন উদ্যোগের সঙ্গো সামাজিক নিরাপত্তার রূপায়ণগত কিছু বৈষম্য মেনে চলার দরকার হয়। সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে ক্রমশ পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষকে তার দুঃস্থতা ও অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা দেওয়া হয় এবং বিশেষ কোনো আর্থিক সঙ্কটের সময়ে জীবনের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সঠিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের পূর্বশর্ত হিসাবে মানব উন্নয়নকে দেখা হয়। কারণ মানব উন্নয়ন উদ্যোগের ফলে ব্যক্তি তার সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করে। অর্থনৈতিক সঙ্কট বা অন্য কোনো দুর্ঘটনার কারণে ন্যূনতম মানের উপযুক্ত জীবন ধারণের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা একটি প্রতিবিধানের কাজ করে থাকে। যেহেতু, সামাজিক ঝুঁকির মোকাবিলার একটি অন্যতম উপায় হিসাবে দেখা হয় সেহেতু, সামাজিক নিরাপত্তার মাত্রা কখনো কমানো যায় না। উন্নত দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান কখনোই সামাজিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ রাখা হয় না বা মানব উন্নয়নের সমান হিসাবেও দেখা হয় না। ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে সরকারি উদ্যোগ ও কর্মসূচি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭.২ ❑ প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নশীল দেশ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ১০২ নং সম্মেলনের (১৯৫২) বিশেষ মতামতের ভিত্তিতে প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গো সংযুক্ত বলে বিবেচিত। যথা—

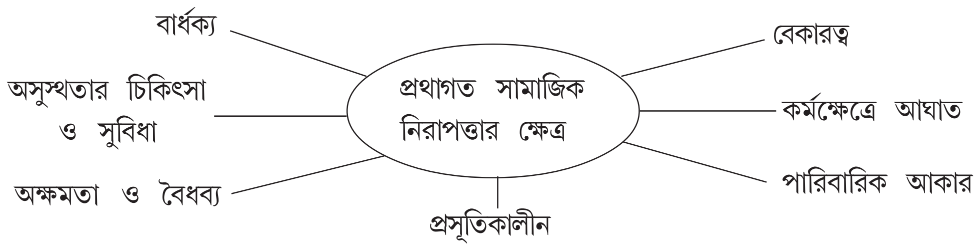

উপরোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করলেও উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে একাধিক সমস্যার সূত্রপাত হয়।

প্রথমত, দুর্ঘটনা বা সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার সুবিধা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পাওয়া যায় না। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা দেওয়া হয় অধিকাংশ দেশে, এমনকি বার্ধক্য ও অক্ষমতার কারণে নিরাপত্তার সুবিধা দেওয়ার প্রচলন অনেক দেশেই আছে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য নিরাপত্তার বা প্রসূতিজনিত সুবিধার জন্য কর্মসূচি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে কিছু উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্বজনিত সুবিধা দেওয়া হলেও অনেক দেশে এ বিষয়ে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সামাজিক নিরাপত্তা দানের কর্মসূচিগুলো সরকারি সংস্থায় বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সম্পর্ক ভালো, যেখানে নিয়োগের ধারাবাহিকতা আছে ও স্থায়ী ধরনের নিয়োগ। সংগঠিত ক্ষেত্র যেমন— খনিতে, উৎপাদন শিল্পে বা খামারের মতো সরকার পরিচালিত সংস্থাতেও প্রদান করা হয়। কিন্তু বিশালসংখ্যক কর্মীদের

নিয়ে গড়ে ওঠা অবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন কৃষিক্ষেত্র, গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্র, শহুরে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে নিশ্চয়তা থাকে না।

তৃতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আঞ্চলিক তারতম্য, প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে একটি অভাবনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ল্যাটিন আমেরিকার কিছু শহরপ্রধান দেশে ও মাঝারি আয়ের দেশে অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গৃহীত হলেও অন্যান্য দেশে বা ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশে তার প্রভাব খুব সীমিত।

চতুর্থত, প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্নভাবে অকার্যকরী হয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনাজনীত বা প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদানে নিয়োগকর্তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বীমার চাঁদা ও অন্যান্য চাঁদা সংগ্রহ ঠিকভাবে হয়ে ওঠে না। কর্মীদের ভবিষ্যনিধি যোজনায় পর্যাপ্ত অবসরকালীন সুবিধা প্রদান সবক্ষেত্রে হয় না। প্রশাসনিক জটিলতা ও সহায়তা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা এই কর্মসূচিকে আশানুরূপ সাফল্য দিতে পারেনি। এমনকি, প্রকৃত পরিস্থিতি মোকাবিলার সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৭.৩ ❑ উন্নয়নশীল দেশের উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা

বহুমুখী ও জটিল প্রকৃতির দারিদ্রের জন্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সহায়তা প্রদানকে দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সেই মতো দেশের নীতি ও কর্মপন্থার সংহতি সাধন করা হয়। বৃহদায়তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় চিরাচরিত সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাতে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রচলিত বীমা ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তাকে আরও বিস্তৃত ও দীর্ঘায়িত করা হয়। কখনো কখনো সেটা প্রয়োজন ভিত্তিক ও নির্দিষ্ট সমস্যা কেন্দ্রিক আবার কখনো কখনো সেটা সাধারণভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কেন্দ্রিক। যাইহোক, দারিদ্র্য দূরীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক নিরাপত্তার শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাধারণভাবে দেখা যায় তিন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রথমত, উন্নতিসাধন ব্যবস্থা যার মূল লক্ষ্য হল ভাতা প্রদান, পণ্য বিনিময়, অধিকার দান প্রভৃতির মান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগব্যয় বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করা।

দ্বিতীয়ত, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য হল অবহেলা বা বঞ্চনার প্রতিরোধে আরও প্রত্যক্ষ বা সরাসরি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (নিরাপত্তা ব্যবস্থা) যা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে রূপায়ণ হয়ে ওঠেনি তা হল বঞ্চনা বা অবহেলার কারণে ত্রাণ বা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান (Guaranting)।

এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসে একের উপর অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার দিকটি নিয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হয়নি। অর্থাৎ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার বা উন্নতিসাধন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যদি উন্নতিসাধনমূলক উদ্যোগ হয়ে থাকে তাহলে এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারদের সমস্যা দূর করার অর্থই হল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিচর্যার অর্থ হল অসুস্থতা প্রতিরোধ করা। অর্থাৎ একের সঙ্গে অপরের কার্যকরী সীমারেখা

কখনোই নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র হবে না বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

উন্নতিসাধন ব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র প্রতিষ্ঠানগত, ক্ষেত্রগত ও বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগত উদ্যোগ যার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপকায়তন কর্মপ্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূনর্বণ্টন-এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণকে মধ্যবর্তী বলয়ের মধ্যে রাখা হয়। যেখানে উন্নতিসাধন বা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতো সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে মূল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না সেখানে বঞ্চনা বা অবহেলার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা তা সমাধান করা সম্ভব হয়। যদিও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার আগে প্রতিরোধ ও উন্নতিসাধন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার বাহ্যিক প্রকৃতির মোকাবিলা হওয়া দরকার। যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যত রকমের কর্মসূচি বা উদ্যোগ নেওয়া দরকার তা উন্নতি সাধন বা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমেই করা যাবে। উভয় ব্যবস্থায় যা সম্ভব নয় তার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.৪ ❑ মহিলাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

আমাদের দেশে শিশু শ্রমিক বা প্রতিবন্ধীদের মতো সমাজের দুঃস্থ ও পিছিয়েপড়া শ্রেণি হিসাবে মহিলাদের সংখ্যা কোনো অংশে কম নয়। তাদের বেশির ভাগেরই সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতিতে কোনো না কোনো লিঙ্গজনিত বৈষম্য বা নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পুরুষদের তুলনায় দেশের মহিলাদের সংখ্যা যেমন বিশাল ঠিক তেমনি তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যাবতীয় সমস্যার মূলে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। যুগ যুগ ধরে তাদের বেশির ভাগের প্রতি অবহেলা ও নানান রকমের সংস্কারের জালে বন্দী রাখার ফলে সমাজের স্বাভাবিক জীবনে তাদের বিচরণ প্রায় চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য অনেক কারণের সঙ্গে তাদের জনসংখ্যার বিন্যাসকে কেউ কেউ বৈষম্যমূলক আচরণের অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন। ১৯৯১ সালে ভারতে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯২৭। তার আগে অর্থাৎ ১৯৮১-তে সেই অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯৩৪। কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে ২০০১ সালের আদমশুমারিতে, যেখানে এই অনুপাত সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৩। এই ধরনের অনুপাত পুরুষদের অনুকূলে গেলেও মহিলাদের উপর চিরাচরিত অবহেলা ও বঞ্চনার অভিশাপ নেমে আসে। এমনকি বিষয়সম্পত্তির উপর তাদের মালিকানা না থাকায় তাদের প্রতি নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে অনেক মহিলাই দ্বিধাগ্রস্ত হন। কোনো কোনো দেশে জোর করে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে (বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে), কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নাশ করা হচ্ছে। যার ফলে পুরুষদের অনুপাতে মহিলাদের ব্যবধান বেড়ে চলেছে। শিশু জন্মানোর সময় থেকেই নানান রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। সমাজে বা পরিবারে পুত্রসন্তানদের বাইরে নিয়ে যাওয়া, খেলাধূলা ও অন্যান্য খেলনা সামগ্রী দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটা আগ্রহ থাকে অন্যদিকে কন্যাসন্তানের প্রতি ততোধিক বৈষম্য ও অবহেলা করার অভ্যাস বর্তমান। বয়ঃসন্ধিকালেও মহিলাদের উপর শারীরিক ও যৌন অত্যাচারের প্রবণতা বাড়ার ফলে তাদের ঘরবন্দী করে রাখার ও চলন-বলনে নিয়ন্ত্রণ জারি করার প্রবণতা এখনও বর্তমান। বিবাহিত জীবনেও মহিলাদের সংসার সামলানোর পাশাপাশি নানান রকমের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হতে হয়। কোথাও কোথাও দাম্পত্য কলহের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হতে হয় মহিলাদেরই।

মহিলাদের বিবাহিত জীবনে লাঞ্ছনা এখনও কোনো কোনো সমাজে স্বাভাবিক রীতি। তাদের উপর যৌন নির্যাতন ও অত্যাচারকে কোথাও কোথাও তাদের বিবাহিত জীবনের অঙ্গ বলেও বিবেচনা করা হয়। দাম্পত্য জীবনে এই ধরনের অসহনীয় অত্যাচারের ফলে পণজনিত মৃত্যুর ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বয়সকালে বিধবা মহিলাদের উপর অমানবিক শোষণ ও বঞ্চনার ঘটনা আজকাল পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের মধ্যে খুবই সংঘটিত হয়। শুধু তাই নয় সমগ্র জীবনচক্রের ঘূর্ণাবর্তে তাদের মর্যাদাবোধ, মানসিক ভাবাবেগ, নীরব জীবন যাপন, সীমাবন্ধ চলাফেরা প্রভৃতির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করার মাধ্যমে সমাজের একজন অন্যতম সদস্য হিসাবে মহিলাকে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। সমাজ ও সংসারের নানান বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমে আসছে। বাড়ির নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব, পরিবারের লোকজনের দ্বারা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়া, অল্প বয়সে বিয়ের বন্ধনে আবন্ধ হওয়ার মতো নানান ক্ষেত্রে মহিলারাই সব থেকে বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে।

যাইহোক উন্নয়নের মূলস্রোতে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কর্মপন্থা রচনার নিদর্শন চোখে আসে ভারতে স্বাধীনতা উত্তর কালে। এই সময় সামাজিক নিরাপত্তা জনিত কর্মসূচি রচনার উদ্যোগও নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সামাজিক নিরাপত্তা (বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান প্রভৃতি)-র ভাবনা যাদের জন্য ভাবা হয়, সেইসব জনগোষ্ঠীর এ বিষয়ে তেমন কোনো নজর ছিল না বা তাদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা হয়নি। বিভিন্নভাবে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশেষভাবে মূল্যায়নের ফলে দেখা গেছে যে শ্রমিক, রোজগেরে ব্যক্তি ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সুবিধাদানের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার নীতি তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সামাজিক কর্মপন্থা রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিছু ধারণা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন—

প্রথমত, মহিলারা বেশির ভাগই গাইস্থ্যকর্ম করেন, শিশুদের ও বয়স্কদের য-/পরিচর্যা করেন।

দ্বিতীয়ত, মহিলারা তখনই রোজগার করতে শুরু করেন যখন পরিবারের আর্থিক অনটন বা সঙ্কট দেখা দেয়। সেইজন্য মহিলাদের কাজকে যেমন মর্যাদা দেওয়া হয় না, তেমনি বাধাও দেওয়া হয় না।

৭০ ও ৮০-র দশকের মাঝামাঝি মহিলাদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার সামাজিক কর্মপন্থায় উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়। সকলেই সমান এই ভাবনা প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদের উপযোগী রোজগার বৃদ্ধির নানান কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়। তাদেরকে নানান কর্মপন্থায় বিশেষভাবে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তাদের প্রয়োজন বা চাহিদাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন আবাস নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রয়োজনের কথা বেশি করে বিবেচনা করা হয়। এমনকি সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সেইসব মহিলাকে বেছে নেওয়া হয় যাদের মধ্যে কোনো উপার্জনশীল ব্যক্তি নেই। সুতরাং এখানে সামাজিক নিরাপত্তা কেবল পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সহায়ককারী ও নির্ভরশীল সম্পর্কের উপর বিরাজমান।

৯০-এর দশকে এসে দেখা যায় মহিলাদের কর্মসূচি রূপায়ণের পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কতিপয় মহিলাকে সামান্য কিছু সুযোগ দিতে গিয়ে বৃহদায়তনের মহিলাদের অক্ষমতায়ন করে রাখার বৈষম্যমূলক প্রয়াসের সমাপ্তিসাধন ও নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও সেই কর্মপন্থায় নানান ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। রাজ্য পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক

সহায়তাদান ও নির্ভরশীল সম্পর্কের বাইরে আসতে দ্বিধা বোধ করে। যাইহোক, ভারতে মহিলাদের জন্য গৃহীত নানান রকমের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মপ্রচেষ্টা যা কিনা তাদের জন্য বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। তেমন কয়েকটি প্রকল্পকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে তুলে ধরা হল—

সারণি-১

উপর থেকে চাপানো উন্নয়ন মডেল ও সামাজিক নিরাপত্তা

সময়কাল	উপর থেকে চাপানোর ক্ষেত্র	সামাজিক নিরাপত্তার মূল বৈশিষ্ট্য
১৯৫০-১৯৭০	কল্যাণমূলক	সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, সবচেয়ে দুঃস্থ শ্রেণির জন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি।
১৯৭০-১৯৯০	সাম্য ও ন্যায় বিচার	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা, দুঃস্থ শ্রেণির জন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি।
১৯৯০-র পরবর্তী সময়	ক্ষমতায়ন	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ, দুঃস্থদের জন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বিশেষ করে বিধবাদের জন্য, পরিপূরক পুষ্টি প্রদান, ট্রাইসেম (TRYSEM) ও (DWCRA)

মহিলাদের ক্ষমতায়ন, তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রতিনিধি হিসাবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে মহিলাদের জন্য জাতীয় ক্ষমতায়ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-০৭) মহিলাদের ক্ষমতায়ন-এর জন্য বিশেষ কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। ২০০৩-২০০৪ সালে জাতীয় ক্ষমতায়ন কর্মপন্থাকে বাস্তবায়নের জন্য মহিলাদের জাতীয় ক্ষমতায়ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রকল্প হিসাবে রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন হয় তাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার। সেই কারণে বালিকাদের শিক্ষাদান ও তাদের স্কুলছুট প্রবণতা কমানোর জন্য বিশেষ করে মেয়েদের জন্য শিক্ষাদপ্তরের উদ্যোগে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যেমন— মহিলা সমক্যা ও সর্বশিক্ষা অভিযান এর মাধ্যমে দেশের বিশাল সংখ্যক অধরা বালিকাদের যুক্ত করার ও শিক্ষালাভের সুবিধা প্রচলন করা হয়। এছাড়া মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের দুটো বিশেষ কর্মসূচি যেমন— সুসংহত শিক্ষাদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য দূরসঞ্চার শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষা দপ্তরের প্রয়াসকে আরও বেশি করে সমর্থন জোগানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্বয়মসিদ্ধা, স্বাবলম্বন, প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তি (STEP) জাতীয় কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে মহিলাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদানের গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বনের প্রয়াস প্রচলিত হয়। রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ

গড়ে তোলা হয় যার মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ (হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি পালন, বুনন প্রভৃতি) দেওয়া, নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি মহিলাদের নিজস্ব এলাকার বাইরে গিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতে 'কর্মরত মহিলাদের হোস্টেল', তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ক্রেশ বা 'ডে-কেয়ার সেন্টার' জাতীয় প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। অন্য দিকে অসহায় ও দুঃস্থ মহিলাদের য- ও সুরক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনার ক্ষেত্র হিসাবে গৃহিত হয়।

মহিলাদের যাবতীয় অধিকার রক্ষা বিষয়ক কাজকর্ম দেখাশোনা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় জাতীয় মহিলা কমিশন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। লিঙ্গা বৈষম্য দূরীকরণের জাতীয় মহিলা কমিশন দেশের প্রায় ৪২টি আইনগত প্রতিরক্ষার মধ্যে ৩২টি আইনগত প্রতিরক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ও মহিলাদের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের দিক বিশ্লেষণ করে ও খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেয়। মহিলা ও শিশুকল্যাণ দপ্তর মহিলাদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসার উৎসাহ দেওয়ার জন্য আরও কতকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে। গার্হস্থ্য জীবনে মহিলাদের উপর অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইন প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে অত্যাচার বা শোষণের শিকার মহিলাকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করা যায়। তাদের উপর যৌন লাঞ্ছনার প্রতিরোধ খসড়া বিল রচনা করা হয়েছে যা বিধিবন্ধ হলে তাদের উপর পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রে যৌন অত্যাচারের ঘটনা কমবে বলে আশা করা হয়েছে।

কর্মরত মহিলাদের জন্য তিনটি মুল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। যেমন— কর্মসংস্থান প্রকল্প, সামাজিক ত্রাণ ও সরকারি সহায়তা যথা— স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গণবন্টন ব্যবস্থা প্রভৃতি। ভারতের মতো দেশে মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদানমূলক দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং নিম্নলিখিত কিছু ভ্রান্ত ধারণার শিকার। যেমন—

(ক) ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে পাশ্চাত্য ঘরানার উপাদান ভিত্তিক (Kind support) সহায়তা দানের গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে।

(খ) আর্থিক পরিকাঠামোর মধ্যে কর্মসংস্থান (স্বনিযুক্তি বা অস্থায়ীকর্মী হিসাবে) ও প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা সচল রাখা খুবই জটিল।

(গ) যে বিশাল প্রক্রিয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে তাকে আরও শক্তিশালী ও সহজ প্রক্রিয়ায় আনার জন্য সরকারি স্তরে উদ্যোগের অভাব।

এইরকম পরিস্থিতিতে সরকার তার সমূহ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত করা ও তার ফলস্বরূপ মহিলাদের উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেয়। মহিলাদের কাজের ধরন ও প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য নানা রকমের প্রকল্প গৃহীত হয়। সংস্কারোত্তর সময়ে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অস্থায়ী নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজ্য সরকার প্রদত্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ বৃদ্ধি ঘটেনি। গঠনগত সমঝোতার প্রকল্প (Structural Adjustment Programme) সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র পথ।

সামাজিক ত্রাণ অন্যান্যদের পাশাপাশি বিধবা মহিলাদেরও বিশেষ সহায়তা দিয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত ভারতে কেবলমাত্র মহিলা কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট করে কোনো নিরাপত্তা বিধানের কর্মসূচি গ্রহণ

করা হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসাবে চিরাচরিত অন্ন, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা এখনও বর্তমান। বৃহদায়তন কর্মসংস্থানকারী কর্মপন্থা রচনাতে প্রত্যেক পরিবারের মহিলাদের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

দেখা যাচ্ছে আর্থিক সংস্কারের ফলে, মহিলাদের যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি, অন্যদিকে তেমন নতুনভাবে তৈরি করা ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণও বাড়েনি। গঠনগত সমঝোতার প্রকল্প (Structural Adjustment Programme) মহিলাদের অস্থায়ী কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিগত ব্যবস্থা মহিলাদের ক্ষেত্রে উৎসাহদানের পরিবর্তে তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সংস্থানে তাদের অধিকাংশ অনীহাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

৭.৫ ❑ তফসিলি জাতি ও সামাজিক নিরাপত্তা

গ্রামীণ ও শহরের উপার্জনশীল কাজের বাজারে বা তার বাইরে এখনও তফসিলি জাতির প্রতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ঘটেই চলেছে। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে, মুলধনের সংস্থানে, সম্পত্তির আহরণ ও অর্জনে, কর্মসংস্থানে ও সমাজসেবার নানান ক্ষেত্রে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষের কর্মসংস্থান ঘটে অবিধিবদ্ধ সংস্থায়, গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যান অসংগঠিত ক্ষেত্রে। যেখানে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেবলমাত্র উন্নয়ন ব্যবস্থা কেন্দ্রিক যেমন আয়ের সামর্থ্য বাড়ানো বা নিরাপদব্যবস্থা কেন্দ্রিক যেমন ন্যূনতম কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার বন্দোবস্ত করা।

এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের প্রতি ব্যাপকহারে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও বঞ্চনার মোকাবিলা করতে দেশের সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও পরিকল্পনা বহির্ভূত বার্ষিক কর্মসূচি রচনায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেহেতু এইসব উদ্যোগের ফলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম উপার্জনস্তর বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকে সেহেতু সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিধান হিসাবেও এইসব উদ্যোগকে দেখা হয়ে থাকে। এই ধরনের উদ্যোগগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে আলোচনা করা হল—

(ক) গ্রামে ও শহরে ন্যূনতম মজুরির কাজে বিশেষ করে গ্রামীণ খরা ও কৃষিকাজ বহির্ভূত সময়ে যখন কাজের মাধ্যমে উপার্জন করার সুযোগ কম থাকে, সেই সময়ে ন্যূনতম মজুরির কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিকাজের শেষে ও খরার সময়ে ন্যূনতম মজুরির কাজ করে তাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার সহায়তা করা।

(খ) সরকারি সহায়তা যেমন বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা।

(গ) জমি অধিগ্রহণ, মূলধনের সংস্থান, কর্মসংস্থান ও সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা।

ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দিতে যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে জওহর রোজগার যোজনা ও কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ বেকার ও অর্ধবেকারদের জন্য পরিপূরক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্প দুটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করা। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী দরিদ্র

মানুষজন এই প্রকল্পের মূল উপভোক্তা হিসাবে চিহ্নিত হলেও তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

জওহর রোজগার যোজনার অধীন বাসস্থান নির্মাণের জন্য তফসিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায় যাঁরা নানান ধরনের দাঙ্গার শিকার, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন, বিধবা মহিলার দ্বারা পরিচালিত পরিবার বা অবিবাহিত মহিলার পরিচালনাতে থাকা পরিবার, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীন নানান রকমের সহায়তা দেওয়া হয়। প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য বিশেষ করে তফসিলি জাতির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচির অধীন ব্যক্তিগত ভূমির সংস্কার ও উন্নয়ন এবং মিলিয়ন ওয়েল স্কীমের আওতায় জলসেচ প্রকল্পের জন্য বিনা খরচে যাবতীয় ব্যবস্থার আয়োজন করতে সাহায্য করা হয়। উভয় প্রকল্পের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সঙ্গে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য এবং দাসত্বের বন্ধনমুক্ত শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি ১৯৯৩ সালে কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের ১৮-৬০ বছর বয়সের যে-কোনো দুজন সদস্যকে ১০০ দিনের কাজ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত নেহরু রোজগার যোজনায় ঐ জাতীয় কাজের মাধ্যমে শহুরে দরিদ্র পরিবারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী (target group)-র অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে উভয় কর্মসূচিই দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া শ্রেণির মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রবর্তিত হয়েছে। যেহেতু উভয় কর্মসূচির মাধ্যমে রোজগারের উৎস ও ন্যূনতম স্তরে রোজগার-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পকে এই শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ঋণমুক্ত অনুদান-এর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারকে স্বাবলম্বন-এর জন্য সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দরিদ্র পরিবারের মানুষ যাতে তাদের আয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠে আসতে পারেন এবং অনুদাননির্ভর ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেন তার জন্যই এই প্রকল্প নির্দিষ্ট দরিদ্র পরিবারের লোকেদের জন্য চালু করা হয়। যদিও এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের এবং দরিদ্র কারিগরদের সহায়তা দানের কথা বলা হয়, তবুও মোট সুবিধাভোগীদের অন্তত ৫০ শতাংশ তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ও তাদের স্বনিযুক্তির জন্য TRYSEM বা গ্রামীণ যুবক/যুবতীর স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তফশিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা (Special Central Assistance)-র মাধ্যমে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা (Special componant plan) গ্রহণ করা হয়। তফশিলি জাতিভুক্ত পরিবারের, বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পের অধীন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০০% কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান (Post Matric Scholarship) কর্মসূচি তফশিলি

সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ উৎসাহ দান করে। এই প্রকল্পের অধীন তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের মাধ্যমিকোত্তর যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রী তাদের থাকা-খাওয়ার খরচসহ টিউশন ফি ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক খরচ-এর ১০০ ভাগ সহায়তা কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। এই ধরনের বিশেষ শ্রেণিভুক্ত মানুষদের আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। যেমন— জাতীয় তফশিলি জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NSCFDC), জাতীয় সাফাই কর্মচারী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NSKFDC), জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NBCFDC) এবং জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NMFDC) প্রভৃতি। দুটি উল্লেখযোগ্য আইনগত বিধান, যথা— নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন—১৯৫৫ (Protection of Eivil Right—1955) ও তফসিলি জাতি ও উপজাতির ওপর নির্যাতন (প্রতিরোধ) আইন—১৯৮৯ (Prevention of Atrocities against SCS & STS Act—1989) প্রবর্তনের মাধ্যমে তফশিলি জাতি ও উপজাতির প্রতি নানা রকমের বৈষম্য ও বঞ্চনামূলক আচরণ ও তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার/নির্যাতনের প্রতিরোধে সক্রিয় হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়।

৭.৬ ❑ তফশিলি উপজাতিদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা :

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ তফসিলি উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর অবস্থান। সেই আদিম কাল থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিনির্ভর অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার বিধান নিয়ে অধিকাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের জীবনযাপন প্রণালী প্রবহমান। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই সম্প্রদায়ের মানুষের বেশির ভাগের জীবনে নিরাপত্তাহীনতার অন্ধকার নেমে আসে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত, চিরাচরিত জীবনযাপন প্রথার অবসান, আধুনিক বনজসম্পদ সংরক্ষণনীতির প্রবর্তন এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথা যার ফলে বেশির ভাগ উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের সামর্থ্য ও দক্ষতার অবমাননা ঘটে। এমনকি এই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করে প্রচলিত কর্মসূচিসমূহ তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উন্নয়ন ঘটাতে না পারলেও ৮০-র দশকে সাফল্যের হার ছিল উল্লেখযোগ্য। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচি নানাভাবে সমালোচনার শিকার হয়।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারি সংস্থাগুলো সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, বিপনন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় সুযোগ ও সহায়তা দানের ফলপ্রসূ কর্মসূচি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তফসিলি উপজাতিভুক্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করে। যেমন—

- অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা।
- প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।
- তফশিলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন।

এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, বই ব্যাঙ্ক প্রচলন, খুচরো প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। এইসব প্রকল্প জটিল নিয়মনীতির কারণে ও সংস্থাগত জটিলতার কারণে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয় (TRIBAL RESIDENTIAL SCHOOL) স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকল্পের

মাধ্যমে ভারত সরকারের কল্যাণ দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ বেশিরভাগের কপালে জোটে না বলেই এই বিদ্যালয় প্রকল্প তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন প্রণালী প্রচলিত ব্যবস্থায় সম্পাদন ও মনোরঞ্জক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকায় পঠন-পাঠনের গুণগত মান উন্নয়ন ঘটেনি। এইসব নানাবিধ কারণে তফশিলি জাতিদের মধ্যে শিক্ষার আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যার ফলস্বরূপ, শিক্ষার হার ক্রমশ নিম্নমুখী ও স্কুলছুট-এর প্রবণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন— সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীন যুবকদের স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ, গ্রামীন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা, সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি। এই প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বনিযুক্তির নানান সুযোগ সৃষ্টি করা। উপার্জনশীল সম্পদের বণ্টন-এর ব্যবস্থাও করা হয়। সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তায় উপার্জনশীল সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। অপর দিকে IRDP, TRYSEM, DWCRA ও PMRY-এর অধীন অনুদানযুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির উৎসাহ দেওয়া হয়। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে (EAS) ও জওহর রোজগার যোজনার উপাদান হিসাবে ইন্দিরা আবাস যোজনায় (IAY) এবং মিলিয়ন ওয়েল স্কীমে (MWS) মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সমষ্টিভিত্তিক সম্পদ সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক উদ্যোগ বিশেষভাবে উৎসাহ পায়।

তফশিলি উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য চিকিৎসার সুবিধা দিতে নতুন চিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র স্থাপন ও পুরোনো চিকিৎসা কেন্দ্রের সংস্কারের উপর সরকার বিশেষ নজর দেয়। বিশেষ করে নিবিড় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ/নিবারণ কর্মসূচি প্রচলিত হয়। গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য কুষ্ঠ, যক্ষা ও ফাইলেরিয়ার চিকিৎসা কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়। তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা হিসাবে ২০০৫-০৬ সালে ১৪৯৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়। বিগত বছরের (২০০৪-০৫) তুলনায় (১,১৪৬ কোটি টাকা) প্রায় ৩০.৭৯ শতাংশ বেশি। ২০০৫-০৬-এর বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ৭২৭ কোটি টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা (SCA) দেওয়া হয় তফসিলি উপজাতির সহায়ক পরিকল্পনায় (Tribal Sub Plan) এবং ৩৮০ কোটি টাকা ভারতীয় সংবিধানে ২৭৫(১) ধারায় উল্লিখিত বিধান অনুসারে সহায়ক অনুদান (Grant in aid) হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

তফশিলি উপজাতি সহায়ক পরিকল্পনায় (SCA to SCP) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে তফসিলি উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সহায়ক প্রকল্পের অধীন পরিবার কেন্দ্রিক উপার্জনমুখী উদ্যোগ, জটিল পরিস্থিতির জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা, সমষ্টিভিত্তিক কাজকর্ম, আদিকালের আদিবাসী গোষ্ঠী গঠন (Primitive Tribal Group), বনভিত্তিক গ্রাম গঠন প্রভৃতি রূপায়ণ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুসারে সহায়ক অনুদান (Grant in aid) প্রকল্পের অধীন রাজ্যসরকারকে সহায়তা দেওয়া হয় মূলত প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন করে রাজ্যের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান স্তরে তফসিলি উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের উঠে আসতে সহায়তা দেওয়া ও এমন কোনো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যার জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান (Post matric Scholarship)-এর মতো কর্মসূচির অধীন সমস্ত

উপযুক্ত তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য (পেশাদারী ও কারিগরি বিষয়সহ) স্টাইপেন্ড প্রদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ২০০৫-০৬ সালে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়। যার নাম রাজীব গান্ধি জাতীয় ফেলোশিপ (তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) প্রকল্প। আর্থিক সংস্থা (Finance corporation) ও ভারতের আদিবাসী সমবায় বিপনন সংস্থা (Tribal Cooperative Marketing Federation of India)-কে আর্থিক সহায়তাদানের মাধ্যমে তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের আর্থিক ক্ষমতায়নের কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের উপার্জনশীল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতীয় তফসিলি উপজাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম-এর অধীনে ও রাজ্য তফসিলি উপজাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমকে প্রদত্ত সহায়ক অনুদান (Grant-in-aid) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি প্রচলন, সহজশর্তে অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদের বিনিময়ে ঋণদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়। অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সহায়ক অনুদান (Grant-in-aid)-এর মাধ্যমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা, আদিবাসী এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, TRIFED প্রকল্পে বিনিয়োগ ও দামের সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

এই প্রক্রিয়ার বহু স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নানান রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও কর্মীদের অনুপ্রেরণা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার জন্য তাদের হাতে থাকা সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচি রূপায়ণে সক্ষম হয়েছে। যদিও তাদের প্রতিষ্ঠানগত সেবাদান উন্নতিসাধন ভিত্তিক ও নিরাপত্তাদান ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হচ্ছে, তবুও বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে এই সুযোগ সুবিধায় আনা সম্ভব হয়ে উঠছে না। যার জন্য আরও সক্রিয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের আরও বেশি বেশি করে বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার উৎস সন্ধান করা, দুঃস্থতার কারণ খতিয়ে দেখা, কৃষিক্ষেত্রে নিম্নহারে উৎপাদনশীলতার কারণ অনুসন্ধান করা, জমি ও বনজ সম্পদ আহরণের বাধা ও প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা দরকার। নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের কৌশল হবে সহভাগী ও নিজস্ব ধ্যানধারণা ভিত্তিক। তবেই প্রকৃত অর্থে তফসিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে।

৭.৭ ❑ প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন (NSSO)-এর সমীক্ষা অনুসারে ভারতে ১৯৯১ সালে প্রায় ১৬ মিলিয়ন এবং ১৯৮১ সালে প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী হল এমন একটি অবস্থা বা শারীরিক সমস্যা যা অন্য অধিকাংশ লোকেরা যে কাজ করতে সক্ষম, সেইসব কাজ করতে বা কাজ করার সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। উল্লিখিত সমীক্ষাতে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দৃষ্টি শ্রবণ ও বাক্ এবং অস্থি প্রতিবন্ধী (লোকো মোটো) ভ্রমণশীল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কোনো ব্যক্তির এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিজেকে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জমকে নিয়ে যেতে সামর্থ থাকে না। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার সহায়তা দিতে হয় তা নয়, তার পাশাপাশি তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়। বয়সের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত প্রতিবন্ধকতা যেমন দৃষ্টি, শ্রবণ ও ভ্রমণশীল প্রতিবন্ধকতার সাথে ব্যক্তির উপার্জনক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক

বর্তমান। যার কারণে ব্যক্তির কাজে যোগ দেওয়া তার দ্বারা সম্পাদিত কাজের মাত্রা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিবন্ধী নয় এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয়ের হিসাব জটিল হয়ে দাঁড়ায়। একজন প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বহু সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন, তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ব্যবহারগত বিষয়-এর পাশাপাশি ন্যূনতম সরকারি সহায়তা বা জনসেবার সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা দেখা দেয়। ভারতে মতো দেশে প্রতিবন্ধকতার নানান দিক নিয়ে প্রায় ডজন খানিক সরকারি বিভাগ/সংস্থা যুক্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে সু-সমন্বয় ও বোঝাপড়া প্রতিবন্ধকতার মতো বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক হবে। এখনও পর্যন্ত যেসব সরকারি বিভাগ বা সংস্থা প্রতিবন্ধকতার নানা সমস্যা মোকাবিলার কাজে যুক্ত হয়েছে তাদের নানান উদ্যোগ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা যেতে পারে—

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর :

- শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচি।
- কুষ্ঠ নিবারণ কর্মসূচি।
- অন্ধত্ব দূরীকরণ কর্মসূচি ও চোখের ছানি সারিয়ে তোলার চিকিৎসা।

(খ) শিক্ষা দপ্তর :

- বিশেষ স্কুলে প্রতিবন্ধীদের সুসংহত শিক্ষাদান।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি।
- স্কুলে যাওয়া প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়ার বন্দোবস্ত।

(গ) শ্রম মন্ত্রক :

- প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র।
- প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ।

(ঘ) গ্রামীন উন্নয়ণ মন্ত্রক :

- প্রত্যেক দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে প্রতিবন্ধীদের জন্য ২-৩% সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তাদের জন্য ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিকাঠামো তৈরি।

(ঙ) নগর উন্নয়ন মন্ত্রক :

- কিছু আদর্শ নিয়ম ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিবেশে জীবনযাপনের উপায় অবলম্বন।

(চ) কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ :

- প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

(ছ) সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক :

- ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার, সুযোগ-সুবিধার সংরক্ষণ ও পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন তদারকি করা।
- রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- সুসংহত সম্পদ কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় অছি (National Trust) গঠন করা।

শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচির রূপায়ণ যেমন— জাতীয় পালস পোলিও প্রচার, কুষ্ঠ নিবারণ, অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ এবং চোখের ছানির চিকিৎসার ফলে কর্মরত শ্রেণির মানুষের একটি বড় অংশের পক্ষে তাদের

দর্শন, ভ্রমণশীল নানা প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। দেশের গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সঠিক রূপায়ণ ও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ করে গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের কাছে পৌঁছনোর নানা রকমের বাধা রয়েছে। এমনকি, শারীরিকভাবে ও সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা ও সামাজিক উদ্যোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। যার বেশির ভাগটাই উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী। পরিষেবা প্রদানকারী নানান বিভাগ বা কর্মসূচির মধ্যেও সংহতির অভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিবন্ধকতার নানা দিক মোকাবিলা করার জন্য প্রচলিত ভারতীয় পুনর্বাসন কাউন্সিল আইন ১৯৯২ (Rehabilitation council of India Act—1992) এবং প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ-সুবিধার সংরক্ষণ ও পুর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার আইন—১৯৯৫ (Persons with Disabilites Equal opportunity, Protection and Right to full Participation Act—1995)-এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি রচনার ও কর্মপন্থা স্থির করার নানা রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকার আশা করছে যে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশু ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। যাদের জন্য দরকার সুসংহত ও বিশেষভাবে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ যে-র শিকার শিশুদের জন্য শিক্ষাদান ও আনুষজ্গিক কাজে যুক্ত লোকেদের জন্য ভারতীয় পুনর্বাসন কাউন্সিল আইনে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। সর্ব শিক্ষা অভিযানে এই বিধান বলবৎ করার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে বিশেষ যে-র মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মী উন্নয়ন (Manpower Development) সংক্রান্ত সুবিধাদান ও পুনর্বাসন সেবার সহজলভ্যতায় সহায়তা দানের জন্য ৫টি সুসংহত পুনর্বাসন কেন্দ্র (Composite Rehabilitation Centre) কেন্দ্র যথাক্রমে ভূপালে, গৌহাটিতে, লখনউতে, শ্রীনগরে ও সুন্দরনগরে স্থাপিত হয়েছে। চারটি আঞ্চলিক পুনর্বাসন কেন্দ্র যথাক্রমে বেরেলিতে, চণ্ডীগড়ে, কটকে ও জব্বলপুরে স্থাপন করা হয়েছে মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত পরিষেবা প্রদান করার জন্য।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত (২০০৫-০৬) প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়তা ও সরঞ্জাম কেনা বা ফিটিংস-এর জন্য ৩২.৪০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। যার ফলে ১.১৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্তুতকারী সংস্থা (Artificial Limfs Manufacturing Corporation) নানা রকমের সহায়ক কৃত্রিম অঙ্গ ও সরঞ্জাম বানিয়ে থাকে ও সরবরাহ করে থাকে।

দীনদয়াল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্পে (অতীতে যার নাম ছিল Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with disabilities বা প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা দান প্রকল্প), কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত মানুষদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র চালাতে, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে বিশেষ করে মানসিক (বোধ) প্রতিবন্ধীদের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ, অস্থি, বাক্, শ্রবণ, দৃষ্টি ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুল পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

৭.৮ ❑ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা :

১০ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে শিশুদের সুরক্ষা, অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অধিকার

ভিত্তিক (Right Based) কৌশলগত কর্মসূচি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় শিশুসনদ (National Charter of Children) গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি, শিশু অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিশন (National Commission for Child Right) গঠনের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে। যা খুব কম দিনের মধ্যে সংসদে অনুমোদন লাভ করতে চলেছে।

৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ কর্মসূচি হিসাবে ১৯৭৫ সালে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প (Integrated Child Development Services Scheme) চালু করা হয়। ০-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ছয়টি বিশেষ পরিষেবা যেমন— শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাকরণ, পরিপূরক পুষ্টি, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা এবং অন্যত্র স্থানান্তরের সুপারিশ এই প্রকল্পের অধীন প্রদান করা হয়ে থাকে। কিছু বিশেষ ধরনের প্রকল্প যেমন বালিকা সমবৃদ্ধি যোজনা (BSY) ও কিশোরী শক্তি যোজনার মাধ্যমে কিশোরীদের জীবনশৈলী বিষয়ে অবহিত করা ও সঠিকভাবে বিকাশের জন্য বিশেষ সচেতনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। বালিকা সমবৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য একটি এ্যাকাউন্ট ভিত্তিক সুদযোগ্য অর্থ জমা করা হয়। যার সুদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের থেকে ঐ বালিকার শিক্ষালাভের খরচ মেটানো এবং ১৮ বছর পূর্ণ হলে ঐ সমূহ টাকার মালিকানা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিশোরী শক্তি যোজনায় ১১-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের সামগ্রিক বিকাশ যেমন— সাক্ষরতা, পুষ্টি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জাতীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনে আই.সি.ডি.এস প্রকল্পের পরিকাঠামোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্মরত মহিলাদের ও অসুস্থ মহিলাদের শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় এবং দুটি বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 'ক্রেশ সেন্টার' ও 'ডে কেয়ার সেন্টার' চালু করা হয়েছে। ভারতীয় শিশুকল্যাণ সমিতি (Indian Council of Child Welfare) এবং ভারতীয় আদিমজাতি সেবক সংঘ-এর মতো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিশু শ্রমিক প্রথার মতো নিষ্ঠুর শোষণের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার ফলপ্রসূ কর্মসূচি ও কর্মপন্থা গ্রহণ, যা কিনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শ্রমের বাজারে শিশুদের আনাগোনার প্রবণতা প্রতিরোধ করতে এবং জনসমর্থন বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমের বাজার থেকে শিশুদের তুলে আনতে সামগ্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূলত ৫ বছরের থেকে ১৪ বছরের বয়সের মধ্যে শিশুদের সামাগ্রিক বিকাশের স্বার্থে শ্রমদানের প্রথা থেকে তাদের উদ্ধার করতে আইনানুগ নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি শিশু শ্রমিককে যাতে বিদ্যালয়ে পাঠানো যায় তার জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের (Mid day meal) ব্যবস্থা করা, পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়ার উপর সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ন্যূনতম মজুরি প্রদানের আইনগত বিধানের ফলে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও পারিবারিক আয় বাড়ানোর ফলে শিশুদের আয়ের বিকল্প আয় অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে বলে আশা করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ২৪, ৩৯ ('ই' এবং 'এফ') এবং ৪৫নং ধারায় শিশুশ্রম প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের এই বিধান ও নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে বেশ কিছু আইনগত বিধান গ্রহণ করা হয়। যেমন—

- শিশুশ্রম (প্রতিরোধ ও নিষিদ্ধ) আইন—১৯৮৬।
- কারখানা আইন—১৯৪৮ (ধারা—৬৭)।
- খামার শ্রম আইন—১৯৫১ (ধারা—২৯)
- বাণিজ্য (জাহাজ) আইন—১৯৫১
- খনি আইন—১৯৫২ (ধারা—৪৫)
- শিক্ষানবীশ আইন—১৯৬১ (ধারা—৩)

উপরোক্ত আইনগত বিধানের বিভিন্ন সময় পরিমার্জন বা সংশোধন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ) আইন ১৯৮৬ হল শিশু শ্রম প্রতিরোধের সুসংহত ও সামগ্রিক আইনানুগ ব্যবস্থা। এই আইনেরও সময় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে-কোনো কর্মক্ষেত্রে শিশুদের যুক্ত করার উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। তাদের কাজের পরিবেশ উপযুক্তভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি উদ্যোগ বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

৭.৯ ❑ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

(ক) বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫-০৬), গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।
(খ) তফশিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী (২০০৫),—অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
(গ) পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (২০০৪), উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
(ঘ) The Legal, Economic and Social Status of the Indian Child, National Book Organisation. New Delhi (1988).
(ঙ) Women, Health and Development, Voluntary Health Association of India, New Delhi.
(চ) প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নির্দেশাবলীর সংকলন, সর্বশিক্ষা অভিযান, পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক।

৭.১০ ❑ অনুশীলনী :

(ক) মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(খ) সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বোঝায়? ভারতে কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা হয়? যে-কোনো একটি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা করুন।
(গ) তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
(ঘ) উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নিরাপত্তার অগ্রগতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
(ঙ) প্রতিবন্ধী কারা? ভারতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তাদানের উপর সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

—

একক ঃ ১ প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা

গঠন

১.১ সূচনা

১.২ সংজ্ঞা বা ধারণা

১.৩ সমস্যার গভীরতা

১.৪ প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ

১.৫ প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

১.৬ অধিকার ও সুযোগসুবিধা

১.৭ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

১.৮ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

১.৯ পেশাগত সমাজকর্মীদের ভূমিকা

১.১০ উপসংহার

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.১২ অনুশীলনী

১.১ সূচনা

মানুষের জীবন কখনই সমস্যামুক্ত হয় না। বিভিন্ন বয়সে নানান ধরনের সমস্যা মানুষের সঙ্গী । বর্তমান দিনে মানুষ অনেক বেশী সচেতন এবং অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায়ও জড়িয়ে পড়ছে। 'প্রতিবন্ধকতা' এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা মানুষ তার সৃষ্টি লগ্ন থেকে মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিবন্ধী মানুষরা যাতে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন – 'যতদিন না মানুষ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় ততদিন আমি পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করবো'। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা হল প্রতিবন্ধী সহ সমস্ত মানুষের কল্যাণ করা। এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতার ধারণা, এর বিভিন্ন দিক, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

১.২ সংজ্ঞা বা ধারণা

বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের মতো করে 'প্রতিবন্ধকতা' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবুও বলা যায় – 'প্রতিবন্ধকতা' এমন একটি শারীরিক বা মানসিক সমস্যা যা গতিশক্তি, সংজ্ঞাবহ ও অন্যান্য বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। প্রতিবন্ধী মানুষ বলছে এমন মানুষকে বোঝায় যার শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা কর্মে নিয়ুক্তির অন্তরায়। আরও বলা যায় 'প্রতিবন্ধকতা' হল এমন একটি প্রকট বা প্রচ্ছন্ন শারীরিক বা মানসিক বিকলতা যা তার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস করে এবং একটি বিশেষ (প্রতিকূল) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আহ্বান করে।

একজন প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আলাদা। সহজে চলাফেরা করা স্বাভাবিক ভাবে যোগাযোগ করা, নিজের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষরা পিছিয়ে থাকে। সুতরাং, একজন মানুষকে তখনই প্রতিবন্ধী বলা যায় যদি সে শারীরিক বা মানসিক ভাবে কর্মক্ষম অবস্থায় না থাকে।

১.৩ সমস্যার গভীরতা

প্রতিবন্ধকতা বলতে আমরা শুধু শারীরিক অক্ষমতা বুঝি না তার সঙ্গে মানসতাত্ত্বিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অবসাদ বা হতাশা যুক্ত থাকে। ১৯৫৯-৬১, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭২-৭৪ সালে ন্যাশনাল স্যাম্-পল্ সার্ভে (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা) এর মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবং দেখা গেছে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী। এবং তাদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী বিভিন্ন কল্যাণমূলক বা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে উপকৃত। অর্থাৎ বৃহত্তর অংশই সৃজনশীল, অর্থবহ জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অতীতে যৌথ পরিবারগুলি তাদের পরিবারে প্রতিবন্ধী মানুষ থাকলে তার সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করত। বর্তমানে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রতিবন্ধীরা পূর্বের মতো আর সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না। যার ফলে প্রতিবন্ধীদের যত্ন এবং পুনর্বাসন উভয় ক্ষেত্রে জটিলতা বেড়েছে।

১.৪ প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ

ক) শারীরিক

১) পোলিও

২) অন্ধত্ব

৩) বধিরত্ব

৪) রিকেট্

৫) ল্যাথাইরিজম্

৬) যক্ষা, কুষ্ঠ, হাম এবং অপুষ্টি থেকে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা

৮) বাত

৯) পুড়ে যাওয়ার ফলে অঙ্গাবিকৃতি

খ) মানসিক

১) মানসিক প্রতিবন্ধী (অপূর্ণ বিকাশ)

২) সেরিব্রাল পলসি

৩) ডিভেলপমেনট্ ডিলে (খুব ধীর শিক্ষার্থী)

৪) অউটিজিম্

১.৫ শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল –

১) বাবা-মায়ের কিছু জীনগত রোগ বা কারণ যা বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততিতে বর্তায়,

২) ৩৫ বছরের পরে মহিলারা সন্তান ধারণ করলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাতে পারে,

৩) গর্ভাবস্থার প্রথমের দিকে রুবেলা এর মতো কিছু সংক্রমণ,

৪) ঔষধের অপব্যবহার বা অধিক ব্যবহার,

৫) গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসব পরবর্তীকালে উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্যার অভাব,

৬) জন্মের সময় শিশুর উপযুক্ত পরিচর্যা না করলে আঘাত ও আনুষঙ্গিক কারণ,

৭) গর্ভাবস্থায় এবং তার পূর্বে মায়ের অপুষ্টি,

৮) প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু হলে শিশু উপযুক্ত যত্ন পায় না,

৯) নবজাতকের পুষ্টির অভাবে অন্ধত্বের মতো প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়,

১০) নিয়মিত টিকাকরণ না করালে পোলিও এর মতো অসুখ,

১১) খাদ্য বিষক্রিয়ার ফলে এবং অতিমাত্রায় পরিবেশ দূষণের ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা,

১২) কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, যক্ষা এবং অন্যান্য কিছু সংক্রামণ

১৩) শিশু নিয়মিত যত্ন চেক-আপ না করালে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে মূক-বধিরত্বের সমস্যা,

১৪) দুর্ঘটনা,

১৫) যুদ্ধ, নির্মাণ কাজ, শিল্প, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে অনেকে প্রতিবন্ধী হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কেবল মাত্র দারিদ্র্য প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী নয়। চিরাচরিত সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার, অযত্ন ইত্যাদি কারণও শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী।

১.৬ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছেন। সেগুলি যাতে তারা পেতে পারে তার জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন–

১) দ্যা পার্সনস্ উইথ ডিসএবিলিটিস্ এক্ট্, ১৯৯৫

২) দ্যা ন্যাশন্যাল, ট্রাস্ট এক্ট্, ১৯৯৯

৩) রিহ্যাভিলিটেশন্ কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়া এক্ট্, ১৯৯২

১৯৯৫ সালের পি.ডব্লিউ.ডি. এক্ট্ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নলিখিত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে–

১) ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গড়া এবং সেই কমিটির মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা–

ক) প্রতিবন্ধীদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত জাতীয় আইন তৈরি করা,

খ) বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া,

গ) আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থা যাতে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে তা দেখা,

ঘ) নীতির পুনর্মূল্যায়ন

ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও সাধারণ জীবনে সমস্ত ধরনের বাধা দূর করা,

চ) বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।

২) ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটির কাজ হবে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা।

৩) সমস্ত রাজ্য রাজ্যস্তরে সমন্বয় কমিটি গড়বে এবং এই আইনে প্রদেয় কাজকর্ম রূপায়িত করবে। বস্তুতপক্ষে এই কমিটির কাজ কেন্দ্রীয় কমিটির মতোই তবে, তা রাজ্যস্তরে সীমাবদ্ধ।

রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান্ হবেন।

৪) রাজ্য সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারির নেতৃত্বে রাজ্যস্তরে এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটির কাজ হবে রাজ্যস্তরের সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা।

এই আইনের অধীনে প্রদেয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

১) শিক্ষা

- ১৮ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা;
- সাধারণ স্কুলগুলিতে তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা;
- তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন;
- ঐ সকল বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- প্রয়োগমুখী সাক্ষরতা, পঞ্চম মানের মধ্যে স্কুলছুটের সমস্যা কাটিয়ে আনা;
- মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা;
- বই ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ;
- শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা বা যাতায়াতের জন্য আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি।

২) চাকুরি

- প্রতিবন্ধীদের উপযোগী পদ শনাক্ত করা
- কমপক্ষে ৩ শতাংশ পদ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে, তার ১ শতাংশ অন্ধ-দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন, বধির অথবা সেরিব্রাল পলসি মানুষদের জন্য।
- বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন
- প্রতিটি নিয়োগকারী সংস্থা এরূপ কর্মীর নথি রাখবে।
- যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান পায় তারা অবশ্যই ৩ শতাংশ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করবে।
- দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষণ।
- প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব বা সরকার নিয়োগকারীদের সাহায্য করবে।

৩) অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

- সরকার প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের প্রকল্প তৈরি করবে।
- স্থানীয় সরকার ও নেতৃত্ব প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহ নির্মাণ, দোকান ঘর তৈরি, বিশেষ স্কুল, গবেষণা কেন্দ্র, শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য ন্যূনতম মূল্যে জমি বিতরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

- রাস্তায় এবং যানবাহনে যাতে বৈষম্য না থাকে,
- সরকারি চাকুরিতে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেন বৈষম্য না থাকে,
- বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত পরিষেবায় দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ, পুনর্বাসন, সহায়তা প্রদান ও পদ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য সহায়তা,
- কেবলমাত্র নথিভুক্তকারী সংস্থাগুলি যাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিষেবা প্রদান করতে পারে,
- সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রদেয় পরিষেবার সমন্বয়, তদারকি এবং রিপোর্ট তৈরির জন্য মুখ্য কমিশনার নিয়োগ করবেন,
- সরকার পুনর্বাসন নীতি, বীমা প্রকল্প, বেকারদের জন্য ভাতা প্রদানের প্রকল্প প্রণয়ন করবেন।

এইভাবে, বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, জমির মালিকানা, ক্রীড়া ও বিনোদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

১.৭ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবন্ধীদের সাধারণত ভয়, বৈষম্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এরূপ বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবার ও সমাজে শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত। গ্রাম ও শহরে নিরক্ষর-শিক্ষিত সমস্ত মানুষের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক অপবাদ দেওয়া তথা বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখা যায়। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে যে সব অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা হয় তা থেকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত সমস্ত সমাজে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অবজ্ঞা ও বিব্রত বোধ করা হয়। পরিবারের সদস্যরা ভাবে এটা তাদের পরিবারের সামাজিক পদমর্যাদার ক্ষতি সাধন করে। ধর্মেও সঠিকভাবে বোঝার বদলে করুণার কথা বলা হয়েছে। এরূপ নেতিবাচক মনোভাব ভয়ংকর। যদি সমাজ কিংবা পরিবার সবসময় বিদ্রুপ বা করুণা প্রদর্শন করে এবং তার প্রতিবন্ধকতা মনে করিয়ে দেয় তবে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি জটিল হয়।

অনেক সময় বাবা-মায়েরা বেশি করে করুণাপ্রবণ হয়ে পড়েন। এর ফলে তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে কি পারে না তা বার বার না বলে, সে কি পারে তার উপর বাবা-মা কে গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মা এবং সমাজের এরূপ সদর্থক মনোভাব তাদের জীবন ও জীবিকার সহায়ক। স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়াও কাউন্সেলিং, সদর্থক মনোভাব এবং বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জামও গুরুত্বপূর্ণ।

১.৮ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

বাবা-মাকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। তাছাড়া সুসংহতভাবে কিছু কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। 'পুনর্বাসন' কথাটির অর্থ হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং সামাজিক স্বীকৃতি। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিবন্ধী, তাদের পরিবারের সদস্য-বিশেষ করে তাদের বাবা-মা, বৃহত্তর সমাজ, সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা সকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুনর্বাসনের

মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চাকুরি, স্ব-নিযুক্তি, চিকিৎসা পরিষেবা, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল–

ক) **শিক্ষা ঃ** প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তাদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করতে হবে কিংবা শিক্ষার জন্য খরচ বহন করতে হবে। উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয় যেমন – মূক-বধির এবং অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

খ) **আয় বাড়াবার সুযোগ ঃ** সরকার, পৌরসভা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বে-সরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী মানুষদের আয় বাড়াবার জন্য চাকুরি বা স্ব-নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করবে। তাদের প্রতিবন্ধকতার ধরন অনুসারে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।

গ) **বাসস্থান ঃ** শহর এবং গ্রাম উভয় স্থানে গরীব বা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে বিতরণ করা হয়। সরকারি কর্মী ঐ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষদের অগ্রাধিকার দেন। যদি টাকা দিতে হয় তবে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কম টাকা লাগবে।

ঘ) **চিকিৎসা পরিষেবা ঃ** প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা এবং কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শ্রবণ যন্ত্র ইত্যাদি দরকার। তাদের অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা খুবই অপ্রতুল। সরকার এবং সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ঙ) **যাতায়াত ঃ** সাধারণত প্রতিবন্ধী মানুষরা যানবাহনে বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে পারে। প্রাইভেট যানবাহনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বা কম খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের উপযোগী যন্ত্র চালিত তিন চাকার গাড়ি ন্যূনতম মূল্যে দেওয়া উচিত।

চ) **চাকুরি কিংবা স্ব-নিযুক্তির** জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যে সকল সরকারি বা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দেয় তাদের উচিত প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মনে রাখতে হবে, এরূপ মানুষের পুনর্বাসন খুবই কঠিন কাজ। এরজন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা ও সুসংহত প্রয়াস দরকার। সরকার এককভাবে এই কাজ করতে পারে না। সুতরাং উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই এই কাজ করতে হবে। জনসাধারণকে সচেতন না করতে পারলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সফল হবে না।

১.৯ পেশাগত সমাজকর্মীদের ভূমিকা

প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে পেশাগত সমাজকর্মীদের নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি হল–

১) প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে উপযুক্ত সংস্থার সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞের সাহায্যে জনসাধারণকে সচেতন করা,

২) বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য যে সকল পরিষেবা রয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ,

৩) প্রতিবন্ধী মানুষদের শনাক্ত করা এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রে পাঠানো যাতে তারা সহজে সুযোগ সুবিধা পায়,

৪) প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে তাদের বাবা-মা ও পরিবারের লোকজনদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা,

৫) এলাকার জনসাধারণ যাতে করুণা বা ঘৃণা প্রদর্শন না করে তার জন্য সচেতন করা,

৬) তারা যে সকল সংস্থার সঙ্গে জড়িত সেখানে চাইল্ড্ গাইডেন্স্ কেন্দ্র সহ অন্যান্য সব পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা,

৭) প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা,

৮) তাদের জন্য খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১.১০ উপসংহার

এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ও তাদের প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত সমস্যা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক সরকারি পদক্ষেপ ইত্যাদি বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বে-সরকারি সংস্থাগুলির প্রদেয় পরিষেবা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যে প্রতিবন্ধী মানুষরা রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার দিক থেকে তারা পিছিয়ে। এরূপ পরিস্থিতি মাথার রেখে 'কোঠারী' কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে – প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা কেবল মানবিকতার খাতিরে নয়, তা যেন ব্যবহারিক শিক্ষা হয়। তারা যাতে সামাজিক ন্যায় বিচার পায় তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা দরকার। বর্তমানে যে সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচি রয়েছে তা খুবই উপযুক্ত কিন্তু, অপ্রতুল। কেবল প্রতিবন্ধীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ঐ সকল সুবিধা ভোগ করছে। সুতরাং, আরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষদের সুযোগ দিতে হবে। কেবলমাত্র সরকার এই কাজ করতে পারবে না। বে-সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১) দ্যা গ্যজেট্ অব্ ইন্ডিয়া

২) পশ্চিমবঙ্গ (ডিসেম্বর-২০০৬)

৩) দ্যা ন্যাশন্যাল ট্রাস্ট এক্ট্- ১৯৯৯, মিনিস্ট্রি অব্ সোশ্যাল জাস্টিস্ এন্ড কোম্পানী এফেয়ারস্।

১.১২ অনুশীলনী

১) প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝেন? এর কারণগুলি আলোচনা কর।

২) প্রতিবন্ধকতার ধরনগুলি লিখুন। অন্ধত্ব ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩) পুনর্বাসন বলতে কী বোঝেন? প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সরকারি পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

৪) প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা ও চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা আলোচনা করুন।

একক ঃ ২ শিশু বিকাশ ও শিশু সুরক্ষা

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ ভারতে শিশুদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

২.৪ শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতার, পরিবার এবং বন্ধুদের ভূমিকা

২.৫ শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প

২.৬ শিশু সুরক্ষা – সাংবিধানিক সুরক্ষা, শিশুর অধিকার

২.৭ শিশুদের নির্যাতন – ধরন, প্রভাব

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.৯ অনুশীলনী

২.১ ভূমিকা

শৈশবের বৈশিষ্ট্য হল – অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। শিশু বিকাশ ও শিশু সুরক্ষার কাজে যুক্ত সমাজকর্মীদের, শৈশবের বিভিন্ন ধাপ এবং বয়স অনুসারে বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কর্মীদের আরও জানতে হবে শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতা, পরিবার ও বন্ধুদের ভূমিকা, শিশু উন্নয়নে সরকারি নীতি, প্রকল্প, সাংবিধানিক সুরক্ষা, অধিকার এবং বর্তমান সমাজে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি। যে সব সমাজ কর্মীরা শিশু বিকাশ কাজে যুক্ত তারা শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা দিতে পারে। এই ভূমিকা শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় শেষ করে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবে –

- ভারতীয় শিশুদের জনসংখ্যাগত চিত্র এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা;
- পিতামাতা, পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের ভূমিকা এবং বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প;
- সাংবিধানিক সুরক্ষা, আইন, শিশুর অধিকার;
- শিশুদের যাতে অপব্যবহার না করা হয় সে ব্যাপারে এবং নির্যাতিত শিশুদের সাহায্য করতে পারবে।

২.৩ ভারতে শিশুদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

২০০১ সালে ভারতে শিশুদের সংখ্যা ১০ কোটি যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ০ তেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুদের সংখ্যা ৩৯ কোটি ৮৩ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। এবং ০-৫ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ১১ কোটি ৫ লক্ষ।

বিশ্ব জনসংখ্যা, ভারতের জনসংখ্যা ও শিশুদের জনসংখ্যা (০-৫ বছর, ০-১৮ বছর), ১৯৯৯

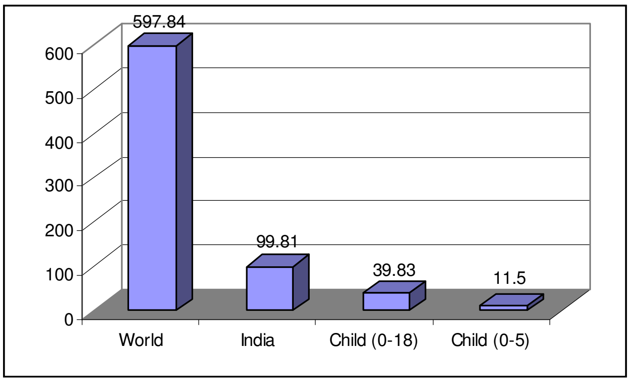

উৎস – ইউ.এন.এফ.পি.এ. – ১৯৯৯, ইউনিসেফ – ২০০১।

দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০২

নিম্নে ২০০১ সালে ০-৬ ও ৭-১৪ বছর বয়সের শিশুদের পরিসংখ্যান দেওয়া হল–

বয়স	মোট শিশু	ছেলে	মেয়ে
০–৬	১৬৩,৮১৯,৬১৪	৮৪,৯৯৯,২০৩	৭৮,৮২০,৪১১
মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে শতকরা হার	১৫.৯	১৬.০	১৫.৯
৭–১৪	১৯৯,৭৯১,১৯৮	১০৪,৪৮৮,১১৯	৯৫,৩০৩,০৭৯
মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে শতকরা হার	১৯.৪	১৯.৬	১৯.২

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২) অনুসারে শিশুদের সংখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হল –

বয়স	মোট	ছেলে	মেয়ে
০–৪	১১.৭	৬.০	৫.৭
৫–৯	১০.৯	৫.৬	৫.৩
১০-১৫	১১.০	৫.৭	৫.৩
১৫–১৯	১০.৩	৫.৩	৫.০

নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যে মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে ০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা দেওয়া হল (১৯৯৮)–

বিভিন্ন রাজ্য	মোট			গ্রাম			শহর		
	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৩.১	৩৩.৬	৩২.৭	৩৩.৬	৩৪.২	৩২.৯	৩১.৭	৩১.৬	৩১.৯
আসাম	৩৭.৬	৩৭.৩	৩৮.০	৩৮.৬	৩৮.৩	৩৮.৯	২৯.২	২৮.৫	২৯.৯
বিহার	৪০.৮	৪১.৩	৪০.২	৪১.৩	৪২.০	৪০.৭	৩৫.৬	৩৫.২	৩৬.০
গুজরাট	৩২.৭	৩৩.৪	৩২.১	৩৩.৭	৩৪.৪	৩২.৯	৩০.৭	৩১.২	৩০.২
হরিয়ানা	৩৬.২	৩৬.৭	৩৫.৬	৩৭.০	৩৭.৫	৩৬.৬	৩৩.১	৩৪.০	৩২.০
হিমাচল প্রদেশ	৩১.৭	৩৩.৯	২৯.৭	৩২.০	৩৪.৪	২৯.৮	২৭.৬	২৭.৮	২৭.৩
কর্ণাটক	৩১.৪	৩১.৮	৩১.০	৩২.৪	৩২.৮	৩২.০	২৯.১	২৯.৫	২৮.৬
কেরালা	২৭.৩	২৯.০	২৫.৭	২৭.৯	২৯.৭	২৬.৩	২৫.৩	২৬.৯	২৩.৮
মধ্যপ্রদেশ	৩৮.২	৩৮.৬	৩৭.৮	৩৯.২	৩৯.৬	৩৮.৭	৩৩.৩	৩৩.৩	৩৩.২
মহারাষ্ট্র	৩৩.৩	৩৩.৮	৩২.৮	৩৫.২	৩৬.২	৩৪.৩	৩০.২	৩০.১	৩০.৩
উড়িষ্যা	৩৪.২	৩৪.৭	৩৩.৭	৩৪.৭	৩৫.৩	৩৪.১	৩০.৬	৩০.৩	৩১.০
পাঞ্জাব	৩১.৮	৩২.৯	৩০.৬	৩২.১	৩৩.২	৩০.৮	৩১.০	৩১.৯	২৯.৯
রাজস্থান	৩৮.৩	৩৮.৮	৩৭.৭	৩৯.১	৩৯.৫	৩৮.৫	৩৪.৭	৩৫.৩	৩৪.০
তামিল নাড়ু	২৮.১	২৮.৭	২৭.৫	২৮.৯	২৯.৫	২৮.৩	২৬.৪	২৭.০	২৫.৮
উত্তর প্রদেশ	৪০.১	৪০.৬	৩৯.৭	৪০.৮	৪১.৩	৪০.৩	৩৬.৫	৩৬.৭	৩৬.৩
পশ্চিমবঙ্গ	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.০	৩৫.৪	৩৫.৫	৩৫.৪	২৫.৫	২৪.৯	২৬.১
ভারত	৩৫.৬	৩৬.১	৩৫.১	৩৭.০	৩৭.৬	৩৬.৩	৩০.৯	৩১.১	৩০.৭

উৎস – রেজিস্ট্রার জেনারেল, (২০০১), এস.আর.এস. রিপোর্ট–১৯৯৮
দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০২

উপরোক্ত সারণি থেকে বলা যায় শিশুদের শতকরা হার বিহারের সবচেয়ে বেশি (৪০.৮), তারপর উত্তর প্রদেশ (৪০.১), রাজস্থান (৩৮.৩), মধ্য প্রদেশ (৩৮.২), আসাম (৩৭.৬) এবং হরিয়ানায় (৩৭.২)। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সমস্ত রাজ্যে গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান।

শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে সেক্স রেসিও বিশ্লেষণ করতে হবে। ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে নিম্নে সেক্স রেসিও দেওয়া হল–

১৯৮১	৯৬২
১৯৯১	৯৪৫
২০০১	৯২৭

উপরের সারণি থেকে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে ০-৬ বছর বয়সীদের মধ্যে সেক্স রেসিও ক্রমশ কমছে। এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মতে এই নিম্নগামী প্রবণতা ভবিষ্যতে দেশের মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে নির্ধারিত সেক্স রেসিওকে প্রভাবিত করবে। ০-৬ বছরের মধ্যে যে অনুপাত ও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে তা দূর করা প্রায়ই অসম্ভব এবং দীর্ঘদিন তা জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করবে।

রেজিস্ট্রার জেনারেলের রিপোর্ট থেকে শিশুদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায় – দাদরা - নগর হাভেলি - ১০০৩, লাক্ষাদ্বীপ - ৯৯৯, ছত্রিশগড় - ৯৮২, মেঘালয় - ৯৭৩, ঝাড়খণ্ড-৯৭৩ এই সব রাজ্যে সেক্স রেসিও আশাপ্রদ বলা যায়। ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে জাতীয় গড়ের তুলনায় অবস্থা ভালো। অন্য বারোটি স্থানের গ্রামাঞ্চলে এই অনুপাত খুবই কম। দিল্লি, চণ্ডিগড়, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে অনুপাত সবচেয়ে খারাপ (৮৫০-৭৯৯)। শহরাঞ্চলে জাতীয় স্তরে অনুপাত খুবই কম (৯০৬) এবং ১৯৯১ সালে ৯৫৩ ছিল। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে অনুপাত খুবই কম এবং এর কারণ হল, কন্যাভ্রূণ হত্যা।

শিশুমৃত্যু হল দেশের মানব উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ১৯৫১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু ১৪৬ থেকে কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৬৮।

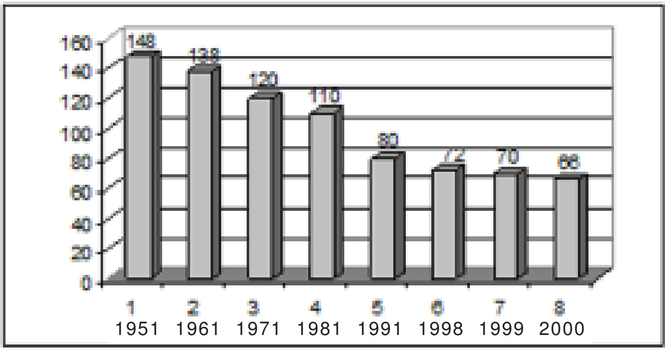

উৎস – স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার (২০০০), রেজিস্ট্রার জেনারেল (২০০১)

নিম্নে রাজ্য ভিত্তিক শিশুমৃত্যুর চিত্র (১৯৯৮) দেওয়া হল –

রাজ্য	৫ বছরের মধ্যে	১ বছরের মধ্যে	নব-জাতক	পেরি ন্যাটাল	মৃত সন্তানের জন্ম
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮	৬৬	৪৬	৫	১৭
আসাম	২৮	৭৬	৫১	৪৯	১১
বিহার	২৩	৬৭	৪৪	৩৭	৪
গুজরাট	২০	৬৪	৪৪	৩৮	৪
হরিয়ানা	২২	৭০	৪১	৩৯	১২
হিমাচল প্রদেশ	১৭	৬৩	৫০	৫০	১২

রাজ্য	৫ বছরের মধ্যে	১ বছরের মধ্যে	নব-জাতক	পেরি ন্যাটাল	মৃত সন্তানের জন্ম
কর্ণাটক	১৭	৫৮	৪২	৫৪	২১
কেরালা	৪	১৬	১১	১৫	৬
মধ্যপ্রদেশ	৩৩	৯৮	৬১	৫১	৭
মহারাষ্ট্র	১৩	৪৯	২৯	৩৫	১১
উড়িষ্যা	২৯	৯৮	৬০	৬১	১৭
পাঞ্জাব	১৭	৫৪	৩৩	৪২	১৭
রাজস্থান	২৮	৮৩	৫০	৪৫	৬
তামিল নাড়ু	১৩	৫৩	৩৫	৪১	১৩
উত্তর প্রদেশ	৩০	৮৫	৫২	৪৪	৬
পশ্চিমবঙ্গ	১৫	৫৩	৩০	৩০	৮
ভারত	২২	৭২	৪৫	৪২	৯

উৎস – রেজিস্ট্রার জেনারেল (২০০১), এস. আর. এস. রিপোর্ট - ১৯৯৮

অপূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম, শ্বাস নালীতে সংক্রমণ, ডাইরিয়া, অপর্যাপ্ত বা অনিয়মিত টীকাকরণ, নবজাতকের যত্নের অভাব ইত্যাদি ভারতে অধিক শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী। (রেজিস্ট্রার জেনারেল, ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন - ২০০০, গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত সমীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন)

☐ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি শিশু ভারতে বাস করে।
- প্রতি তিনটি অপুষ্ট শিশুর মধ্যে একটি ভারতে বাস করে।
- ভারতে প্রতি দুজন শিশুর মধ্যে একজন রক্তাল্পতার শিকার।
- প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন রক্তাল্পতার শিকার।
- আয়োডিনের অভাবে নবজাতকেরা প্রতি মুহূর্তে বিকাশের ক্ষমতা (লার্নিং ক্যাপাসিটি) হারাচ্ছে।
- ০-৬ বছরের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত খুবই কম। হাজার ছেলে থাকলে মাত্র ৯৩৩ কন্যা শিশু।
- অপুষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিক্ষার ক্ষমতা হ্রাস করে।
- জন্ম নথিভুক্তকরণ মাত্র ৫৫ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তি মাত্র ৪৩ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুট - ৪০ শতাংশ।
- দেশে ১০৪ লক্ষ শিশু শ্রমিক (এস.আর.ও - ২০০০)।

- শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ৬৮ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- মাতৃমৃত্যু প্রতি ১০০,০০০ প্রসবে (জীবিত) ৪০৭ (এস.আর.এস.-১৯৯৮)।
- জন্মের সময় কম ওজন - ৪৬ শতাংশ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- তিন বছরের শিশুদের মধ্যে রক্তাপ্লতা - ৭৪ শতাংশ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- টীকাকরণ খুবই কম (পোলিও-৫৮ শতাংশ, হাম-৫০ শতাংশ, ডিপিটি-৪৬ শতাংশ, বিসিজি-৬৭ শতাংশ, অন্যান্য-৪২ শতাংশ – এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- ৬৭ শতাংশ, অন্যান্য-৪২ শতাংশ – এন.এফ.এইচ.এস-২)।

তথ্যের উৎস - একাদশ (২০০৭-২০১২) পরিকল্পনার জন্য শিশু উন্নয়নের ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট।

২.৪ শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতার, পরিবার এবং বন্ধুদের ভূমিকা

সমাজকর্মী হিসাবে শিশুদের বিকাশকালীন চাহিদা সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায় জন বউলবাই (১৯৬৯ এবং ১৯৮৮) ও পরবর্তীকালে মেরী আইনস্মিথ (১৯৭৮) এর এট্যাচ্‌মেন্ট থিওরির মাধ্যমে।

ক্লাউস্ ও ক্যান্যালের মতে এটাচ্‌মেন্ট হল – দুই ব্যক্তির মধ্যে একধরনের স্নেহের বন্ধন যা স্থান কালের অতীত এবং দু-জনকে ভাবাবেগের মাধ্যমে একত্রিত করে। পহলবার্গের মতে – এট্যাচ্‌মেন্ট শিশুকে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে–

- পূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশ
- অনুভূতির বহির্প্রকাশ
- যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা
- ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি
- স্বাবলম্বন
- বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি ও হতাশার সঙ্গো খাপ খাওয়ানো
- ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই
- ভবিষ্যতের সম্পর্ক তৈরি
- ঈর্ষাপরায়ণ না হতে সাহায্য করে--

এবং পহলবার্গের মতে - এট্যাচমেন্ট না থাকলে শিশুর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দিতে পারে–

- ভালো-মন্দ বিচার বোধের অভাব
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না
- আত্ম-মর্যাদাবোধ থাকে না
- পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকে না
- আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ সঠিক হয় না

- কার্য কারণ বিচার করতে পারে না
- ব্যবহার স্বাভাবিক নাও হতে পারে
- ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিকীকরণ সঠিকভাবে হয় না
- বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না ইত্যাদি।

হোমসের (১৯৯৩) মতে এট্যাচমেন্ট থিওরির মূল বিষয়গুলি হল

● এট্যাচমেন্ট সংক্রান্ত মূল বিষয় সবসময় শিশুকে খাওয়ানোর সঙ্গো সম্পর্কিত নয়। এটি প্রায় সাত মাস বয়সে আসে এবং মূলত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এট্যাচমেন্ট।

● শিশুর সান্নিধ্য চাওয়া থেকে এট্যাচমেন্ট সম্পর্ক বোঝা যায়। বিপদ বা সমস্যার দেখা দিলে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সান্নিধ্য চাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

● সুরক্ষিত সম্পর্কের মধ্যে শিশু বৃহত্তর জগৎকে জানার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে।

● যার সঙ্গো শিশুর এট্যাচমেন্ট তার কাছ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিলে শিশু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, বিপন্ন বোধ করে এবং তার কাছে আবার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। বরাবরের জন্য যদি শিশুকে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে শিশুর নিরাপত্তা ও ব্যবহারে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

● প্রাথমিক এট্যাচ্‌মেন্টের অভিজ্ঞতা থেকে একটি অন্তর্নিহিত কার্যকরী মডেল তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

● সারা জীবন ধরে এট্যাচ্‌মেন্ট ব্যাপারটি থাকে এবং আবশ্যিক নির্ভরশীলতা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বন্ধুবান্ধব এবং পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতা জন্মায়।

মেরী আইনসওয়ার্থ মায়েদের সঙ্গো শিশুর এট্যাচ্‌মেন্ট পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অজানা ব্যক্তির সামনে মায়েদের থেকে শিশুকে সরিয়ে নেওয়া, এবং পুনরায় মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রতি ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতিক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রতিক্রিয়াগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

সিকিওর এট্যাচ্‌মেন্ট (টাইপ-বি)

শিশু চেষ্টা করে কখন সে মা-কে পাবে এবং মায়ের অনুপস্থিতিতে বিপর্যস্ত বোধ করে এবং খোঁজ করা বন্ধ করে। যখন সে ফিরে আসে তখন শিশু তার সান্নিধ্যে আসার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। অজানা ব্যক্তির সামনে সে দৃঢ়ভাবে বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। বাড়িতে যারা নিরাপদভাবে সান্নিধ্য পায় তারা কম কাঁদে, উদ্বিগ্ন হয় না, অসহযোগিতাও করে না। এক্ষেত্রে মায়ের ব্যবহারও দেখা হয়েছে। মায়ের ব্যবহারও সদর্থক, স্পর্শকাতর এবং শিশুকে সান্নিধ্যে আসতে উৎসাহ যোগায়।

এঙ্ক্‌শাস এভয়ড্যান্ট্ ইনসিকিওর এট্যাচ্‌মেন্ট্ (টাইপ-এ)

শিশু আলাদা হলে খুব একটা হতাশা ব্যক্ত করে না, মা ফিরে এলে মিলিত হতে চায় না, অনেকে তাকে অবজ্ঞা করে। মায়ের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, অজানা ব্যক্তির প্রতিও একই ধরনের ব্যবহার করে। মায়ের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উদাসীন, আগ্রহহীন, অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশ পায়।

এঙ্ক্শাস রেজিসট্যানস্ বা এম্-বিভ্যালেন্ট ইনসিকিওর এট্যাচ্মেন্ট্ (টাইপ-সি)

শিশু মা-কে ছেড়ে থাকার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করে, ছাড়ার সময় খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে, পুনর্মিলনের সময় উভয়সঙ্কটে পড়ে – সান্নিধ্য চায় আবার বাধা দেয়। বাড়িতে এই সব শিশু খুব কাঁদে, হতাশা ব্যক্ত করে এবং শারীরিক সান্নিধ্য চায় না। মায়ের ব্যবহার উষ্ণ কিন্তু শিশুর চাহিদার প্রতি উদাসীন এবং সঠিক সময়ে শিশুর প্রতি নজর দেয় না।

ডিস্অর্গানাইজড, ডিস্ অরিয়েন্টেড ইনসিকিওর এট্যাচমেন্ট্ (টাইপ-ডি)

শিশু ব্যবহারে বৈপরীত্য দেখা যায়। যখন ধরা হয় তখন দূরে চলে যাবার চেষ্টা, বাধা দেয়, এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, নঞর্থক চিন্তার অস্বাভাবিক বহির্প্রকাশ।

বউরগুইগঁ এবং ওয়াটসনের মতে (১৯৮৭), এট্যাচ্মেন্ট্ সংক্রান্ত তিন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যা মানসিক সমস্যা, ব্যবহারিক সমস্যা, চিন্তন প্রক্রিয়ায় সমস্যা এবং ডিভেলপমেন্ট ডিলে রূপে প্রকাশ পায়। সেগুলি নিম্নরূপ–

- ভয়গ্রস্ত শিশু, সম্পর্ক থেকে উদ্ভুত ভয় যার ফলে নতুন সম্পর্ক তৈরিতে বিশ্বাস ও আশা থাকে না।
- সঠিকভাবে সান্নিধ্য পায় নি এমন শিশু – মূল ব্যক্তির সঙ্গে সান্নিধ্য বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, কিংবা সঠিকভাবে হয় নি ফলে নতুন সম্পর্ক তৈরিতে অসুবিধা।
- কোন সান্নিধ্য পায় নি এমন শিশু – সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু যে মৌলিক সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত।

যে সব শিশুর এট্যাচ্মেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায়–

- সুস্থ সম্পর্ক তৈরি করার সমস্যা
- স্নেহ প্রদর্শনে সমস্যা।
- অপরিণত আত্মকেন্দ্রিক ব্যবহার,
- ভালো-মন্দ বিচার বোধে সমস্যা,
- মানসিক দূরত্ব রাখে

পিতামাতার ভূমিকা

শিশুর চাহিদা অনেকে মিটাতে পারলেও পিতামাতার সান্নিধ্য শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক (ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

বাউম্রিণ্ড (১৯৭২) এর মতে, পিতামাতার লালন পালনের দু-টি দিক রয়েছে – শিশুর চাহিদার প্রতি পিতামাতার নজর ও সদর্থক প্রতিক্রিয়া এবং পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁর মতে পিতামাতার আচরণ চার ধরনের হতে পারে (মেক্কোবাই এবং মার্টিন ১৯৮৩ – ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

চাহিদা (ডিমান্ডিংনেশ)

প্রতিক্রিয়া (রেসপনসিভনেশ্)		**হাই**	**লো**
	হাই	কর্তৃত্বপরায়ণ (অথরিটেটিভ্)	প্রশ্রয়দানকারী (ইনডালজেন্ট্)
	লো	আদেশ মান্য করা (অথরিটেরইয়্যান্)	উদাসীন (ইনডিফারেন্ট)

স্টেইনবার্গ (ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯০) নিম্নলিখিতভাবে চার ধরনের ব্যবহারের সারাংশ করেছেন–

কর্তৃত্বপরায়ণ (অথরিটেটিভ্) ঃ উষ্ণ কিন্তু কঠোর। ব্যবহারের মাপকাঠি ঠিক করে দেয় যা শিশুর বয়স ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যতাকে মূল্য দেওয়া হয় কিন্তু শিশুর ব্যবহারের দায়ভারও গ্রহণ করা হয়। যুক্তিযুক্ত শৃঙ্খলা যা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে স্থির করা হয়। এরুপ তত্ত্বাবধানের ফলে শিশু মানসিকভাবে দৃঢ় হয়, উষ্ণ, স্নেহপরায়ণ, সৃজনশীল, দায়িত্বপরায়ণ এবং আত্মবিশ্বাসী হয়, স্কুলে সফল হয়।

আদেশ মান্য করা (অথরিটেরইয়্যান্) ঃ আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর জোর দেয়। শৃঙ্খলা দণ্ডবিধি যুক্ত, বাধ্যতামূলক কোন আলোচনা করা হয় না। কোন প্রশ্ন না করে শিশু আইন মেনে নেবে এমন আশা করা হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। ব্যক্তি হিসাবে তাদের বিকাশকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। যে সকল শিশুরা খুবই নির্ভরশীল, নিষ্ক্রিয়, সামাজিক দিক থেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, জ্ঞান আহরণে উৎসাহ থাকে না তাদের এট্যাচ্মেন্ট এই ধরনের।

ইনডালজেন্ট্ ঃ সব ব্যবহারই মেনে নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক নয়। শিশুর স্বাধীনতা অবাধ। নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যে সব শিশু পরিণত হয় না, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নেতৃত্বের গুণাবলীহীন হয় যারা এরূপ ব্যবহার পেয়েছে।

উদাসীন (ইনডিফারেন্ট) ঃ পিতামাতার ভূমিকা অবহেলা সম্পন্ন। জীবন ও শৃঙ্খলা কেবল বড়দের ঘিরে। শিশুর ইচ্ছা, মতামত গুরুত্ব পায় না। শিশুর কাজকর্মের প্রতি নজর থাকে না। শিশুর অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে এধরনের ব্যবহারের জড়িত।

প্রকৃতপক্ষে লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতামাতার কম সান্নিধ্য, বিরুদ্ধ আচরণ, অঙ্গীকার রক্ষা হয়নি এবং খারাপ সম্পর্ক শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যারূপে দেখা দেয় (স্কেফার ১৯৯৬, স্টেইনবার্গ ১৯৯৩ – ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

কুপারের মতে (১৯৮৫) স্বাতন্ত্র্যতা সত্ত্বেও সব সংস্কৃতির সব শিশুর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য–

শারীরিক যত্ন

- স্নেহ-শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা
- নিরাপত্তা, রুটিন, যত্নের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা
- উৎসাহ ও প্রশংসার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সাহায্য
- তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ
- বয়স অনুসারে দায়িত্ব
- বয়স অনুসারে স্বাধীনতা – যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে, সিদ্ধান্তের প্রভাব বুঝতে পারে। ডেনিয়েল (১৯৯৯) এর মতে অসংগত লালন পালনের দিকগুলি হল–

মানসিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা

- শিশুর ইচ্ছা, চাহিদা ও উৎসাহের প্রতি উদাসীন মনোভাব
- স্নেহের অভাব

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা

- কঠোর শারীরিক শাস্তি
- কঠোর নিয়ন্ত্রণ
- চরম, প্রশ্নাতীত শৃঙ্খলা

পারিবারিক সম্পর্কে সমস্যা

- পিতামাতার মধ্যে খারাপ সম্পর্ক,
- সবসময় যুযুদ্ধমান অবস্থা,
- মানসিক চাপ যুক্ত, বিরক্তিকর পরিবেশ

তুল্যমূল্য বিচার

- খারাপ মনোভাব আরোপিত করা
- খারাপ বলে চিহ্নিত করা
- ক্ষিপ্ত হওয়া এবং ত্যাগ
- সদর্থক চিন্তাকে অবদমিত করা

পরিবারের ভূমিকা

পরিবার যে কোন সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেখানে সামাজিকীকরণ হয়। শিশু সামাজিক নিয়ম কানুন, মূল্যবোধ এবং পরিবারের ব্যাবস্থাপনার মধ্যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা পায়। পরিবারের মধ্যে শিশুর সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে–

নর্মেটিভ্ ঃ (যেখানে সমাজের মূল কানুন শিশুর মধ্যে বর্তায়)।

কগনেটিভ্ ঃ শিশু আচার আচরণ ও জ্ঞান আহরণ করে যা পরবর্তীকালে প্রাপ্তবয়স্কের আচরণে প্রকাশ পায়।

ক্রিয়েটিভ্ ঃ সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে, নতুন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক ঃ পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গীর, সন্তান ও অন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক।

এটি সর্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, পরিবারের মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে শিশুর সংযোগ স্থাপনে সহায়ক। এবং তা সঠিক না হলে বৃহত্তর সমাজে তার খারাপ প্রভাব পড়ে।

চেন্নাবাসভান্ন ও অন্যান্যদের মতে শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য পরিবারের নিম্নলিখিত ভূমিকা রয়েছে–

ক) যত্ন প্রদান (লালন পালন)

এই লালন পালন বা যত্ন অসহায় নলজাতক থেকে শুরু করে কিশোর বয়স পর্যন্ত হতে পারে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মিটানোর জন্য ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং নিরাপত্তা দরকার হয়। সঠিক লালন পালনের জন্য শিশুর বিভিন্ন বয়সের চাহিদা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং শিশুকে পরিচালনা করার দক্ষতা থাকা দরকার। মনে রাখতে হবে নয় মাসের শিশু এবং তিন বছরের শিশুর চাহিদা ভিন্ন এবং সুন্দর পরিবার শিশুর চাহিদা অনুসারে নিজেদের পরিবর্তন করে।

সাধারণত, মা মূলত শিশুর লালন পালনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করে ছোট্ট শিশুর ক্ষেত্রে। যদিও শিশুর যত্ন বা লালন পালন পারিবারিক ব্যাপার এবং পরিবার এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মায়ের শিশু লালন পালন করার ক্ষমতা তার বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক, অন্য শিশুদের চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত। বাবাও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। মায়েদের লালন পালন ক্ষমতা মূলত পরিবারের লোকজনের সহায়তার উপর নির্ভরশীল।

খ) সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা

সুন্দর, সুসংহত ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছেলে মেয়ের ভূমিকা কীরকম হবে তা যেন সে পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সুসম্পর্কের মধ্যে দেখার সুযোগ পায়। পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিপূরক ভূমিকা, নেতৃত্ব, ছেলে-মেয়ে কাজের ধরন ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিময়, নিয়মের প্রতি আনুগত্য এবং একসাথে বসবাসের মডেল বা আদর্শ রূপরেখা তুলে ধরে।

সেই জন্য পিতা-মাতার মধ্যে নির্ঝঞ্ঝাট সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি পিতা-মাতা দম্পতি হিসাবে একটি একক রূপে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে তবে শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের একটি আদর্শ রূপ বা মডেল দেখতে পায়। পিতা-মাতার মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন, বিভিন্ন জেনারেশানের মধ্যে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ শিশুকে মানসিক নিরাপত্তা দেয়। আর তা না হলে শিশু দ্বিধাগ্রস্ত হয় যা সুন্দর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়।

গ) পরিবার-সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশ

পরিবারই হল শিশুর কাছে প্রথম সামাজিক ব্যবস্থা যা সে দেখতে পায় এবং যেখানে সে বড় হয়। সেখানে সে পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারে। পারিবারিক মূল্যবোধ, প্রশংসা ও শাস্তি, আর্থিক লেনদেন, বিনিময়, একত্রে বসবাস, কর্তৃত্বের মূল্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সে জানতে পারে।

ঘ) পরিবার ও সংস্কৃতি

পরিবারের মধ্যে সে কয়েকটি বিষয় যেমন – খাদ্যের পছন্দ, পোশাক, খেলাধূলা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, গান-বাজনা ও অন্যান্য বৌদ্ধিক বিকাশের অনুপ্রেরণা পায়। শিশুর প্রথম শিক্ষক হল তার বাবা-মা, বাবা-মা না থাকলে শিশুর দায়িত্বে থাকা অন্য কেউ। এবং শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই পায়। তার বৌদ্ধিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ভিত্তি হল পরিবার।

এই চারটি ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনুসন্ধান করলে পরিবার, পিতামাতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। পরিবারে স্থায়িত্ব এবং সুসম্পর্কই শিশুর বিকাশের পক্ষে আদর্শ।

বন্ধুগোষ্ঠীর ভূমিকা

শৈশব অবস্থায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কও পরিবর্তন হয় (স্মিথ এবং কোই ১৯৯১)।

বয়ঃগোষ্ঠী	সম্পর্ক
৬ বছর ও তার কম বয়স	প্রতিবেশী অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে খেলা করে।
৭-৮ বছর	সাধারণত যারা কাছে থাকে এবং একই কাজে যুক্ত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
৯-১০ বছর	যাদের সঙ্গে মত বিনিময় করা যাবে এমন বন্ধু খোঁজ করে।
১১-১২ বছর	বন্ধুত্ব ক্রমশ সমঝোতা, ভাব বিনিময় ও পরস্পরকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

গটম্যান ও পার্কারের মতে (১৯৮৭) বন্ধুত্বের ছয়টি ভূমিকা রয়েছে

- সাহচর্য
- উদ্দীপনা
- শারীরিক সহায়তা
- ইগো সাপোর্ট
- সামাজিক তুলনা
- ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহ

কোই ও ডজের মতে (১৯৮৩) শিশুদের নিজেদের দ্বারা বিশ্লেষণ করা পাঁচটি বিষয় হল–

জনপ্রিয় শিশুরা সহযোগিতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব দেয়। গোষ্ঠীর কাজে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষমতা, বন্ধুত্ব পরায়ণ মনোভাব, দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং খোলামনে মিটমাট করার প্রবণতা তাদের জনপ্রিয় করে।

বিতর্কিত শিশুদের কিছুটা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তারা হিংসাত্মক, বিচ্ছিন্নতাকামী বা ধ্বংসাত্মক।

প্রত্যাখ্যাত শিশু ধ্বংসাত্মক, অসহযোগী, নেতৃত্বের ক্ষমতাহীন। তারা শর্তসাপেক্ষে গোষ্ঠীকর্মে যোগ দেয় এবং গোষ্ঠীকর্মের সাথে একমত নাও হতে পারে। তারা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বভাবতই তারা বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

অবহেলিত শিশু কলহপ্রিয় বা আক্রমণাত্মক নয়। তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও নেতৃত্বের অভাব দেখা যায়।

সাধারণ শিশুরা বন্ধুত্ব করতে পারে, খুব বেশি আক্রমণাত্মক কিংবা চুপচাপ থাকে না।

বুটারের এবং রুটারের মতে (১৯৯৩) বন্ধুত্বের সম্পর্ক মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ–

- বন্ধুদ্বারা প্রত্যাখ্যান পীড়াদায়ক
- বন্ধু না থাকলে সামাজিক সহায়তা নেই যা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রতিরোধক
- বন্ধু না থাকলে স্কুলের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ব্যাহত হয়।
- বন্ধুদ্বারা প্রত্যাখ্যান আত্মমর্যাদা ও আত্মক্ষমতা হ্রাস করে।
- যে ব্যবহার বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায় বিশেষ করে কলহ বা আক্রমণাত্মক মনোভাব পরবর্তীকালে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

২.৫ শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প

জাতীয় নীতি

ন্যাশন্যাল্ পলিসি ফর চিলড্রেন ১৯৭৪	এই নীতির মাধ্যমে জন্মের পূর্বে, জন্মের পরে ও পরবর্তীকালে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক তথা সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্যকে সুসংহত পরিষেবা প্রদানের কথা বলা হয়।
শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ১৯৮৬ এবং জাতীয় কর্মসূচি	শিশুদের জন্য যত্ন এবং শিক্ষার (ই.সি.সি.ই.) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুদের সার্বিক বিকাশ, পরবর্তী জীবনের বুনিয়াদ গঠনের জন্য ই.সি.সি.ই. খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে ধরা হয়। এবং কর্মরত মায়েদের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০০২)	রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া সমন্বয় এবং পরিবার তথা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যের যত্ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।
ন্যাশনাল্ চার্টার ফর চিলড্রেন ২০০৩	২০০৪ সালে শিশুদের জন্য জাতীয় ইস্তাহার গৃহীত হয়। শিশুরা যাতে সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শৈশব পায় তা সুনিশ্চিত করাই হল এর উদ্দেশ্য। পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা যাতে শিশুরা শোষণ, বঞ্চনার শিকার না হয়। এই সনদে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয় রয়েছে- ● জীবিত থাকা এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা ● অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সব ধরনের শোষণ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা ● মেয়ে শিশুদের সুরক্ষা ● প্রান্তিক অনগ্রসর শ্রেণির শিশুদের সুরক্ষা ● শিশুদের উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ জাতীয় সনদ, শিশুদের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৭৪ সালের ন্যাশন্যাল, পলিসি ফর চিলড্রেন এখনো নীতি সংক্রান্ত মূল অঙ্গীকার। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে ন্যাশন্যাল প্ল্যান অব্ একশন্ গৃহীত হয়।
কমিশন্ ফর দ্যা প্রোটেকশন্ অব চাইল্ড্	এর ফলে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতীয় স্তরে ও রাজ্য স্তরে কমিশন গঠন করা হয়। শিশুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হলে, অত্যাচার বা নির্যাতন করা হলে শীঘ্র বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে। কমিশন গঠনের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে রাজ্য স্তরে কমিশনার নিয়োগ করতে হবে। জাতীয় ও রাজ্য স্তরের কমিশনার তাদের গোচরে আনা সমস্ত বিষয় তদারকি করবেন এবং সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন ফর চিলড্রেন ২০০৫	শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি একশন্ প্ল্যানে রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বেশ কিছু প্রয়াস রয়েছে। যে সকল নীতির উপর ভিত্তি করে এই ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন্ তা হল– ● শিশুকে সম্পদ হিসাবে দেখা এবং তার মানবাধিকার রয়েছে, ● লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা এবং আইনগতভাবে সাম্য সুনিশ্চিত করা, ● নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনগ্রসর, হত দরিদ্র এবং যারা পরিষেবার সুযোগ পায় না তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া, ● বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা বড় হয়, এবং সেই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে শিশুর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হবে। ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান্ অব একশন্ ফর চিলড্রেন (২০০৫) কর্মসূচি রূপায়ণ ও অর্থ বরাদ্দ করার ব্যাপারে মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছে। বিষয়গুলি হল– ● শিশুমৃত্যু কমিয়ে আনা, ● মাতৃমৃত্যু কমিয়ে আনা, ● শিশুদের অপুষ্টি দূর করা, ● সব শিশুর জন্ম নথিভুক্তকরণ, ● সব শিশুর জন্য প্রাক্ শৈশব যত্ন, উপযুক্ত শিক্ষা, ● কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা, কন্যা শিশু সন্তান হত্যা বন্ধ করা, বাল্য বিবাহ রদ এবং কন্যা সন্তানদের বাঁচা, তাদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, ● গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রে জল ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করা, ● সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, ● সমস্ত ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অবহেলার হাত থেকে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা, ● শিশু শ্রম সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা, ● শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মসূচির মনিটরিং, পর্যালোচনা এবং সংশোধন, ● শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোল অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন্ ফর চিলড্রেন (২০০৫) রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

দ্যা ন্যাশন্যাল্ চিলড্রেনস ফান্ড্	১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে চেরিটেবল্ এন্ডোমেন্ট্ ফান্ড্ এক্ট, ১৮৯০ এর অধীনে দ্যা ন্যাশন্যাল্ চিলড্রেন্স ফান্ড্ গঠন করা হয়েছে। এই ফান্ড্ থেকে শিশুদের পুনর্বাসন সহ শিশু কল্যাণে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
দ্যা ন্যাশন্যাল্ কমন্ মিনিমাম্ প্রোগ্রাম	এখানে স্পষ্টভাবেই বলা আছে সরকার শিশুর অধিকার রক্ষা করবে, শিশুশ্রম রদ করবে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং কন্যা সন্তানদের যত্নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ন্যাশন্যাল্ কমন্ মিনিমাম্ প্রোগামের মূল বিষয়গুলি হল– ● সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য অঙ্গীকার, ● সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং ঐক্য সুনিশ্চিত করা, ● কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করা, ● দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য সরকার, ● দায়িত্বশীল সক্রিয় প্রশাসন। যদিও এন.সি.এম.পি. তে শিশুদের জন্য সরকারের সমস্ত অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয় নি, তবু শিশুর অধিকার সুরক্ষা করার মূল বিষয়টি সরকার দেখবে। এবং এই নীতি বাস্তবে রূপদানের জন্য ২০০৫ সালের ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশনে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং অঙ্গীকার

১৯৯২ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে শিশু সুরক্ষা, এবং তাদের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০ সালে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ঘোষিত শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা, সুরক্ষা এবং তাদের বিকাশ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করে পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে খসড়ার পরিবর্তনযোগ্য অংশগুলি সংশোধন করে শিশুদের যুদ্ধবিগ্রহ, শিশু পাচার, যৌগ ব্যবসা এবং পর্নগ্রাফির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। সহস্রাব্দর উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডিভেলপ্মেন্ট গোল) গ্রহণ করে ভারত পুনরায় তার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে। ২০০২ সালে সার্ক সম্মেলনে মহিলা ও শিশুদের পাচার ও যৌন ব্যবসায় নিয়োগের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করে। ২০০১-২০১০ এই দশকটি সার্কের শিশুর অধিকার দশক বলে চিহ্নিত করা হয়। এবং ১৯৯৬ সালে রাউলপিন্ডি প্রস্তাবনায় তা স্থির করা হয়েছিল।

কর্মসূচি–

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প (আই.সি.ডি.এস.)

১৯৭৫ সালে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প শুরু হয়–

- ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের, গর্ভবতী ও ছোট শিশু আছে এমন মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি।
- শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের বুনিয়াদ তৈরি।
- অসুখ, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু ও স্কুল ড্রপ আউটের প্রবণতা কমিয়ে আনা।
- বিভিন্ন নীতির সমন্বয় এবং কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে শিশু উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে মায়েদের সক্ষম করা যাতে তারা শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের এবং গর্ভবতী ও ছোট শিশু আছে এমন মায়েদের জন্য নিম্নলিখিত পরিষেবা দেওয়া হল–

১) পরিপূরক পুষ্টি,

২) টীকাকরণ

৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষা

৪) রেফারেল সার্ভিসেস

৫) প্রাক-প্রাথমিক, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

৬) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

এই কেন্দ্রীয় সবকারের একটি প্রকল্প এবং রাজ্য সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। কেন্দ্র, পরিপূরক পুষ্টি বাদে অন্য সমস্ত ব্যয় বহন করে, আর পরিপূরক পুষ্টির খরচ রাজ্য সরকার বহন করে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে পরিপূরক পুষ্টির জন্য প্রকৃত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বা নিয়ম অনুসারে ব্যয়ের ৫০ শতাংশ যা সর্বনিম্ন – সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র দিচ্ছে।

আর্থিক কারণে দশম পরিকল্পনায় চালু ৫৬৬২ টি প্রকল্প বাদে অন্য কোন নতুন প্রকল্প শুরু করার প্রস্তাব নেই। যদিও ২০০৫-০৬ সালে অতিরিক্ত ৪৬৬টি প্রকল্প এবং ১,৮৮,১৬৮ টি অঙ্গান ওয়াড়ি কেন্দ্র চালু হয়েছে। ৩১.১২.২০০৫ তারিখে দেখা যাচ্ছে ৫৬৫৩টি প্রকল্প এবং ৭৪৫,৯৪৩টি অঙ্গান ওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। ৩১.৩.২০০৬ তারিখে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৫৬৮.৪০ লক্ষ যার মধ্যে রয়েছে ৪৭৪.৫২ লক্ষ শিশু (০-৬ বছর) এবং ৯৩.৮৮ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, যা ৩১.৩.২০০২ তারিখে ছিল ৩৭৫.০৯ লক্ষ (৩১৫.০৩ লক্ষ শিশু এবং ৬০.০৬ লক্ষ মা)।

রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ক্রেস স্কীম্ ফর দ্যা চিলড্রন অব ওয়ার্কিং এলিং মাদারস্

২০০৬ সালের ১ লা জানুয়ারী প্রকল্পটি শুরু হয়। ন্যাশনাল্ ক্রেস, ফান্ড্ এবং কর্মরত ও দুস্থ মায়ের সন্তানদের জন্য ক্রেস্ পরিষেবা দুটি একত্রিত করে এই প্রকল্প। এই প্রকল্প রাষ্ট্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ও ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘ এই দুটি জাতীয় স্তরের বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য পরিপূরক পুষ্টি, জরুরী ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। শিশুপ্রতি খরচ ১.০৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২.০৮ টাকা। এবং কেন্দ্রে ২৫টি শিশু মাসে ২৬দিন এই পরিষেবা পাবে। বি পি এল পরিবারকে মাসে ২০ টাকা এবং অন্যদের মাসে ৬০ টাকা দিতে হবে।

সোস্যাল্ ডিফেন্স সার্ভিস প্রদানের জন্য বে-সরকারি সংস্থাকে সহায়তা

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয় যাতে তার নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রচলিত প্রকল্পের বাইরে নতুন ধরনের প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারে। উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ছাড়াও নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়।

ফুটপাতে বসবাসকারী শিশুদের জন্য সুসংহত প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল অসহায় শিশুদের ফুটপাতের জীবন থেকে সরিয়ে আনতে সাহায্য করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ফুটপাতবাসী শিশুদের বাসস্থান, পুষ্টি, স্বাস্থ্যের যত্ন, শিক্ষা এবং বিনোদন ইত্যাদি পরিষেবা দেওয়া হয় যাতে তারা শোষণের শিকার এমন শিশু এই কর্মসূচির লক্ষ্যদল। এই প্রকল্পের অধীনে যে ধরনের কর্মসূচি রয়েছে তা হল–

- শহর এলাকায় সমীক্ষা
- বর্তমান কি পরিষেবা রয়েছে তা নথিবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ
- কাউন্সেলিং, গাইডেন্স এবং রেফারেল সার্ভিসেস
- শিশুকে ২৪ ঘণ্টা রাখা যায় এমন স্থান
- প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা
- তাদের পরিবারের সঙ্গে শিশুদের পুনরায় সুন্দর সম্পর্ক তৈরি, অসহায়দের হোম, হোস্টেল বা আবাসিক স্কুলে রাখার ব্যবস্থা।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
- স্বাস্থ্য পরিষেবা, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনা, এইচ.আই.ভি. এডস্ এর হাত থেকে রক্ষা।
- সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা এবং পরামর্শদান

চাইল্ড লাইন সার্ভিস

চাইল্ড লাইনের টোল ফ্রী নম্বর হল ১০৯৮ এবং এই নম্বরে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হয়। যে সকল শিশুরা সমস্যা সঙ্কুল তারা বা তাদের অভিভাবক কথা বলতে পারে। বর্তমানে চাইল্ড্ লাইন ৭৩টি শহরে কাজ করছে। চাইল্ড্ লাইনের মূল উদ্দেশ্য হল-

১। শিশুর জরুরী প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য তাকে পথ প্রদর্শন করা;

২। সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থা যারা শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার কাজে লিপ্ত তাদের একটি ফোরাম্ বা মঞ্চ তৈরি করা;

৩। হাসপাতাল, চিকিৎসক, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনকে শিশুর চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন করা;

৪। শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা:

৫। সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রোগাম ফর্ জুভেনাইল জাস্টিস্

সরকার এই স্কিম্ চালু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল—

১। রাজ্য সরকারকে জুভেনাইল জাস্টিস্ অ্যাক্ট বর্ণিত পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা;

২। জুভেনাইল জাস্টিস্ পরিষেবার ন্যূনতম গুণগত মান বজায় রাখা;

৩। সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এমন কিশোর অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান।

এই প্রকল্পের অধীনে নারী ও শিশু উন্নয়ণ মন্ত্রক রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকে কিশোর অপরাধীদের যত্ন ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ৫০ শতাংশ আর্থিক অনুদান দেবে।

স্কিম্ ফর ওয়েলফেয়ার অব ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন ইন নিড্ অব কেয়ার এবং প্রোটেকশন্

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কর্মরত শিশুদের জন্য প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান যাতে তারা শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরতে পারে এবং ভবিষ্যতের শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই প্রকল্প ২০০৪-০৫ সাল থেকে রূপায়িত হচ্ছে।

সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি এবং শিশু গৃহ প্রকল্প

এই এজেন্সি ১৯৯০ সালের ২০ জুন স্থাপিত হয়। ১৮.৩.১৯৯৯ তারিখে ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন্ এক্ট অনুসারে স্বতন্ত্র্য সংস্থা রূপে রেজিস্টার্ড হয়। রাজ্য সরকারের সুপারিশ অনুসারে এই এজেন্সি অন্যান্য সংস্থাকে বিভিন্নদেশের মধ্যে শিশুদের দত্তক গ্রহণের (এডপশন্) ব্যাপারে সাহায্য করবে। এই এজেন্সি বিভিন্ন বিদেশি সংস্থাকেও সাহায্য করে। বর্তমানে সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি ৬৪টি

ভারতীয় সংস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগ সহ ২৫টি দেশে আরো ১৫২টি এজেন্সির নাম নথিভুক্ত করেছে। সেন্ট্রাল এডপশন্ রেসোর্স এজেন্সির মূল লক্ষ্য হল ভারত সরকারের নিয়ম নীতি অনুসারে দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিশুদের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় তদারকি করা। সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এসেন্সি আবার সরাসরি শিশুগৃহ প্রকল্প রূপায়িত করে।

ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক একটি প্রকল্প রূপায়ণ করছে যেখানে সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি বিভিন্ন সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থাকে দেশের মধ্যে শিশু দত্তক গ্রহণ বা এডিপশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। বার্ষিক সর্বাধিক অনুদান ছয় লক্ষ টাকা।

ন্যাশন্যাল্ চাইল্ড্ লেবার প্রেজেক্টস্ (জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প)

শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে জেলা স্তরে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি বিশেষ বিদ্যালয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা পাবে। ঐ সব বিশেষ বিদ্যালয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশু শ্রমিকদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পরিপূরক পুষ্টি পরিষেবা, বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। সমীক্ষায় চিহ্নিত শিশু শ্রমিকদের এইসব কেন্দ্রে ভর্তি করতে হবে এবং তারা নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিথা পাবে–

১। প্রথাগত বা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

২। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

৩। পরিপূরক পুষ্টি (প্রতিদিন শিশুপ্রতি ৫ টাকা হারে)

৪। বৃত্তি (প্রতিমাসে শিশুপ্রতি ১০০ টাকা)

৫। স্বাস্থ্য পরিষেবা (২০টি বিদ্যালয়ের জন্য একজন ডাক্তার)

২.৬ শিশু সুরক্ষা – সাংবিধানিক সুরক্ষা, শিশুর অধিকার

ডন ও ডোনেলের মতো শিশু সুরক্ষা হল – শিশুর সমস্ত অধিকার যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। এটি অন্যান্য অধিকার যেমন সুন্দর ভাবে বাঁচা, বিকাশ ও উন্নতির পরিপূরক।

তাঁদের মতে শিশু সুরক্ষা কথাটি আরো ব্যাপক এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় নিহিত রয়েছে। শিশুদের যৌন ব্যবসার সঙ্গো আর্থিক বিষয় জড়িত। অন্যান্য বিষয় যেমন – স্কুলে এবং বাড়িতে নির্যাতন – দারিদ্র, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রথার সঙ্গো জড়িত। শিশুপাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। অশ্লীল চিত্র তৈরিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মতে শিশু সুরক্ষা হল – শিশুর জীবনে ঘটতে পারে এমন যে কোন অনুমেয় বা প্রকৃত বিপদ বা ঝুঁকি থেকে শিশুকে রক্ষা করা। এটি প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি বা বিপদ লাঘব করা। সমস্ত শিশু যেন সামাজিক নিরাপত্তা পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শিশুর অন্যান্য অধিকারের সঙ্গো শিশু সুরক্ষাও জড়িত। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে শিশুদের অন্য সব অধিকারই প্রভাবিত হবে। শিশু সুরক্ষা হল সব শিশুর সব অধিকারের সুরক্ষা। এটি অবশ্যই শিশুদের ক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মরক্ষা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকার সঙ্গো সম্পর্কিত।

যে সব শিশুরা নির্যাতন, শোষণ ও অবহেলার শিকার তাদের নিম্নলিখিত ঝুঁকি থাকে–

- আয়ু কমতে পারে
- খারাপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা
- শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা
- পরবর্তীকালে সঠিকভাবে বাবা-মা র ভূমিকা পালন করতে পারে না।
- গৃহহীন, ভবঘুরে ইত্যাদি।

বিপরীত পক্ষে সঠিক শিশু সুরক্ষা শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও আত্মবিশ্বাসের সহায়ক। সেক্ষেত্রে নির্যাতন বা শোষণের সুযোগ থাকে না। (ডন ও ডোনেল ২০০৪)

শিশু সুরক্ষা প্রত্যেক শিশুর অধিকার হলেও কিছু শিশু সমস্যার সম্মুখীন এবং তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সরকার ঐ সব শিশুদের – সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত শিশু বলে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ–

- গৃহহীন (ফুটপাতবাসী, স্থানান্তরিত বা বিতাড়িত)
- উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী
- অনাথ, পরিত্যক্ত, অসহায়
- পিতামাতার যত্ন পায় না এমন শিশু
- শিশু শ্রমিক
- শিশু ভিক্ষুক
- বাল্য বিবাহের শিকার শিশু
- পাচার হওয়া শিশু
- শিশু যৌনকর্মী
- যৌনকর্মীর শিশু
- বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বা সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত শিশু
- প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত শিশু
- মাদক দ্রব্য, এইচ.আই.ভি. এডস্ ও অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত শিশু
- আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিশু
- মেয়ে শিশু
- অপরাধের শিকার শিশু
- আইনের সমস্যায় জড়িত শিশু।

শিশু সুরক্ষা বিষয়টি বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সব শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

● প্রায় ৩০টি দেশে ৩০০,০০০ শিশু সৈনিক এমন কি আট বছর বয়সের শিশুও রয়েছে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত।

● ১৯৯০ সাল থেকে কুড়ি লক্ষের বেশি শিশু যুদ্ধের ফলে মারা গেছে।

● আইনের কারণে বিশ্বে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু কারাগারে বন্দী। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ১৫ লক্ষ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩০ লক্ষ শিশু এডস্ এর কারণে অনাথ।

● প্রায় ২৫ কোটি শিশু – শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে এবং ১৮ কোটির বেশি বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যুক্ত।

● প্রায় ১২ লক্ষ শিশু প্রতি বছর পাচার হয়।

১৯৯৫ সালের হিসাব অনুসারে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু (বিশেষ করে বালিকা) যৌন ব্যবসায় যুক্ত। এখন সংখ্যাটি অনেক বেশি হবে।

● ১৫ বছরের নীচে ৪ কোটি শিশু অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার এবং তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা দরকার।

হিসাব অনুসারে আফ্রিকায় বসবাসকারী প্রায় ১০-১৩ কোটি মহিলা এবং বালিকা যৌন নির্যাতনের শিকার।

সাংবিধানিক সুরক্ষা

শিশুদের জন্য বেশ কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন–

১৪ নং ধারা – ভারতে কাউকে সাম্য ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৫(৩) নং ধারা – কোন কিছুই নারী ও শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে অন্তরায় হবে না।

২১ নং ধারা – আইনের শিকার না হলে কোন ব্যক্তি তার বেঁচে থাকা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

২১ এ ধারা – ৬ থেকে ১৪ বছরের সব শিশুকে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে।

২৩ নং ধারা – ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা কোন বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য কাউকে পাচার করা যাবে না।

২৪ নং ধারা – ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে খনি বা অন্য ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

২৫-২৮ নং ধারা – মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পেশা নির্বাচন ও ধর্মীয় আচার আচরণে স্বাধীনতা।

৩৯ নং ধারা – কৈশোর যেন অপপ্রয়োগ না করা হয় .... অর্থনৈতিক চাহিদা থাকলেও নয়। তাদেরকে সমস্ত ধরনের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে সুন্দরভাবে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

৪৫ নং ধারা – ৬ বছর পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রাক শৈশবের যত্ন এবং শিক্ষা।

৪৬ নং ধারা – দুর্বল শ্রেণি বিশেষ করে তপঃজাতি ও তপঃউপজাতির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে ব্যবস্থা।

৪৭ নং ধারা – পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং জীবন ধারনের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত।

৫১ নং ধারা – রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন কানুনের প্রতি আনুগত্য দেখাবে।

৫১ এ ধারা – পিতামাতা বা অভিভাবক ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

শিশুর অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলন

বিশ্বের সমস্ত সমাজে শিশুরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আবার ঝুঁকি সম্পন্ন। সুতরাং তাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে নির্ধারিত, ১৯৮৯ সালে তৈরি করা শিশুর অধিকার এই সুরক্ষা সংক্রান্ত খসড়ার ভিত্তিতে প্রায় সমস্ত দেশ নিজেদের মতো করে শিশু সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। ভারত সরকার ১৯৯২ সালে তা সংশোধন করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে গৃহীত শিশুর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি হল–

● ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে, বিবাহিত বা অবিবাহিত এমন কি তাদের সন্তান থাকলেও সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে।

● এই সম্মেলন তিনটি নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় – শিশুর স্বার্থ, সাম্য এবং শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সম্মান।

● শিশুর সুষম বিকাশের পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

● রাষ্ট্র দেখবে যাতে সমাজে শিশুরা সঠিকভাবে সমমর্যাদা পায়।

● নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

● বাঁচা

● সুরক্ষা

● বিকাশ

● অংশগ্রহণ

বাঁচার অধিকারগুলি হল

● জীবনের অধিকার

● সুস্বাস্থ্যের অধিকার

● পুষ্টি

- সুন্দর জীবন ধারণের মান
- নাম ও জাতীয়তা

বিকাশের অধিকারগুলি হল

- শিক্ষার অধিকার
- প্রাক্ শৈশবের যত্ন
- সামাজিক সুরক্ষা
- বিশ্রাম, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চা

সুরক্ষার অধিকারগুলি হল

- শোষণ থেকে সুরক্ষা,
- নির্যাতন থেকে সুরক্ষা,
- অমানবিক বা অসম্মান জনক পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা,
- অবহেলা থেকে সুরক্ষা,
- জরুরী অবস্থা, যুদ্ধ বা প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা।

অংশগ্রহণের অধিকারগুলি হল

- শিশুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- তথ্য পাওয়ার অধিকার
- চিন্তা, মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় আচরণের অধিকার।

যদিও সুরক্ষার ধরন অনুসারে এই বিভাগ করা হয়েছে তবু বলা যায় সমস্ত অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যা সহজে চোখে পড়ে না।

আবশ্যিক অধিকার (নাগরিক ও রাজনৈতিক) – যার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য, শাস্তি, কিশোর অপরাধীর জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা, জীবনের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, পরিবারে পুনরায় থাকার অধিকার, অধিকাংশ অধিকারই আবশ্যিক অধিকারের মধ্যে পড়ে তাই গুরুত্ব সহকারে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বিকাশ বা প্রগতি সংক্রান্ত অধিকার – (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা পূর্বের অধিকারগুলির মধ্যে নেই এমন সব অধিকার।

শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে –

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাতাবরণে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়।

উৎস চাইল্ড্ প্রোটেকশন – এ হ্যান্ড বুক ফর টিচার্স, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার-২০০৬।

২.৭ শিশুদের নির্যাতন – ধরন, প্রভাব

শিশুদের নির্যাতন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যা ১৯৯৯ সালে শিশুদের নির্যাতন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সংঞ্জা দেন–

শারীরিক নির্যাতন

শারীরিক নির্যাতন শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। যেমন – আগুনের ছেঁকা দেওয়া, আঘাত করা, ঘুষি মারা, লাথি মারা, ভয় দেখানো, প্রহার ইত্যাদি। অনেক সময় পিতামাতা বা পরিবারের লোকজন শিশুকে আঘাত করতে চান না। কিন্তু অধিক শাসনের অঙ্গা হিসাবে শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকেন, যা শিশু বয়সের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

যৌন নির্যাতন

শিশুর যৌন ব্যাপারে অনুপযুক্ত ব্যবহার। যেমন শিশুদের যৌনাঙ্গা নাড়াচাড়া করা, শিশুকে দিয়ে বয়স্কদের যৌনাঙ্গা নাড়াচাড়া করানো, যৌন মিলন, ধর্ষণ, ভাই-বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক, ছেলে-ছেলে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীলভাবে দেহ অনাবৃত করা এবং অন্যান্য যৌন উপভোগ। শিশু যত্নের সঙ্গো যুক্ত ব্যক্তি এইভাবে যৌনতার দিক দিয়ে শিশুকে ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে শিশুদের অপব্যহার কথাটি ব্যবহার হয়। আর কোন অপরিচিত ব্যক্তি এই সব করলে তা যৌন নির্যাতন বলে ধরা হয় এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং ফৌজদারী মামলা করা হয়।

মানসিক নির্যাতন

মানসিক নির্যাতনকে মৌখিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ণ বলে ধরা হয়। পিতামাতা বা শিশুযত্নের সঙ্গো যুক্ত ব্যক্তির ব্যবহার শিশুর ব্যবহার, চিন্তার জগৎ, মানসিক জগৎ, আবেগকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে এবং মানসিক ভয় দেখা দিতে পারে। তাঁরা যদি শিশুকে খুব শাস্তি দেন – যেমন অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, চেয়ারের সঙ্গো দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রাখা, বকা, বিরক্ত হওয়া ইত্যাদি। তাহলে শিশুর উপর খুবই প্রভাব পড়ে। তাছাড়া শিশুকে খারাপ ভাষায় গালাগালি দেওয়া, দোষারোপ করার প্রবণতা ইত্যাদিও তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করে। অবহেলা শিশুর মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হওয়া। অবহেলা-শারীরিক, মানসিক বা শিক্ষাগত হতে পারে। শারীরিক অবহেলা যেমন – উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বা বস্ত্র, চিকিৎসা না দেওয়া, যত্ন না করা, ঠাণ্ডা বা গরমের হাত থেকে রক্ষা না করা। শিশুকে পরিত্যাগ করাও হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলা – উপযুক্তভাবে শিক্ষা না দেওয়া, প্রয়োজন মতো বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া। মনস্তাত্ত্বিক অবহেলা – সঙ্গা, আদর ভালোবাসা না দেওয়া, মদ পান বা নেশার সময় শিশুকে কাছে রাখা বা তাকে মদ পান করতে সাহায্য করা।

শিশু নির্যাতনের সম্বন্ধে গবেষণার বা অনুসন্ধান করার জন্য ২০০৭ সালে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক নিম্নলিখিত সংজ্ঞা ঠিক করেন–

শিশু নির্যাতন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, বোঝা যায় এমন যে কোন ধরনের নির্যাতন হতে পারে। এবং তা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সংজ্ঞাগুলি নিম্নরূপ–

● মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক নির্যাতন, অবহেলা, নিষ্ঠুরতা, যৌন নির্যাতন ও মানসিক ভাবাবেগে আঘাত।

● যে কোন ধরনের কাজ যা শিশুকে স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দেয় না, তাকে ছোট বা হেয় করে।

● তার মৌলিক চাহিদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যেমন – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আঘাতপ্রাপ্ত শিশুকে সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে যা তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা স্থায়ী সমস্যা বা মৃত্যু হতে পারে।

● শারীরিক নির্যাতন হল শিশুকে শারীরিকভাবে আঘাত করা যার ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এবং তা মারধর করা, লাথি, ঘুষি মারা ইত্যাদি হতে পারে।

● মানসিক ভাবাবেগে আঘাত বা মানসিক নির্যাতন – পিতামাতার ভূমিকা পালন করতে না পারা, পরিচর্যাকারী, আত্মীয় স্বজন তাদের ভূমিকা পালন করতে না পারলে শিশুর মানসিক বিকৃতি, ব্যবহারিক সমস্যা বা মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

● যৌন নির্যাতন হল যৌনতার দিক থেকে শিশুর প্রতি অনুপযুক্ত ব্যবহার করা। যেমন – শিশুদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করা, শিশুকে দিয়ে বয়স্কদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করানো, যৌন মিলন, ধর্ষণ, ভাই-বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীলভাবে দেহ অনাবৃত করা, যৌনতা সংক্রান্ত পত্রিকা, চিত্র দেখানো ইত্যাদি। শিশু যত্নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এইভাবে যৌনতার দিক দিয়ে শিশুকে ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে যৌন অপব্যবহার কথাটি ব্যবহার হয়।

● শিশুদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করার যে কোন কাজই শিশু অবহেলার অঙ্গ। অবহেলা যে কোন ধরনের যেমন – শারীরিক, মানসিক, শিক্ষা সংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক বা ভাবাবেগ সংক্রান্ত হতে পারে। শারীরিক অবহেলা যেমন – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিচর্যা না দেওয়া। শিশুকে পরিত্যাগ করাও হতে পারে। শিক্ষার দিক থেকে অবহেলা যেমন – উপযুক্তভাবে শিক্ষার সুযোগ বা শিশুর প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া। মনস্তাত্ত্বিক অবহেলা – উপযুক্ত স্নেহ ভালোবাসা না দেওয়া।

শিশু নির্যাতনের ধরন ও চিহ্ন

ধরন	নির্যাতন	চিহ্ন
শারীরিক নির্যাতন--	প্রহার, চপেটাঘাত, ঠেলে ফেলে দেওয়া, লাথি মারা, কামড়ে দেওয়া, শ্বাস রোধ করা, কান মোড়া, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, গরম জল ঢালা এবং অন্যান্য কঠোর নির্যাতন।	পোড়ার ক্ষত, কামড়ানোর চিহ্ন, কাটা – থেঁতলানো, ভবঘুরে – ঘরে যেতে চায় না।
যৌন নির্যাতন-	শিশুর যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া-চুম্বন, বয়স্কদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করতে দেওয়া, শিশুকে পোশাক খুলতে বাধ্য করা, বাথরুম বা বিছানায় শিশুকে লক্ষ্য করা, শিশুর সামনে যৌন সংসর্গ, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, অশ্লীল গল্প বলা, অশ্লীল ছবি,	যৌন ব্যাপারে অস্বাভাবিক উৎসাহ, কু-কর্মে প্রবৃত্তি, নিজের যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে অবহেলা, অতিরিক্ত উত্তেজনা- আক্রমণ, বিশেষ

ধরন	নির্যাতন	চিহ্ন
	পত্রিকা দেখানো। বাণিজ্যিক দিক থেকে শোষণ যেমন – শিশু যৌন কর্মী, শিশুদের যৌন পত্রিকা ইত্যাদি।	কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যকে ভয়।
মানসিক নির্যাতন-	উচ্চস্বরে বকাবকি করা, ভয় দেখানো, তর্জন-গর্জন, অপমান করা – অপরের খারাপ দিকের সঙ্গো তুলনা করা, এবং সে ভালো নয় বা খারাপ, অপদার্থ এরুপ গালাগালি করা। স্নেহ ভালোবাসার (চুম্বন, প্রশংসা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি) অভাব, শিশুর সব কাজই ভুল এভাবে বলা, অবজ্ঞা করা বা প্রত্যক্ষাণ-শিশুর প্রতি নজর না দেওয়া, শ্রদ্ধা না করা, শাস্তি – অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, চেয়ার করে রাখা, ভীতি প্রদর্শন, হিংসাত্মক কাজের সাক্ষী – শিশু অপরের হিংসাত্মক ব্যবহার দেখলে, শিশু বলে তাকে শোষণ করা, শিশু চুরির ভয়।	ঔদাস্য বা অনীহা, আক্রমণাত্মক, বিরুদ্ধাচরণ, মনোসংযোগে সমস্যা।
অবহেলা	শারীরিক অবহেলা – উপযুক্ত খাদ্য না দেওয়া, আবহাওয়া অনুসারে বস্ত্র না দেওয়া, যত্ন তদারকি না করা, নিরাপদ পরিষ্কার ঘর না দেওয়া, সঠিক চিকিৎসা না করানো। শিক্ষা সংক্রান্ত অবহেলা-সঠিক বয়সে শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করা, তার প্রয়োজন মাফিক বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া, স্কুল না যেতে সাহায্য করা ইত্যাদি। ভাবাবেগ জনিত অবহেলা-স্নেহ ভালোবাসা না দেওয়া, শিশুর সঙ্গো সময় না দেওয়া, প্রয়োজন মতো মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা না করা।	আবহাওয়া অনুসারে পোশাক না পরা, নোংরা থাকা, স্নান না করা, প্রচণ্ড ক্ষুধা, আপাত যত্ন পরিচর্যার অভাব।

শিশু নির্যাতনের প্রভাব

শারীরিক	ক্ষত বা আঘাত চিহ্ন, মৃত্যু, স্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা, বৌদ্ধিক বিকাশে সমস্যা।
ব্যবহারিক সমস্যা-	বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, কম বয়সে গর্ভসঞ্চার, আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অবনতি, শিশু নির্যাতন।
মানসিক-	আত্মবিশ্বাসের অভাব, অবসাদ, দুশ্চিন্তা, খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা, সুসম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, নিজেকে আলাদা করা বা সরিয়ে নেওয়া, চরিত্র গঠনে সমস্যা।

উৎস চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইনফরমেশন গেটওয়ে, ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস।

ভারতে শিশু নির্যাতনের গতিপ্রকৃতি বা চিত্র

ভারতে শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ২০০৭ সালে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের গবেষণা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য জানা গেছে–

১। প্রতি তিন জনের মধ্যে দু-জন শিশু শারীরিকভাবে নির্যাতিত।

২। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এমন ১৩টি রাজ্যে ৬৯ শতাংশ নির্যাতিত শিশুর মধ্যে ৫৪.৬৮ শতাংশ বালক।

৩। প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি শিশু যে কোন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

৪। বাড়িতে নির্যাতিত শিশুদের মধ্যে ৮৮.৬ শতাংশ বাবা-মায়ের দ্বারা নির্যাতিত।

৫। স্কুলে পড়া শিশুদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ শিশু (দুই তৃতীয়াংশ) শারীরিক শাস্তি পায়।

৬। স্কুলে শাস্তি পাওয়াদের মধ্যে ৬২ শতাংশই সরকারি ও মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলে।

৭। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার এবং দিল্লিতে এমন ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি, এবং প্রায়ই ঘটে।

৮। অধিকাংশ শিশু কাউকে সে কথা জানায় না।

৯। ৫০.২ শতাংশ শিশু সপ্তাহে সাত দিন কাজ করে।

যৌন নির্যাতন

১। ৫৩.২২ শতাংশ শিশু নানা ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার।

২। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার এবং দিল্লিতে ছেলে মেয়ে উভয়ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

৩। উত্তরদাতা শিশুদের মধ্যে ২১.৯০ শতাংশ মারাত্মক যৌন নির্যাতনের শিকার, ৫০.৭৬ শতাংশ অন্যান্য কিছু যৌন নির্যাতনের শিকার।

৪। উত্তরদাতা শিশুদের মধ্যে ৫.৬৯ শতাংশ শিশুর উপর বলাৎকার করা হয়েছে।

৫। আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং দিল্লিতে এরূপ বলাৎকারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি।

৬। ফুটপাতে বসবাসকারী, কর্মস্থলে ও প্রাতিষ্ঠানিক যত্নে বেড়ে ওঠা শিশুরাই সবচেয়ে বেশি বলাৎকারের শিকার।

৭। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী ব্যক্তি শিশুর পরিচিত যাকে সে বিশ্বাস করে, এবং যার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

৮। অধিকাংশ শিশু কাউকে সে সব কথা জানায় না।

মানসিক নির্যাতন এবং কন্যা সন্তানের অবহেলা

১। প্রতি মুহূর্তে শিশুরা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন।

২। প্রায় সমান সমান ছেলে মেয়ে এরূপ সমস্যায় পড়ে।

৩। ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাই নির্যাতন করে।

৪। ৪৮.৪ শতাংশ কন্যাসন্তানকে ছেলের মতো করে দেখা হয়।

শিশু পাচার

শিশু পাচার বন্ধ করতে এবং পাচারকারীদের শাস্তি দিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শিশু পাচার কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আন্তর্দেশীয় অপরাধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে (২০০০) নিম্নলিখিতভাবে পাচার কথাটির অর্থ নিরূপণ করা হয়।

১। শিশু পাচারকারী বলতে - শোষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, আশ্রয় দেওয়া, কাউকে ভয় দেখিয়ে কিংবা বল প্রয়োগে, প্রতারণা, ছলনা, বঞ্চনা, ক্ষমতার বা পদের অপপ্রয়োগ করে নিয়ে আসা, অর্থের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে তার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে নেওয়া ইত্যাদি বোঝায়। শোষণ বলতে দাসত্ব, দাসত্বের মতো কোন ব্যবহার, বাধ্যতামূলক শ্রম বা কাজ, যৌন নিপীড়ন, যৌনবৃত্তিতে নিয়োগ, গোলামী, অঙ্গাচ্ছেদন ইত্যাদি বোঝায়।

২। উপরোক্ত অংশে আলোচিত পাচারকারীর অভিপ্রেত শোষণে - প্রতারিত ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয় বা অপ্রাসঙ্গিক।

৩। নিয়োগ, অপসারণ, স্থানান্তর, আশ্রয় দেওয়া অথবা শোষণের জন্য শিশুকে নেওয়া পাচার বলে গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যাপার নাও ঘটতে পারে।

৪। শিশু বলতে ১৮ বছরের নীচে যে কোন ব্যক্তি হতে পারে।

সেভ্ দ্যা চিল্ড্রেন এলায়েন্স এর দেওয়া পাচার কথাটির সংজ্ঞা নিম্নরূপ

নিয়োগ, দেশের মধ্যে বা অন্য দেশে স্থানান্তর, শিশু সহ অন্যকে আশ্রয় দেওয়া এবং তা ভয় দেখিয়ে বা চাতুরী করে, ঋণের কারণে ক্রীতদাসরূপে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে বা বিনা অর্থে নিযুক্ত করা, ক্রীতদাসের মতো যে কোন কাজ (গৃহস্থালী, যৌন বা সন্তানধারণ) করতে বাধ্য করা বোঝায়।

গ্লোবাল এলায়েন্স এগেনস্ট ট্রাফিক ইন উইম্যান নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেয়

যে কোন কাজ কিংবা কাজের প্রয়াস যা নিয়োগ, স্থানান্তর, ক্রয়, বিক্রয়, আশ্রয়, ভয় দেখিয়ে বা বল প্রয়োগ করতে বাধ্য করা এবং অর্থের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসের মতো যেখানে সে বসবাস করে না এমন জায়গায় কাজ করতে বাধ্য করানো।

শিশু পাচার বলতে – ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগে, কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রতারণা করে শিশুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

শিশু পাচারের পিছনে যে সকল শোষণমূলক মনোভাব থাকে তা নিম্নরূপ

শ্রমের মাধ্যমে শোষণ

শিল্প, খনি ও অন্যান্য ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যেমন - রাসায়নিক এবং পোকামাকড় দমনের ঔষধ নাড়াচড়া, বিপজ্জনক মেশিন ব্যবহার ইত্যাদিতে লাগানো হয়। তারা যাতে কাউকে বিপদের কথা না বলতে পারে। সেইজন্য সাধারণত তাদের দূরে রাখা হয়।

অনেকক্ষেত্রে ক্রীতদাসের কাজে লাগানো হয়। তাদের পরিবার সাধারণত অগ্রিম কিছু অর্থ পায় এবং এমনভাবে তা শিশুর বেতন থেকে কাটা হয় যে কোনদিন সে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না।

গৃহের কাজ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও) এর মতে গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত শিশুদের মধ্যে মেয়েরাই বেশি। শিক্ষিত ও উপযুক্ত চাকুরি দেওয়া হবে বলে বাবা-মা এবং শিশুকে বলা হয়। একবার পাচার হয়ে গেলে দেখা যায় পরিষেবা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। নিরাপত্তা, খাদ্য ও বসবাসের জন্য নিয়োগকারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় এবং কঠিন কঠোর পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

যৌন শোষণ

শিশু বিশেষকরে মেয়েদের এই কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। তাদের বেশ্যালয়ে, ম্যাসাজ পার্লারে, নগ্নভাবে ক্লাবে ব্যবহার কিংবা অশ্লীল চিত্র তৈরির কাজে লাগানো হয়। আই.এল.ও এর মতে ২০০০ সালে ১৮ লক্ষ শিশু যৌন শিল্পে শারীরিক, যৌন ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিপীড়িত হয়েছে।

সৈন্যদলে কাজে লাগানো

দেখা গেছে হাল আমলে প্রায় ৩০টি ক্ষেত্রে বিশ্বের নানা স্থানে শিশুদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ দারিদ্র্যতার কারণে যোগ দিতে বাধ্য হয় আবার কাউকে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। বার্তাবাহক, কুলি, রাঁধুনী কিংবা অনেক সময় তাদের স্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে হয়। যে সব শিশুরা

খুবই গরিব, অনাথ, বিতাড়িত, বাবা-মা থেকে আলাদা থাকে, শিক্ষার সুযোগ পায়নি তারাই বেশি করে এই কাজে যুক্ত।

বিবাহ

কনে হিসাবে মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রে পাচার করা হয়। দারিদ্রতার ক্ষেত্রে মেয়েদের বোঝা হিসাবে দেখা হয় এবং বয়স্ক মানুষের সঙ্গো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকজন মুক্ত হতে চায়। অনেক সময় বাইরে কাজ করা ছেলেরা তাদের নিজেদের এলাকা থেকে মেয়েদের নিয়ে যায়। যেসব এলাকায় এইচ.আই.ভি. এডস্ এর সমস্যা রয়েছে সেখানে বয়স্ক পুরুষের কাছে কুমারী মেয়েদের চাহিদা খুব বেশি। পরিবারের লোকজনও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায় কারণ তারা মনে করে এর ফলে তাদের সন্তান এইচ.আই.ভি. এডস্ এর সংক্রমণ থেকে বাঁচবে। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বাল্যবিবাহ বিশেষ করে ১৯ বছরের কমে, খুবই বেশি যথাক্রমে - ৪৯ ও ৪০ শতাংশ।

অবৈধ দত্তক

দত্তক গ্রহণের ক্রম বর্ধমান প্রবণতা অবৈধভাবে শিশু পাচারকে উৎসাহ দিচ্ছে। অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে শিশুকে বিক্রি করে দেয়, অনেক সময় শিশু চুরি হয় বা মৃত শিশু জন্মেছে বলে মা-কে বলা হয়।

খেলাধূলা

ছেলেদের উটের পিঠে চাপিয়ে খেলা করা হয়। এটি খুব লাভজনক ব্যবস্থা এবং ছোট শিশুদের ব্যবহার করা হয়। এই খেলা খুবই বিপজ্জনক এবং গভীর আঘাত বা মৃত্যুও হতে পারে। হেরে গেলে মালিক নৃশংসভাবে শিশুর উপর অত্যাচার করে যেমন - খেতে দেয় না, বেতন দেয় না তাছাড়া মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি

ভিক্ষাবৃত্তি বা পথে জিনিস বিক্রির কাজে শিশুকে লাগাবার জন্য শিশুকে নিয়োগ বা পাচার করা হয়। অনেক সময় করুণা আদায় ও বেশি অর্থের লোভে শিশু ভিক্ষার্থীর অঙ্গাচ্ছেদন করা হয়।

অঙ্গা পাচার

অঙ্গা পাচারের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই চক্র খুঁজে বের করা কঠিন। এইরূপ ভয়ংকর কাজ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।

ভাবাবেগ বা মানসিক প্রভাব

লজ্জা অনুভব, নিজেকে দোষী মনে করে

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কম

প্রতারিত বলে মনে করে

নিদ্রাহীনতা

হতাশাগ্রস্ত

অবসাদগ্রস্ত

মানসিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আত্মহত্যার চেষ্টা

শারীরিক প্রভাব

ধর্ষণের শিকার হতে পারে

যৌন নিপীড়ণের শিকার

যৌনরোগ, এইচ.আই.ভি. বা এডস্ আক্রান্ত হতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

শিক্ষা ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পারিবারিক জীবন বলতে কিছু থাকে না।

শৈশব অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হয়।

স্কুলে যেতে পারে না, পরিবারের সহায়তা পায় না।

স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে দূর থাকে।

অদক্ষ ও অশিক্ষিতরূপেই বড় হয়।

নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে না।

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না।

শিশুদের শোচনীয় অবস্থার মূল কারণগুলি হল

১। দারিদ্রতা

২। লিঙ্গ বৈষম্য - বালিকা ও মহিলাদের অসম সামাজিক পদমর্যাদা

৩। বিদ্যালয়ে কম নথিভুক্তি বা ভর্তি

৪। অযত্নে বেড়ে ওঠা শিশু (অনাথ)

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধ

৬। সস্তা শিশু শ্রমিকের চাহিদা

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। চাইল্ড ডিভেলপমেন্ট ফর চাইল্ড কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন ওয়ার্কারস - ব্রিগিড ডেনিয়েল, সেলী ওয়াসেল এবং রবি গিলিগাঁ, ১৯৯৯।

২। দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড - অ্যাপ্রোফাইল, নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ, ভারত সরকার, ২০০২।

৩। ইন্ট্রিকেটরস্ অব্ মেন্টাল হেলথ - মাল্টি সেন্টার্ড আই.সি.এম.আর স্টাডি, ফেজ-২ - এস. এম. চেন্নাবাসভান্না, মেথু ভার্গিস এবং প্রভা এস. চন্দ্র।

৪। সাব গ্রুপ রিপোর্ট - একাদশ পরিকল্পনায় চাইল্ড প্রোটেকশন (২০০৭-২০১২), নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৫। বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০০৬-২০০৭, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৬। অ্যা রিপোর্ট - ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ডিভেলপমেন্ট অব্ চিলড্রেন ফর ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৭। স্টাডি অন্ চাইল্ড এবিউজ্ - ইন্ডিয়া ২০০৭, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৮। ন্যাশ্ন্যাল্ প্ল্যান অব্ একশন্ ফর চিলড্রেন - ২০০৫, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৯। ট্রেনিং ম্যানুয়্যাল ফর কমব্যাটিং ট্রফিকিং ইন উইম্যান এন্ড চিলড্রেন, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ইউ.কে।

১০। চাইল্ড্ প্রটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর টিচার্স, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১১। চাইল্ড্ প্রটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর পঞ্চায়েত মেম্বার, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১২। চিলড্রেন রাইটস এন্ড্ রেসপনসিবিলিটিস - ইউনিসেফ।

১৩। চাইল্ড প্রোটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর পার্ল্যামেনটারিয়ানস্, ইনটার পার্ল্যামেনটারী ইউনিয়ন এন্ড ইউনিসেফ, ২০০৪।

১৪। কমব্যাটিং চাইল্ড ট্রাফিকিং, অ্যা হ্যান্ড্ বুক ফর পার্ল্যামেনটারিয়ানস্, ইনটার পার্ল্যামেনটারী ইউনিয়ন এন্ড ইউনিসেফ, ২০০৫।

১৫। ইন্ডিয়া, বিল্ডিং প্রোটেক্টিং এনভাইরনমেন্ট ফর চিলড্রেন, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১৬। চিলড্রেন্ ইন ইন্ডিয়া এন্ড দেয়ার রাইটস্, ডঃ সবিতা ভাখ্রি, ন্যাশন্যাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, ২০০৬।

২.৯ অনুশীলনী

১। এটাচমেন্ট থিওরি কীভাবে শিশু বিকাশের চাহিদাকে বিশ্লেষণ করে?

২। শিসুদের সুষম বিকাশের জন্য পিতা-মাতা, পরিবার ও বন্ধুদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। ভারতে শিশু বিকাশ সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচি আলোচনা করুন।

৪। শিশু সুরক্ষা বলতে কী বোঝেন? সাংবিধানিক সুরক্ষা ও শিশুর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। শিশুদের অপব্যবহার সম্বন্ধে লিখুন। শিশুদের অপব্যবহারের ধরন ও প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। চাইল্ড ট্রাফিকিং বলতে কী বোঝেন? ট্রাফিকিং এর কারণগুলি এবং এর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

একক ঃ ৩ বার্ধক্যের যত্ন

গঠন

৩.১ সূচনা

৩.২ ধারণা

৩.৩ ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

৩.৪ সমস্যা

৩.৫ বয়স্ক কল্যাণ কর্মসূচি

৩.৬ বয়স্কদের যত্নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৮ অনুশীলনী

৩.১ সূচনা

মানুষের জীবন-প্রাক্‌শৈশব (ইনফ্যান্সি), শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় এই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রতিটি অবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা রয়েছে। প্রাক-শৈশবে (ইনফ্যান্সি) শৈশবকাল নির্ভরশীল অবস্থা। কৈশোর হল শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের ধাপ। যৌবন কর্ম-চঞ্চল আর প্রৌঢ় অবস্থায় বিদায় লগ্নের জন্য প্রস্তুতি। মানুষ একটি জীব মাত্র এবং তার জীবন কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে প্রৌঢ়কালে সমাপ্ত হয়।

৩.২ সূচনা

মানব শরীরের অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর দুর্বলতার কারণে শারীরিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অক্ষম হয়ে পড়া ব্যক্তিরা বয়স্ক বা প্রৌঢ় বলে পরিচিত। অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাগুলি ক্রমশ কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। ভারতে আমরা সাধারণত ষাট বছর অতিক্রান্ত মানুষদের প্রৌঢ় বলে চিহ্নিত করি। প্রৌঢ়ত্ব কোন রোগ নয়, এটি মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা। বহুলপ্রচলিত ধারণা হচ্ছে – বয়স্করা অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন রোগের শিকার। সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায় যে ষাট বছর অতিক্রান্ত মানুষেরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় প্রৌঢ়।

৩.৩ ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

যে কোন দেশের জনগণকে বয়স লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বাসস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশা অনুসারে শ্রেণি বিন্যাস করা যায়। বয়স অনুসারে মানুষকে আমরা ছোট শিশু, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করি। গত শতকের শুরুতে প্রায় ১২০ লক্ষ বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। শতকরা হার হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। ১৯৭০-৭৫ সালে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৪৪.৭, আর ১৯৯১-৯৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০.৩। সঙ্গতভাবেই ২০০১ সালে বয়স্ক মানুষের হার দাঁড়ায় ৭.৭ শতাংশ। যা ২০২০ সাল নাগাদ ১১ শতাংশে পৌঁছাবে বলা আশা করা যায়। সংখ্যা হিসাবে ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে যথাক্রমে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ও ৭ কোটি ছিল। যা, ২০০৫ সাল নাগাদ ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ হতে পারে।

৩.৪ সমস্যা

বয়স্ক মানুষেরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। বস্তুতপক্ষে, ভারতবর্ষের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স্ক মানুষের সমস্যাকে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁদেরকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে তা নিম্নরূপ–

(ক) পারিবারিক সমস্যা

বৈদিক যুগে আমাদের যৌথ পরিবারের রীতি ছিল। ঐরূপ পরিবারে বয়স্ক মানুষের সমস্যা খুব বেশি দেখা যেত না কারণ সেখানে নিরাপত্তাহীনতার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত পরিবারের দিকে আমাদের প্রবণতা এবং ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক মূল্যবোধ বয়স্ক মানুষদের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। এরূপ পরিবারে সঠিকভাবে বয়স্ক মানুষের যত্ন করা সম্ভব হয় না এবং তাঁরা একাকীত্ব অনুভব করেন। অনেক ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্ম তাঁদেরকে বোঝা বলে মনে করে এবং অমানবিক ব্যবহার করে। শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন দেওয়া হয় না। যার ফলে বয়স্ক মানুষেরা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং যা থেকে হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ এবং অসহায়বোধের উৎপত্তি। তাঁদের অনুভূতি বুঝবার চেষ্টা করা হয় না।

(খ) অর্থনৈতিক সমস্যা

যেহেতু, বয়স্করা শারীরিক কারণে কাজ করতে পারেন না তাই তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। আর্থিক ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলে তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না।

অন্যদিকে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থনৈতিক বিষয় তাঁকে পরিবারের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ভারতে অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অসহায়।

(গ) স্বাস্থ্য সমস্যা

বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা শুরু হয়। শরীরের

প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। দেখা গেছে প্রায় অর্ধেক বয়স্ক মানুষ দীর্ঘকালীন রোগে ভুগছে। বয়স্ক মানুষদের দশটি সাধারণ রোগ হল - ছানি, উচ্চ মানসিক চাপ, পাত, হৃদরোগ, বহুমূত্র, প্রোস্টেট গ্রন্থির সমস্যা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অবসাদ, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি। এই সকল রোগ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ। এক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ যত্ন ও সহায়তার দরকার যা সাধারণত দেখা যাচ্ছে না। এই সকল সমস্যার সঙ্গে বধিরতা, অন্ধত্ব, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর ছয়টি সাধারণ কারণ হল - ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, হৃদ রোগ, সেরিব্রাল বা কার্ডিয়াক স্ট্রোক, ফুসফুসের রোগ, ক্যানসার এবং যক্ষা।

(ঘ) গৃহ সমস্যা

বৃদ্ধরা সাধারণত গৃহ সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে শহর এলাকায় যেখানে ফ্ল্যাটে বসবাস সেখানে সচরাচর এই সমস্যা দেখা যায়। ঐ সকল ছোট ফ্ল্যাটে তাদের উপযুক্ত বসবাসের স্থান থাকে না। মুক্তভাবে বসবাসের জায়গা থাকে না। আমাদের মানসিক চিন্তাভাবনাও এই সমস্যার জন্য কিছুটা দায়ী। মানুষ আজকাল একক পরিবারে বসবাস করতে ভালোবাসে। যার ফলে বয়স্ক মানুষদের থাকার সমস্যা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধাশ্রম এরই ফলশ্রুতি।

(ঙ) সামাজিক সমস্যা

শারীরিক এবং অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে বয়স্ক মানুষেরা পরিবারে মর্যাদা পায় না যা সে যৌবনে কর্মরত অবস্থায় পেত। সমাজের জন্যেও তেমন কিছু করতে পারে না। ফলে সামাজিক পদমর্যাদাও খুব একটা থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই অসহায় এবং হতাশার শিকার হন। আত্ম-মর্যাদা হারানো বয়স্ক মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। তারা একই ছাদের তলায় বাস করলেও কিছুটা একাকীত্ব অনুভব করে। এখান থেকেই অসহায়তা, মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশার উৎপত্তি।

৩.৫ বয়স্ক কল্যাণ কর্মসূচি

ভারতবর্ষের মতো দেশে বয়স্কদের জন্য খুব বেশি পরিষেবা নেই। ভারত সরকার ন্যূনতম কিছু পরিশেবা চালু করেছে। রাজ্য সরকারও কিছু পরিষেবা প্রদান করে। কিছু কিছু রাজ্য সরকার বৃদ্ধভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও ভাতার পরিমাণ খুবই কম। কিছু বে-সরকারি সংস্থা বড় বড় শহরে বৃদ্ধাশ্রম চালাচ্ছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় প্রতিটি রাজ্যে অসহায়, ভিক্ষায় নিযুক্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য ভবঘুরে আবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে নিম্নলিখিত পরিষেবা রয়েছে –

(১) ন্যাশন্যাল পলিসি ফর্ ওলডার পারসনস্ (এন.পি.ও.পি.)

এই নীতি ১৯৯৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল–

(ক) বৃদ্ধ বয়সের উদ্দেশ্যে আগাম কিছু ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা।

(খ) বয়স্কদের যত্নের ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের উৎসাহিত করা।

(গ) বে-সরকারি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিপূরক পরিষেবা প্রদানের জন্য সহায়তা।

(ঘ) বয়স্ক মানুষদের গোষ্ঠী ও সংগঠনের সুরক্ষা, তত্ত্বাবধান।

(ঙ) বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা।

(চ) বয়স্কদের পরিষেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা।

(ছ) বয়স্কদের সমস্যা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা।

(২) ন্যাশ্‌ন্যাল কাউনসিল ফর্ ওলডার পারসনস্ (এন.সি.ও.পি.)

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ভারত সরকার ন্যাশ্‌ন্যাল কাউনসিল ফর্ ওলডার পারসনস্ স্থাপন করেছে। এর দায়িত্ব হল বয়স্ক মানুষদের জন্য নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। বয়স্কদের কল্যাণে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবায় কার্যকারিতা সম্বন্ধে সরকারকে মতামত দেওয়াও এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। বস্তুতপক্ষে, এটি হল বয়স্ক কল্যাণে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার সর্বোচ্চ সংস্থা।

(৩) ইন্টিগ্রেটিড্ প্রোগ্রাম্ ফর্ ওলডার পারসনস্ (আই.পি.ও.পি.)

বয়স্কদের অবস্থার উন্নতির জন্য এটি আর একটি পরিষেবা। বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রম, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা, ডে কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য মোট প্রকল্প বাজেটের ৯০ শতাংশ এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তাছাড়া, বৃদ্ধদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রকএল্পর অধীনে ২০০৪-০৫ সালের ৪৪৪টি সংস্থা আর্থিক সহায়তা লাভ করে। ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ২০০৬ সালে বিধান সভায় বয়স্কদের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি বিল পাশ করেন। এর ফলে সন্তানের দ্বারা বঞ্চিত পিতামাতার পক্ষে সুরক্ষা ও আশ্রমের দাবি করা সহজতর হয়েছে। তাদের শুধু পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। বাকি কাজ রাজ্য সরকার করবে। ঐ বিলে বলা হয়েছে উপার্জনকারী সন্তানের গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতার বসবাসের অধিকার রয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রম ও বহুমুখী পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্ব-নির্ভর মহিলা গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষে আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য বয়স্ক কল্যাণ প্রকল্প রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে ২০০৪-০৫ সালে ছয়টি সংস্থাকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

এই কাজে অন্যতম পারদর্শী হেলপ, এজ্ ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থা ১৯৭৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে চলেছে। এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লিতে অবস্থিত। তাছাড়া এর শাখা কার্যালয় সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে বয়স্ক মানুষদের জন্য জাতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতির উদ্দেশ্য হল এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে বয়স্ক মানুষরা তাদের জীবনের শেষ দিনগুলি অর্থবহভাবে, শান্তিতে ও মর্যাদা সহকারে কাটাতে পারে। এই সংস্থা, জাতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি ও প্রকল্প রূপায়ণ যাতে হয় তার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। হেলপ এজ্

ইন্ডিয়া নিজে থেকে তৃণমূল স্তরে সংগঠন তৈরি সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করছে। বয়স্কদের জন্য এদের পরিষেবা নিম্নরূপ–

(ক) বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা

অনেক বয়স্ক মানুষকে পরিবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়। অনেক সময় তাদের প্রতি এমন খারাপ ব্যবহার করা হয় যে তারা স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য প্রথমে একটি আশ্রমের প্রয়োজন। সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থার উদ্যোগে দেশের প্রায় সর্বত্র এই ধরনের বৃদ্ধাশ্রম স্থাপিত হয়েছে। প্রায় অর্ধেক এরূপ বৃদ্ধাশ্রম হেলপ এজ্ ইন্ডিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত। এই সব আশ্রমের বাসিন্দারা ভালোবাসা, যত্ন এবং সুরক্ষা পেয়ে থাকে।

(খ) ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা

বয়স্ক মানুষ যারা কোন না কোন কারণে গৃহে থাকতে পারে না তারা এই ডে কেয়ার সেন্টারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই সব সেন্টারের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয় যেমন– (১) আয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, (২) স্বাস্থ্যের যত্ন, (৩) পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, (৪) সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্বের সুযোগ যা এই বয়সে খুবই জরুরী ইত্যাদি।

(গ) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

যে সকল সংস্থার কর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিযুক্ত হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে বার্ধক্যের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা হয় এবং যাতে সঠিকভাবে ঐ সব মানুষের যত্ন নিতে পারে তার জন্য দক্ষ করে তোলা হয়। এই দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী।

(ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

সমস্ত বৃদ্ধ কিন্তু শারীরিক দিক থেকে অক্ষম নন। তাদের অনেকেই এখনো কাজ করতে পারে। সুযোগ পেলে তাদের অনেকে কাজ করে আয় করবে। হয়তো বেশি আয় করতে পারবে না কিন্তু যতখানি আয় করবে তা হাতখরচের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং সর্বোপরি অর্থবহভাবে সময় কাটাতে পারবে। এই কথা বিবেচনা করে হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমন কি স্বল্প-সঞ্চয় কর্মসূচি চালু করেছে যেখানে তারা অল্প অল্প টাকা জমাতে পারবে এবং প্রয়োজন মতো টাকা তুলে খরচ করতে পারবে।

(ঙ) চক্ষু যত্ন পরিষেবা

স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধদের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি এমন একটি সমস্যা যা মানুষকে অসহায় ও অক্ষম করে তোলে। হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া চক্ষু অপারেশন শিবিরের মাধ্যমে ছানি নিরাময়ের ব্যবস্থা করে। বলা বাহুল্য, বয়স্ক মানুষদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা।

(চ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া কেবলমাত্র বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী ও ডে কেয়ার সেন্টারে আগত ব্যক্তিদের পরিষেবা

প্রদান করে না, পরিবারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের জন্যেও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। নিকটবর্তী পরিকাঠামোর অভাবে কিংবা অর্থনৈতিক কারণে বয়স্ক মানুষরা চিকিৎসার সুবিধা পায় না। হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া তাদের হাতের কাছে পৌঁছে যায় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাদের এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্যের জন্য অপরকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে।

(ছ) মনিটরিং মূল্যায়ন

অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় পরিষেবার গুণগত মানের পর্যালোচনার জন্য হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া নিয়মিত তাদের পরিষেবার তদারকি ও মূল্যায়ন করে।

৩.৬ বয়স্কদের যত্নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

বয়স্ক মানুষের সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বয়স্কদের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দিতে পারে। তারা বোঝাতে পারে যে বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদি শিশুদের শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ সহ বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বয়স্ক মানুষরা যাতে তাদের মানসিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে। এটা বিশেষ করে বৃদ্ধাশ্রমে সম্ভব। তাছাড়া, পার্ক, প্ল্যাটফরম, মন্দির ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে তারা প্রায় দিন একত্রিত হয়। সেখানে সমাজকর্মীরা সাক্ষাৎ করে গ্রুপ কাউন্সেলিং করতে পারে। জীবনের এই পর্যায়কে সাদরে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের বোঝাবার দরকার তারা যেন নিজের প্রতি কর্তব্য করতে পারে এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়, তারা নেতার মতো বৃদ্ধ মানুষের সমস্যা সরকার ও সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারে যাতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয় এবং সমস্যা লাঘবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চতুর্থত, সমাজকর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করে বয়স্ক মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে। তারা যাতে অর্থকরী কাজে যুক্ত হয়ে নিজেদের জন্য কিছু আয় করতে পারে তার জন্যও সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু, সমাজকর্মীদের মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সুতরাং,

(ক) ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করতে হবে।

(খ) সমস্যা প্রকৃতি, গভীরতা এবং সমস্যার দিকগুলি ভালো করে জানবে।

(গ) কী ধরনের সাহায্য দরকার তা স্থির করবে।

(ঘ) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং গুরুত্ব সহকারে তালিকা করবে।

(ঙ) নথি এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখবে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের উপলব্ধি করা দরকার যে ভারতে বৃদ্ধদের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুবিধা হবে। হাজার হাজার বে-সরকারি সংস্থা দেশে কাজ করছে কিন্তু প্রায় কেউই এই সমস্যা গুরুত্ব সহকারে সমাধান করার চেষ্টা করছে না। বে-সরকারি সংস্থাগুলির উপলব্ধি করা দরকার যে বয়স্কদের কল্যাণ তাদের অন্যতম কাজের ক্ষেত্র হতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত যুব সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্ব সহকারে সমস্যা উপলব্ধি করে এবং তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ইন্ডিয়া - ২০০১, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার।

(২) হেলথ্ কেয়ার অব্ দ্য এল্ডারলি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আই. আই. এম. এস., স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

৩.৮ অনুশীলনী

(১) বৃদ্ধ বয়স কথাটির অর্থ কী? বয়স্কদের মূল সমস্যাগুলি কী কী ?

(২) বয়স্কদের কল্যাণে সরকার ও বে-সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি আলোচনা করুন।

(৩) বয়স্কদের কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৪ নারী উন্নয়ন

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ নারীর সামাজিক পদমর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৩ কিছু বাস্তব চিত্র

৪.৪ বিচার্য বিষয়সমূহ

৪.৫ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

৪.৬ গৃহীত পদক্ষেপ

৪.৭ নারী কল্যাণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং ধারাসমূহ

৪.৮ প্রভাব

৪.৯ নাগরিকদের ভূমিকা

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১ ভূমিকা

নারীর সামাজিক পদমর্যাদা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এখনো মহিলারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে খুবই পিছিয়ে। মূলত আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী হলেও বেশ কিছু অন্য কারণও রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি পরিস্ফুট হয়। বিভিন্ন প্রথা এবং চিরাচরিত আইনের মধ্যে সেই সকল কারণগুলি বিদ্যমান।

আমরা জানি যে শিশুর যত্ন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ (জনগোষ্ঠী) এবং দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু চিরকালই তারা অবহেলিত। বেদ-এ নারীরদের উচ্চ মর্যাদার স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদমর্যাদারও পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষে পুরুষদের তুলনায় নারীর সামাজিক পদমর্যাদা অনেকটাই নিম্নমানের। এই অবস্থায় উন্নতি না ঘটালে কোন ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে নারী-পুরুষের সম-মর্যাদার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা সামগ্রিক উন্নয়নেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের দেশের মহিলাদের সৌন্দর্য, লাবণ্য, মাধুর্য, মিতভাষিতা, নম্রতা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের প্রবণতায় গর্ব অনুভব করতেন। তিনি বলেছিলেন ভারতীয় নারীদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধারণ মানুষের ব্যবহারে তার প্রতিফলন দেখা যায় না।

৪.২ নারীর সামাজিক পদমর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯০১ সালে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ৯৭২ মহিলা ছিল। ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯৩৪। ১৯৯৭ সালে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র যেমন আই.এ.এস্., আই.পি.এস., আই.এফ.এস্, ইত্যাদিতে মহিলারা মাত্র ৭.৫ শতাংশ স্থান অধিগ্রহণ করে ছিল, আর অন্যান্য সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রায় ১৫ শতাংশ।

লোকসভায় মহিলারা বরাবর ১০ শতাংশের কম আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিসংখ্যান ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৯৬ সালে এমন অপরাধের সংখ্যা ছিল ১,১৫,৭২৩ যা বেড়ে ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় ১,২১,২৬০। অর্থাৎ এক বছরে অপরাধের সংখ্যা ৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মৃত্যুহার বেশি। বিদ্যালয়-ছুটদের মধ্যেও একই চিত্র দেখা যায়। অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের পারিশ্রমিক পুরুষদের পারিশ্রমিকের তুলনায় কম। কিন্তু মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ও অবিচার সম্বন্ধে সচেতন নয়।

শত শত বছর ধরে আমাদের দেশের মহিলারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত এবং শোষিত। নিপীড়ন নানানভাবে হতে পারে যেমন – পণ, প্রহার, বহু-বিবাহ, ধর্ষণ, বৈধব্য, নারী-পাচার, মানসিক নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। সংবিধানে সম-মর্যাদার কথা বলা হলেও শিক্ষা, পারিশ্রমিক, বেতন রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই মহিলাদের সেই মর্যাদা দেওয়া হয় না।

যে কোন স্থানের নারী পুরুষের শিক্ষার হারের তুলনামূলক বিচার করে নারীর পদমর্যাদা অনুধাবন করা যায়। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের শিক্ষার হার পুরুষদের শিক্ষার হার অপেক্ষা অনেকটাই কম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং অন্যান্য কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের সর্বত্র এই চিত্র বিদ্যমান।

পরিবারে ও সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সাধারণত অবহেলিত এবং নানা বৈষম্যের শিকার হয়। নিরক্ষরতা যা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় পাপ, লজ্জা এবং দেশের অভিশাপ – তা এই বৈষম্যের ফল। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দরিদ্র মহিলারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। দিন মজুরি হিসাবে তারা খুব কম আয় করে। যেহেতু তারা অদক্ষ তাই সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পায় না। স্বাভাবিক কারণেই তারা নীরব ও নিশ্চুপ থাকে।

৪.৩ কিছু বাস্তবচিত্র

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে মহিলাদের খুব বেশি কাজ করতে হয়, ফলে – সময়ের অভাবে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। স্থানীয় স্তরের স্বায়ত্ব শাসিত সরকারের

সরকারি কিংবা বে-সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শিশু, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা এবং বিকলাঙ্গ মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ পরিষেবা প্রদান করা এবং বাড়ির কাজকর্মে পুরুষ ও মহিলার সামনে অংশগ্রহণের জন্য মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিশু ও আত্মীয় পরিজনদের যত্নের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং তা পালন করার জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করা উচিত।

মহিলারা পরিবার ও সমাজে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর জন্য তারা কোন স্বীকৃতি পায় না। পুরুষেরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে, শোষণ করে। ফলে তারা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন এবং দুর্বল শ্রেণিভুক্ত হিসেবেই থাকে। এটা দুর্ভাগ্যের যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যাচ্ছে কন্যাসন্তান ও মহিলাদের মৃত্যুর হার বেশি। শিক্ষার হার কম। অধিকাংশ মহিলা অপুষ্টির শিকার। উচ্চ বেতনের চাকুরিতে মহিলাদের নিযুক্তি খুবই কম। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে পারিশ্রমিকও কম। তারা নানান ধরনের বৈষম্যের শিকার। তাছাড়া, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও অত্যাচারের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী। মহিলারাও তাদের দায়ভার এড়াতে পারে না। তাদেরকেও ঐ সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ৫ লক্ষাধিক মা গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালীন সময়ে মারা যায়। তার মধ্যে প্রায় ৯৫ বেশি বয়সে গর্ভধারণ, ঘন ঘন ও বহুবার গর্ভধারণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, হাতুড়ে চিকিৎসক দ্বারা যত্রতত্র গর্ভপাত, গর্ভাবস্থায় নিয়মিত টিটেনাস্ টক্সয়েড্ ও অন্যান্য পরিষেবা না গ্রহণ করার ফলে মায়েদের মৃত্যুর হার বেশি।

৪.৪ বিচার্য বিষয়সমূহ

পূর্বের রীতি অনুসারে মহিলাদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরোক্ষ উপভোক্তা রূপে নয়, তাদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও অংশীদার হিসাবে দেখতে হবে।

সমাজে মহিলাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের এবং বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর-সুস্থ পরিবেশে জীবন ধারণের সমান অধিকার রয়েছে। পরিকল্পনার সর্বস্তরে তাদের জীবন ধারণের পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখা দরকার।

পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব, জমির মালিকানা উপভোগ এবং নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণের সমান অধিকার মহিলাদের রয়েছে। সরকারি দপ্তরে চাকুরি, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এবং কর্মস্থলের সর্বত্র তাদের সমান অধিকার আছে।

যেহেতু ভারতবর্ষে মহিলারা দীর্ঘদিন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাই তাদের সমস্যা সমাধানের কথা আলাদাভাবে ভাবা দরকার। বিষয়টি উপলব্ধি করে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নে বেশি বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ প্রাসঙ্গিক হলেও উল্লিখিত বহুমুখী সমস্যা ও তার গভীরতার কাছে খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি।

সম্ভবত কোন দেশই মহিলাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কানাডা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল – যার ফলে সেখানে মহিলাদের শিক্ষার হার ১০০ শতাংশ, জন্মহার কম, শিশুমৃত্যু কম এবং আয়ু বেশি। প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। সে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ১০০ শতাংশ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ২০০১ সালেও দেখা যাচ্ছে কুটি কোটির বেশি মানুষ নিরক্ষর, অসংখ্য বেকার এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানীয় জল পরিষেবা অপর্যাপ্ত। জীবন ও জীবিকার সর্বস্তরেই অপ্রতুল অবস্থা। আর মহিলারা চরমভাবে এই পরিস্থিতির শিকার।

কিছু দৃষ্টান্ত ইঙ্গিত দেয় যে মহিলারা আশানুরূপভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এমনকি শিল্প ও কলকারখানায় তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম দক্ষ এবং কম পারদর্শী – এমন প্রাচীন প্রচলিত মানসিকতা প্রযুক্তি জগতের কর্মে মহিলাদের নিয়োগের অন্তরায়। যদিও প্রযুক্তি জগতের বিভিন্ন সংস্থায় মহিলাদের পারদর্শিতা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এইচ.এম.টি ঘড়ি তৈরি সংস্থায় অধিকাংশ প্রযুক্তিগত কাজ মহিলারা দক্ষতার সঙ্গে করে – যার ফলে সংস্থাটি প্রতিযোগিতার বাজারে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। ফলস্বরূপ প্রযুক্তিগত কর্মে মহিলাদের নিয়োগ না করার প্রবণতা বিদ্যমান।

৪.৫ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বলা যায় যে জন জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ জরুরী। তাদের অংশগ্রহণ না থাকলে পরিষেবার গুণগত মান সঠিক হয় না। মহিলারা কেবল গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে এরূপ চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তন করার সময় এসেছে। তাদেরকে অবশ্যই সরকারি পরিষেবা ও পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে – মহিলারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারে বলেই সামগ্রিক উন্নয়নের সুন্দর বাতাবরণ তৈরি হয়।

মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতা খুবই জরুরি। তাদের অধিকার, জীবনের গুণগত মান উন্নয়ন, নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা ইত্যাদির জন্য সাক্ষরতার সঙ্গে প্রবহমান শিক্ষা এবং সচেতনতা কর্মসূচি যুক্ত করতে হবে। এখানে বলা দরকার সাক্ষরতা কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণে অন্তরায় এমন বেশ কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ–

- পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অসহযোগী মানসিকতা ও আচরণ।
- চিরাচরিত বা প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার।
- গৃহস্থালীর কাজকর্মের পরে সময়ের অভাব।
- পুনঃপুন গর্ভধারণ
- উপযুক্ত শিশু-যত্ন পরিষেবার অভাব।
- সুসংহত পরিকল্পনার অভাব এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব না দেওয়া।

নারী কল্যাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তাদের সংগঠিত করা এবং কার্যে নিয়োগ করা। প্রক্রিয়াটি রাতারাতি হয় না। মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাপার সময় সাপেক্ষ। মহিলাদের সঙ্গে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সু-সংগঠিত করার প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে। সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা জরুরি। মহিলাদের সংগঠিত করার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে গোষ্ঠী গঠন।

লিঙ্গ সমতার কথা মাথায় রেখে নারী কল্যাণ প্রক্রিয়ায় পুরুষদেরও অংশগ্রহণ করা দরকার। তবে তাদের অন্তর্ভুক্তি যেন আধিপত্যের রূপ না নেয়। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে প্রক্রিয়াটি সহজ হবে। স্থানীয় স্তরে এবং জেলা, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে মহিলারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারে এবং পরিচালকমণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা দেখতে হবে। এর জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের সুযোগ দেওয়া দরকার। অর্থাৎ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ থেকে প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণের সর্বস্তরে মহিলাদের নিযুক্তি এবং অংশীদার হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য আরো কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সর্বপ্রথম, সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস, আচার আচরণ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে লাগাতার সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরী। এবং নিম্নলিখিত উপায়ে তা সম্ভব–

● প্রচারাভিযান ও শিক্ষার মাধ্যমে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে মহিলাদের অধিকার এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যম, মহিলা মণ্ডল এবং স্থানীয় সংগঠনকে কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে নারী ক্ষমতায়নের উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি হবে।

● শহর ও গ্রামের গরিব মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যেমন – জল, জ্বালানী, গো-খাদ্য এবং শিশু-যত্ন পরিষেবার (যা বর্ধিত আকারে আই. সি. ডি. এস. কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভব) সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে।

পরিবার, বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্ট ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে।

● সামাজিক বিপদ এবং কু-প্রথা যেমন – বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারে (বাড়ি, জমি গবাদি পশু, পারিবারিক শিল্প) মহিলাদের বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করতে হবে।

● ১০০ শতাংশ ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি করতে হবে এবং বিদ্যালয়-ছুটদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

● ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচি শুরু করা দরকার।

● মহিলাদের চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে তারা যাতে যথাযথ পারিশ্রমিক পায়, সহজে ঋণ পায়, কাঁচামাল পায় এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির সুযোগ পায় তার জন্য সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়া দরকার।

● সমাজ ও জনজীবনে মহিলারা যাতে যৌন পীড়ন, অত্যাচার, ধর্ষণ ও দেহ ব্যবসার সম্মুখীন না হয় তা দেখতে হবে।

● বিনা ব্যয়ে মহিলাদের জন্য আইনি শিক্ষা ও আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

● রাজনৈতিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে মহিলারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ এবং পঞ্চায়েতের সর্বস্তরে, বিধানসভা ও লোকসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা দরকার।

৪.৬ গৃহীত পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বলা যায় যে শিক্ষা, সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গো যুক্ত হয়ে মহিলাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকেই তাদের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হতে হবে। বলাবাহুল্য, তাদের জীবনের উৎকর্ষতা বা গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। শিক্ষার সঙ্গো দক্ষতাবৃদ্ধি এবং চাকুরিতে নিয়োগের মাধ্যমে তারা যাতে পুরুষদের সমানতালে ও সম-মর্যাদায় বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে তা দেখা দরকার।

মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করেছে। তাদের উন্নয়নের জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ডঃ ফুলরেণু গুহকে চেয়ার-পার্সন করে ১৯৯০ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দেশব্যাপী নারী সংগঠন ও সমাজকর্মীদের নিরন্তর চেষ্টায় এই কমিশন গঠন সম্ভব হয়েছে। মহিলারা যাতে দ্রুত ন্যায় বিচার পায় তার জন্য পারিবারিক আদালত ও বিশেষ আদালত গঠনও গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৭ নারী কল্যাণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং ধারাসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৫(৩) নং ধারায় বৈষম্য দূর করার জন্য মহিলাদের সপক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্যকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাফল্য অর্জনের জন্য কেবলমাত্র সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এই সকল ধারাগুলি বাস্তবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা জরুরী। এর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—

● ১৯৮৩ সালে মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী, আইনজীবী ও সরকারি অফিসারদের নিয়ে ভলান্ট্যারি এক্‌শন বিউরো গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করা, (খ) প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও (গ) ঐসকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

● মানসিক ও আইনী সহায়তা এবং পরামর্শ দানের জন্য নামী বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় এবং শহরে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেন্টার চালু করা হয়েছে।

● লিগ্যাল এইড সার্ভিস বিউরো এবং এড্ভাইজারি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

● বেশ কিছু আইন যেমন–(ক) মেডিক্যাল ট্যারমিনেইশন অব্ প্রেগ্ন্যানসি এক্ট্, (খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, (গ) হিন্দু বিবাহ আইন, (ঘ) পণপ্রথা প্রতিরোধ আইন, (ঙ) হিন্দু এডপ্শন্ এন্ড্ সাসটেন্যান্স এক্ট্ ১৯৫৬, (চ) সাপ্রেশন্ অব্ ইম্মোরাল ট্রাফিক ইন্ উম্যান্ এন্ড্ গার্লস্ এক্ট্, (ছ) মুসলিম বিবাহ আইন ইত্যাদি।

৪.৮ প্রভাব

১৯৭৯ সালের সি. ডব্লিউ. এস. আই. প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা হয়েছে বিগত তিন দশক ধরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগ কেবল মুষ্টিমেয় শহরে, উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মহিলারাই পেয়েছে। মহিলাদের বৃহত্তর অংশই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকুরি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তেমন কোন সুবিধা পায়নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছে। এর পিছনে দ্বি-মুখী কারণ বিদ্যমান। প্রথমত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং পুরুষদের কর্তৃত্ব এবং দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ভুলভ্রান্তি এবং অসাফল্য। ফলস্বরূপ, একবিংশ শতাব্দীতেও মহিলাদের বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর, অধিকার ও ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং চিরাচরিত বা প্রচলিত রীতি-নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মনে রাখতে হবে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নারী ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াই একমাত্র উপায়। বস্তুতপক্ষে, নারী ক্ষমতায়ন হল – পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে বিদ্যমান অত্যাচার, বঞ্চনা, নির্ভরশীলতা, অসহায়তা, বৈষম্য এবং শোষণের হাত থেকে নারীদের মুক্তির পথ।

সাধারণত পরিবারের মধ্যে মহিলাদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকেও খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গৃহস্থালীর কাজকর্মে তাদের সীমাবদ্ধ করে রাখার চেস্টা করা হয় এবং বৃহত্তর জগতে ও সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় না।

২০০১ সালে নারী ক্ষমতায়ন বর্ষ উদ্যাপন করা হয়। কিছুদিন আগে জাতীয়স্তরে নারী ক্ষমতায়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। দেখা যাচ্ছে ঐ সকল প্রচেস্টা ক্ষমতায়নের পক্ষে ফলপ্রসূ হলেও যথেস্ট নয়। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন সমস্যা সমাধানের শেষ কথা হতে পারে না। তার সঠিক প্রয়োগ এবং মহিলারা যাতে আইনের উপকার পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সাংবিধানিক বিধিবন্ধ ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার নারী উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছে। বে-সরকারি সংস্থা ও পঞ্চায়েত প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করছে। এর ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মহিলাদের অবস্থা কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এখনো অনেক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে কেবলমাত্র নারী ক্ষমতায়নের সাংবিধানিক ব্যবস্থা খুব বেশি কার্যকরী হতে পারে। এর জন্য চাই শিক্ষা ও সচেতনতা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ করে মহিলাদের আচরণবিধি পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা মাফিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তাদেরকে সঠিকভাবে প্রভাবিত করতে হবে। সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থা একযোগে কাজ করলে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

উক্ত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, নারী ক্ষমতায়ন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। সঠিক পরিকল্পনা, একযোগে প্রকল্প রূপায়ণ, মানুষের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে এটা সম্ভব। তৃণমূলস্তরের সংস্থা, বে-সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান একযোগে এই কাজ করতে পারে। মহিলাদের সচেতন ও প্রভাবিত করার জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়া, গোষ্ঠী আলোচনা, প্রদর্শনী এবং সফল কর্মসূচি পরিদর্শন করা দরকার। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য পরিস্থিতি অনুসারে এক বা একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে সাফল্য হঠাৎ করে আসে না। সুপরিকল্পিত প্রয়াসের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ সাফল্য অর্জন করা যায়।

৪.৯ নাগরিকদের ভূমিকা

নারী উন্নয়নে নাগরিকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বলাবাহুল্য, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় মহিলা তথা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অবশ্যই দরকার। যদিও এই ধারণার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ হয়েছে। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত পিছিয়ে পড়া মানুষদের ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। মনে রাখতে হবে, যে কোন গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য ঐ গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পকিল্পনা করতে হবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব–

- সক্রিয় অংশগ্রহণ
- নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষতা অর্জন
- সম্পদ সংগ্রহ ও তার সঠিক ব্যবহার
- নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা সংগঠন ইত্যাদি।

বর্তমানে–

- দরিদ্র মহিলাদের সংগঠিত করা
- তাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করা
- এবং অধিকতর পছন্দের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ

ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নজরে আসে।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মহিলাদের নিজস্ব সমস্যা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সংগঠিত করা সম্ভব। গোষ্ঠী গঠন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বে-সরকারি সংস্থা গরীব মহিলাদের সাহায্য করতে পারে। আর অন্যান্য বিষয়গুলি তারা নিজেরা করে নিতে পারবে। বিভিন্ন সংস্থা কেবল সহায়তা করতে পারে মাত্র।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন – ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যেভরা এক দেশ। এই বৈচিত্র্য দেশের সর্বত্র বিদ্যমান। এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের কিছু কিছু অংশে মহিলারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে। একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে তপঃজাতি, তপঃউপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনো পিছিয়ে। এদের কথা ভাবতে হবে। তাছাড়া মহিলাদের জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মহিলারা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এখনো পুরুষদের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। এই অবস্থা উন্নতির জন্য পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলি কার্যকরা করা দরকার। কোন উন্নয়ন সংস্থা একা এই কাজ করতে পারে না। নারী ক্ষমতায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক।

৪.১০ উপসংহার

ভারতবর্ষের মতো একটি দেশ যেখানে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে সেখানে মহিলাদের দুরবস্থা দীর্ঘদিন মেনে নেওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, মহিলাদের সামনে চাকুরির সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে, তারা নতুন নতুন দায়িত্ব নিচ্ছে – যা দীর্ঘদিন পুরুষদের অধিকারে ছিল। মহিলারা এখন বহির্জগতের কাজে যুক্ত হচ্ছে। মূলত তিনটি কারণে তা সম্ভবপর হয়েছে–

- শিক্ষিতা ও দক্ষ মহিলার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে
- দরিদ্র শ্রেণির মহিলারা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সফল হয়েছে
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের নিযুক্তির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

বিভিন্ন সম্মেলন ও ঘোষণা যেমন–

(১) মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার (১৯৫২)

(২) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (১৯৬৬)

(৩) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ - ১৯৭৫

(৪) মহিলাদের সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৭৯)

ইত্যাদিতে জনজীবনে মহিলাদের সমান সুযোগ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষিত দশক (১৯৭৬-৮৫) মহিলাদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল–

(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিশুর যত্ন

(খ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

(গ) ট্রাইসেম্ ও আই.আর.ডি.পি. তে সংরক্ষণ

(ঘ) শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধি

(ঙ) উম্যান ডিভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন গঠন

(চ) বিভিন্ন রাজ্যে উম্যান কমিশন গঠন

(ছ) পারিবারিক আদালত ও পরামর্শদান কেন্দ্র

(জ) পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় আসন সংরক্ষণ

(ঝ) রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ গঠন

(ঞ) বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বাড়াবার সুযোগবৃদ্ধি ইত্যাদি।

তাছাড়া, বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন–

(ক) সমান বেতন প্রদান আইন (১৯৭৬)

(খ) জাতীয় গৃহ নির্মাণ নীতির সর্বস্তরে মহিলাদের যুক্ত করা ইত্যাদি।

মহিলারা নিরক্ষর থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং তা উপলব্ধি করে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন মহিলাদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলে বর্তমানে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে সারা দেশে, গ্রামে ও শহরে হাজার হাজার মহিলা সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর ও প্রবহমান শিক্ষা কর্মসুচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ধারা দেখা গেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিগত দশ বছরে নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রচেষ্টার দরকার। আবার, গ্রামে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। তাই পরিকল্পনার সময় এবং রূপায়ণকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি ভাবতে হবে। গ্রামের মানুষকে সচেতন করার জন্য গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত, সমবায়, মহিলামণ্ডল, যুব সংগঠন, বে-সরকারি সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একযোগে কাজ করা উচিত। স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা ও সংস্থা শনাক্ত করে উপযুক্তভাবে তাদের কাজে লাগালে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হতে পারে। মনে রাখতে হবে – এরূপ সহযোগিতা, একযোগে কাজ করা এবং মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

নারী ক্ষমতায়নের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন। বর্তমানে দেশের সর্বত্র নারী ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসাবে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে। সরকার, পঞ্চায়েত এবং বে-সরকারি সংস্থা এই ধরনের কাজকে প্রাধান্য দিচ্ছে যাতে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন এই কর্মকাণ্ডের ফলে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাস্তবক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা এবং সর্বোপরি তৃণমূলস্তরে নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু গ্রুপের প্রতিটি সদস্যার নিয়মিত জমা ও ঋণ পরিশোধের উপর গ্রুপ দাঁড়িয়ে তাই সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা গ্রুপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গোষ্ঠীতে যোগদানের ফলে সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। যা – পূর্বে কেবলমাত্র আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সম্ভব হত। এটা অনস্বীকার্য যে মহিলাদের অধিক সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য তাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে এবং দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। এই ধরনের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

কাজ করছে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মহিলারা পারস্পরিক উন্নতির জন্য আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

এরূপ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের দেশের মহিলারা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তারাই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী জীবনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বি.আর.মেহেতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে অনেকদিন আগেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের কাছে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ খুব একটা ছিল না। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে ১৯৯৩ সাল থেকে মহিলারা পঞ্চায়েতে এক-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্ব করছে। এবং চেয়ারম্যান পদটি তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এরফলে অনেকেই ব্যক্তিজীবন থেকে জনজীবনের উন্নয়নের কাজে নিজেদের যুক্ত করেছে। তারা এখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের সদস্যা হচ্ছে। যদিও তাদের অনেকেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিবার কিংবা রাজনৈতিক দলের পুরুষ সদস্যরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে-যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অঙ্গ। তা সত্ত্বেও মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সদর্থক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) স্টেটাস অব্ উম্যান ইন্ ইন্ডিয়া - দ্য ন্যাশন্যাল্ কমিটি

(খ) স্ট্রাগল্ অব্ উম্যান্ এট ওয়ার্ক - সুজাতা গোথস্কার (সম্পাদিত)

(গ) স্টেটাস অব্ উম্যান্ এন্ড্ পপুলেশন্ গ্রোথ ইন্ ইন্ডিয়া - কে.পি.সিং

(ঘ) ইন্ডিয়ান উম্যান্ ইন্ এ চেঞ্জিং ইন্ডাসট্রিয়াল সিনারিও - নির্মলা ব্যানার্জী

(ঙ) উম্যান্ এন্ড দ্য ল্য - দ্য লিগ্যাল্ সার্ভিস ক্লিনিক ফর্ উম্যান এন্ড্ চিলড্রেন

(চ) উম্যান্ ইন ইন্ডিয়া - তৃপ্তি দেশাই

(ছ) হিউম্যান্ রাইটস্ - উম্যান্ রাইটস্ - মল্লদি শুভাম্মা

(জ) স্টেটাস এন্ড এম্প্লয়মেন্ট অব্ উম্যান ইন্ ইন্ডিয়া - ইউ.ললিথা দেবী

৪.১২ অনুশীলনী

(১) ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা কেমন - তা বিশ্লেষণ করুন।

(২) নারীর সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগ আলোচনা করুন।

(৩) নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৫ যুব কল্যাণ

গঠন

৫.১ ভূমিকা

৫.২ ভারতবর্ষে যুবকদের জনসংখ্যার চিত্র

৫.৩ যুব কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্প

৫.৪ বে-সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার যুবকল্যাণ কর্মসুচি

৫.৫ যুবকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.৭ অনুশীলনী

৫.১ ভূমিকা

যুবকরা সমাজের সবচেয়ে স্পন্দনশীল ও সৃজনশীল অংশ। যে কোন দেশে বিশেষকরে ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুবকদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে যদি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঞ্চালিত করা যায় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। যুবকদেরও স্বেচ্ছাশ্রম, সহযোগিতা, স্ব-নির্ভরতা এবং সমাজ কল্যাণ ও সার্বিক উন্নয়নের কাজে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তারাই জনগোষ্ঠীর গতিশীলতার প্রতীক। সুতরাং, যুবকদের মধ্যে সচেতনতা এবং ক্ষমতায়ন - শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হবে। যেহেতু ভারত নতুন শতাব্দীতে ধীরে ধীরে উন্নয়নশীল অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় রূপান্তরিত হতে চায় তাই জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতে যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রণী ভারতের দায়িত্বশীল নাগরিক হতে হবে। তাই, দেশের সমস্যা বিশেষকরে যুবকদের সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতন হওয়া দরকার। আমাদের দেশে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেহাল প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তথ্য, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ও বিনোদনের সুযোগের অভাব রয়েছে। শারীরিক ও মানসিক শোষণের সমস্যা, পরিবেশের ক্ষয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বস্তু-জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সমস্যা ইত্যাদি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে নয়, যুবকদেরও অনেকটাই প্রভাবিত করছে। ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যুবকদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া জরুরি।

৫.২ ভারতবর্ষে যুবকদের জনসংখ্যার চিত্র

দেশের জনসংখ্যার সঙ্গো যুবকদের জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। নিম্নে জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হল–

সাল	যুব জনসংখ্যা			সেক্স রেসিও	শতকরা হার		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৭১	৮৫৪৯৯	৮২১৩৮	১৬৭৬৩৭	৯৬১	৩০.১	৩১.১	৩০.৬
১৯৮১	১১৩৪৩৩	১০৭২৩৫	২২০৬৬৯	৯৪৫	৩২.১	৩২.৫	৩২.২
১৯৯১	১৪৬০৩৬	১৩৮৯৬৬	২৮৫০০২	৯৫২	৩৩.১	৩৪.০	৩৩.৬
২০০১	১৮৪২৭৮	১৭১৬৫০	৩৫৫৯২৮	৯৩১	৩৫.২	৩৫.১	৩৫.২
২০০৬	২০৯২০৩	১৯২৩১২	৪০১৫১৫	৯১৯	৩৭.১	৩৬.৪	৩৬.৮
২০১১	২২৫৮৪২	২০৮১৬৬	৪৩৪০০৯	৯২২	৩৭.৩	৩৬.৪	৩৬.৭
২০১৬	২৩১৫৮২	২১৬৪৯৬	৪৪৮০৭৮	৯৩৫	৩৫.৭	৩৫.১	৩৫.৫

জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো জনগোষ্ঠীতে বয়সের বিন্যাসও বদলে যায়। যুবকদের জনসংখ্যা ৩০.৬ শতাংশ (১৯৭১) থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ৩৬.৮ শতাংশতে পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অনুমান করা যায়, পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা কমবে এবং ২০১৬ সালে ৩৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেখা গেছে, মহিলা জনসংখ্যায় যুবতীদের শতকরা হার - পুরুষ জনসংখ্যায় যুবকদের শতকরা হার অপেক্ষা বেশি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের পরে যুবকদের শতকরা হার বাড়ছে। সুতরাং অদূরভবিষ্যতে যেকোন সময় যুবকরাই জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ হবে। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে, ১৯৭১ সালে ১৬৭৬.৪ লক্ষ যুবক ছিল, যা ২০১৬ সালে ৩৫৫৯.৩ লক্ষ হবে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে নারী-পুরুষের অনুপাতে (সেক্স রেসিও) দেখা গেছে নারীর সংখ্যা কম। যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ সালে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অনুপাত ছিল ৯৬১ এবং সমগ্র জনসংখ্যায় ছিল ৯৩০. এই অনুপাত ক্রমশ কমছে এবং ২০০৬ সালে কমে ৯১৯ হতে পারে। তারপর এই অনুপাতের উন্নতি ঘটতে পারে এবং ২০১৬ সালে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯৩৫ ও সমগ্র জনসংখ্যায় ৯৪৭ হতে পারে।

ভারতের ও বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স

মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ভারতে মহিলাদের কম বয়সে বিবাহের ফলে জন্মহার উচ্চ। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের দেশে মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স কম। শহর এলাকায় বিবাহের গড় বয়স (২০.৭) গ্রামীণ এলাকার গড় বয়সের (১৯.১) তুলনায় ১.৬ বছর বেশি। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত একই চিত্র ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের মহিলাদের বিবাহের গড় বয়সের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে কম ছিল (১৮.১ বছর)। বিহারে ১৮.৫ এবং মহারাষ্ট্রে ১৮.৯ ছিল। কেরালাতে সবচেয়ে বেশী (২১.৭ বছর) ছিল। তামিলনাডুতে ২০.৯ এবং পাঞ্জাবে ২০.৮ বছর ছিল।

বয়স ভিত্তিক বা বয়স অনুসারে জন্মহার

প্রজনন সময়ে একজন মহিলা যেকয়টি সন্তানের জন্ম দেয় তা হল সামগ্রিক জন্মহার। আর বয়স অনুসারে জন্মহার - বয়স ভিত্তিক মহিলাদের সন্তান সংখ্যাকে বোঝায়। সামগ্রিক জন্মহার ৫.২ (১৯৭১) থেকে কমে দাঁড়ায় ৩.৫ (১৯৯৫)। এই হ্রাস শহর এবং গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এবং ঐ একই সময়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৪ শতাংশ হ্রাস পায়। তবে ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক জন্মহার সামান্য বৃদ্ধি পায়।

লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক শিক্ষার হার

বয়স	১৯৬১			১৯৮১			১৯৯১		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৫-১৯	৫২.০	২৩.৮	৩৮.৪	৬৬.১	৪৩.৩	৫৫.৪	৭৫.৩	৫৪.৯	৬৫.৮
২০-২৪	৪৯.৮	১৮.২	৩৩.৬	৬৬.৬	৩৭.১	৫২.০	৭১.৫	৪৩.৮	৫৭.৮
২৫-৩৪	৪২.৫	১৩.৯	২৮.৫	৬০.৭	২৮.৯	৪৫.১	৬৪.৭	৩৬.৬	৫০.৮

উৎস রেজিস্ট্রার জেনারেল অব্ ইন্ডিয়া ঃ

শিক্ষা মানুষকে ভালোমন্দ বিচার করতে শেখায়। সাক্ষরতা বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষা জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে সব রাজ্যে মহিলা শিক্ষার হার কম সেখানে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং শিশুমৃত্যুর হার বেশি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায় অর্ধেক ভারতবাসী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ শিক্ষিতা। যুবকদের মধ্যে শিক্ষার হার কম থাকলে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প শিক্ষার ফলে বেকারত্ব বাড়ে এবং যুবকরা অল্প পারিশ্রমিককে অদক্ষ কাজ করতে বাধ্য হয়। এখান থেকে তাদের মনে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি

উচ্চশিক্ষার ফলে দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা বাড়ে। স্নাতক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১.৬ মিলিয়ন (১৯৭১) থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালে ৪.৯ মিলিয়ন হয়। অর্থাৎ প্রায় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। স্নাতকোত্তর, ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক্ এবং পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই ধারা বিদ্যমান।

বেকারত্বের হার

সমস্ত মানুষকে কাজ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সরকারের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ এলাকায় ২ শতাংশ পুরুষ ও ১.৪ শতাংশ মহিলা এবং শহর এলাকায় ৪.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৮.২ শতাংশ মহিলা বেকার ছিল। গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব কম থাকার কারণ অনেকেই কৃষিকাজের সঙ্গো যুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে তারা অর্ধ-বেকার। মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি হ্রাস পায়। এই চিত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ক্রমশ বেশি অংশগ্রহণকে সূচিত করে। শহর এবং গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বেকারত্বের হার কম।

বিভিন্ন শিল্প অনুসারে প্রধান কর্মীদের বিন্যাস

যেহেতু ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর তাই প্রায় ৮১ শতাংশ মহিলা এবং ৬৬ শতাংশ পুরুষ এই কাজের সঙ্গো যুক্ত। এখানে প্রায় ৪৩.৭ শতাংশ পুরুষই কৃষক অর্থাৎ নিজের জমি চাষ করে। আর মহিলাদের ৪৬.১৮ শতাংশ কৃষি শ্রমিক। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পুরুষদের সংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ কমে যায় এবং অন্য ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের সংখ্যা দ্বিতীয় স্তরের কর্মক্ষেত্রে ১ শতাংশ কমে এবং তৃতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যা

দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার চাপ মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে। যেহেতু যুবকরা বেশি করে আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয় তাই তাদের বেশি করে এই চাপ সহ্য করতে হয়। যারা এই পরিস্থিতির সঙ্গো খাপ খাওয়াতে পারে না তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৫ সালে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ৩৬৮২১ যা পুরুষ আত্মহত্যাকারীর সংখ্যার তুলনায় ৭০ শতাংশ কম। পরিবেশের সঙ্গো মহিলাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার অধিকতর ক্ষমতার জন্য হয়তো তাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা কম। কিনউত ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবতীদের মধ্যে এই পার্থক্য খুব বেশি নেই। পণ সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক সমস্যা, প্রণয় ঘটিত সমস্যা এবং নিঃসন্তানের কারণে এই বয়সে অনেকে আত্মহত্যা করে।

৫.৩ সরকারি যুব-কল্যাণ প্রকল্প

আমরা জানি ভারতবর্ষে সমাজ কল্যাণের অঙ্গ হিসাবে যুব কল্যাণের অন্তর্ভুক্তি হাল আমলের ঘটনা। কয়েক বছর আগেও জাতীয় স্তরে সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত কোন সরকারি পরিষেবা ছিল না। বে-সরকারি সংস্থাগুলিও তেমন কোন চেষ্টা করে নি। এমনকি বর্তমানেও অনেক যুবক জীবিকা অর্জনের কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার ফলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া জগৎ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা ছাড়াও তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পায় না। সত্তরের দশকে অন্য দেশের মতো ভারতেও ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি প্রকল্প চালু হয়েছিল। অনেক বেসরকারি সংস্থাও যুবকল্যাণে নিযুক্ত ছিল।

এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল যেমন–

(ক) যুবকদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণ।

(খ) আই. ওয়াই. ওয়াই. এর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কিছু নতুন প্রকল্প চালু।

(গ) যুব উৎসব, হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, নাট্যোৎসব, ফটো প্রদর্শনী, সেমিনার, সচেতনতা, যুব দিবস উদ্‌যাপন।

(ঘ) শিক্ষার জন্য যুবকদের ভ্রমণ বা বিনিময়।

(ঙ) অধিকতর যুবক-যুবতীর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(চ) যুবকদের আইনী সুরক্ষা।

(ছ) বিভিন্ন স্তরে পরামর্শদান পরিষেবা।

(জ) কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় নিয়োগ বা স্ব-নিযুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

(ঝ) যুবকদের সৃজনশীল কাজে যুক্ত করা।

(ঞ) যুব কল্যাণে সরকারি সম্পদের ১০ শতাংশ বরাদ্দ। এবং

(ট) এইভাবে জাতীয় উন্নয়নের সাথে যুবকদের যুক্ত করা।

যুবকরাই যেকোন দেশের প্রকৃত সম্পদ। স্বভাবতই এদের কল্যাণে সরকারের বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারা যদি সৃজনশীল ও প্রগতিশীল হয় তবে দেশেরও অগ্রগতি হবে। যেকোন দেশের যুব কল্যাণ প্রকল্পের দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত - প্রথমতঃ ঐ প্রকল্প যুবকদের বিকাশ ঘটাবে এবং দ্বিতীয়ত, তাদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে জাতীয় যুব নীতি ঠিক করা হয়েছে। যুবকরা যাতে দেশের কাজে লাগতে পারে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার দুটি বিশেষ কর্মসূচি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ-

(১) জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন. এস. এস.),

(২) নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন,

(৩) জন শিক্ষণ সংস্থান,

(৪) ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ আন্দোলন,

(৫) ন্যাশন্যাল্ ক্যাডেট্ কোর্ (এন.সি.সি.),

(৬) রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ইনস্টিটিউট অব্ ইউথ্ ডিভেলপমেনট্,

(৭) স্পোর্টস্ অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (সাই)

(১) জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন.এস.এস.)

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্প। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে-নাতে কিছু কাজ করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে যুক্ত হওয়ার ধারণা পাবে। গান্ধিজীর মতে যুবকরা যাতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে

পারে এবং জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে তার জন্য কিছু সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। জঃ রাধাকৃষ্ণানও ছাত্ররা যাতে স্বেচ্ছায় সমাজসেবার কাজে যুক্ত হতে পারে তার সুপারিশ করেন। ১৯৫৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মুখ্যমন্ত্রীদের লিখিত নির্দেশ দেন যে স্নাতক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই সমাজসেবার কাজে যুক্ত করতে হবে। ড. ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশনও শিক্ষার সাথে সমাজ সেবাকে যুক্ত করার কথা বলে। উপাচার্যগণ ১৯৬৭ সালের সম্মেলনে এই সুপারিশকে স্বাগত জানান। পরিশেষে ১৯৬৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি.কে.আর.ভি. রাও এই প্রকল্প শুরু করেন।

১৯৬৯ সালে প্রায় ৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮০-৮১ সালে সংখ্যাটি বেড়ে ৪.৭৫ লক্ষ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৩.৫২ লক্ষ হয়। বর্তমানে সংখ্যাটি প্রায় ১৫ লক্ষ। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্ররা যে কোন গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যবিধান, টীকাকরণ, সাক্ষরতা, সচেতনতা শিবির, রক্তদান শিবির, রোগী, প্রতিবন্ধী, অনাথ ব্যক্তিদের সাহায্য, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নির্মূল এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং একতার লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- যে এলাকায় তারা কাজ করবে সেই এলাকার পরিস্থিতি ও জনসমষ্টিকে সঠিক ভাবে জানা;
- নিজেদের সমাজের সাপেক্ষে নিজেদের জানা;
- এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমস্যা সমাধানের কাজে সামিল হওয়া;
- তাদের মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা;
- এলাকার জনগণকে কাজে সামিল করার পদ্ধতি শেখানো;
- গোষ্ঠী জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা;
- নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অর্জন;
- আপদ্‌কালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষমতা;
- ব্যক্তি ও এলাকার সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের ব্যবহার।

(২) নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন

নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক স্বতন্ত্র সংস্থা। সমস্ত জেলাতে এর কার্যালয় রয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র নয় এমন যুবকদের জন্য কর্মরত সর্ববৃহৎ সংস্থা হল নেহেরু যুব কেন্দ্র। প্রায় ২ লক্ষ ক্লাব এবং ৮ লক্ষ যুবক এর সাথে যুক্ত। এই সংগঠনের মাধ্যমে মূলত সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রামের উন্নয়নে যুবকদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, এইচ.আই.ভি./এডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, পরিবেশ উন্নয়ন, শিশুর অধিকার, নারী ক্ষমতায়ন, সাক্ষরতা ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বা বিষয় সমুহের উন্নতির জন্য ক্লাবের মাধ্যমে গ্রামে কাজ করা হয়। বর্তমান সময়ে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– চামেলিতে ঘটা ভূমিকম্প, উড়িষ্যায় ঘটা প্রবল ঝড় ইত্যাদির মোকাবিলায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার মতো কাজও তারা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান কেবল একটি সংগঠন নয় যুব আন্দোলনের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

(৩) জন শিক্ষণ সংস্থান

জন শিক্ষণ সংস্থান হল একটি বহুমুখী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র যার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর এবং প্রবহমান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় বেশ কিছু বে-সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি রাজ্য সরকার সরাসরি এই প্রকল্প রূপায়িত করছে। ২০০৬ সালের মার্চ মাসের শেষে দেখা যাচ্ছে মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, পণ্ডিচেরী, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাদে সারা দেশে ১৭২টি জন শিক্ষণ সংস্থান কাজ করছে।

এই সংস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার চাহিদা অনুসারে কর্মসূচি রূপায়ণ
- সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ
- প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি
- নিরক্ষর, নবসাক্ষর ও স্বল্প সাক্ষর মানুষদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য জেলা সাক্ষরতা সমিতিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান
- প্রবহমান শিক্ষার নোডাল কেন্দ্র হিসাবে সংযোজনা সহ প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র তদারকি ও নজরদারীর কাজ
- প্রবহমান শিক্ষার অধীনে নবসাক্ষরদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য রিসোর্স পার্সন বা অনুপ্রেরকদের জন্য প্রশিক্ষণ
- জাতীয় লক্ষ্য পূরণ যেমন – ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কর্মসূচি।

লক্ষ্যদল

- শিল্প শ্রমিক ও পরিবার তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি
- আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ
- নিরক্ষর, নব-সাক্ষর, মহিলা, প্রতিবন্ধী, তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ

কর্মসূচি

মোট চার ধরনের কর্মসূচি আছে

- শিক্ষা সংক্রান্ত

● সাক্ষরতা সম্বন্ধীয়

● বৃত্তিমূলক

● স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন ও পরিচালনা করা

প্রকল্প এলাকা

● শহর বিশেষ করে বস্তি এলাকা

● শিল্পাঞ্চল

● গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া এলাকা

এইভাবে জন শিক্ষণ সংস্থান যুবক যুবতীদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধি, শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধির কাজ গুরুত্ব সহকারে করছে। যার ফলে তাদের সামনে স্বাবলম্বন ও চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ বাড়ছে। সারা দেশে ৬ লক্ষের বেশি যুবক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

(৪) ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ আন্দোলন

যুব কল্যাণের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থা মূলতঃ চরিত্রের গুণগত মান যেমন – আত্মশৃঙ্খলা, স্বাবলম্বন, দেশপ্রেম এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ার ব্যাপারে যত্নবান। এর দুটি শাখা (১) বালকদের জন্য স্কাউটস্ এবং (২) বালিকাদের জন্য গাইডস্। স্কাউটস্ এন্ড্ গাইডসের সঙ্গো যুক্ত প্রত্যেককে তিনটি মন্ত্র বা নিয়ম মেনে চলতে হয়–

(ক) ঈশ্বর এবং দেশের জন্য কর্তব্য করা

(খ) স্কাউটস্ এন্ড্ গাইডসের নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা

(গ) অপরের প্রয়োজনে সাহায্য করা

প্ল্যানিং কমিশনের মতে এই আন্দোলন যেন রাজ্য, স্থানীয় সরকার ও এলাকার জনগোষ্ঠীর সমর্থন পায় তা দেখতে হবে।

(৫) ন্যাশন্যাল্ ক্যাডেট্ কোর্ (এন.সি.সি.)

যুব কল্যাণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সারা দেশে এই প্রকল্প চালু করার জন্য ১৯৪৮ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো এই প্রকল্প চলছে। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে –

১) চরিত্র গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং বালক বালিকাদের মধ্যে সেবার মনোভাবে তৈরি,

২) তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা প্রয়োজনে দেশের সুরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১৩ থেকে ২৬ বছরের যুবকরা এই প্রকল্পে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা নেতৃত্ব বিকাশের এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায়।

(৬) রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ইনস্টিটিউট অব্ ইউথ্ ডিভেলপমেনট্

এই সংস্থা যুব কল্যাণ প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি, নীতি ও রূপায়ণে কৌশল স্থির করার কাজে নিযুক্ত। এখানে, যুব-কল্যাণের কাজে পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রয়োগমুখী গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান এমন একটি মঞ্চ যেখানে যুবকরা তাদের সমস্যা এবং যে বিষয়গুলি তাদের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনা করার সুযোগ পায়।

(৭) স্পোর্টস্ অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (সাই)

দেশের সর্বত্র খেলাধূলার প্রসার ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ) সৃষ্ট একটি সংস্থা। সাই খেলাধূলার মানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন খেলাধূলার উপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। তারা প্রতিভারও অন্বেষণ করে। সাই-এর এই সকল প্রচেষ্টার ফলে এবং সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশান, ভারতীয় হকি এসোশিয়েসান, বি.সি.সি.আই. টেবিল টেনিস, কবাডি এসোশিয়েসন এর উদ্যোগের ফলে দেশে খেলাধূলার মানের কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। খেলোয়াড়রা স্কলারশিপ্ সহ বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে।

যুব কল্যাণের বিভিন্ন প্রকল্প

(১) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব

(২) যুবকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

(৩) যুব হোস্টেল

(১) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব

যুবকদের মধ্যে প্রতিভার বিকাশের উদ্দেশ্যে এরূপ উৎসবের আয়োজন করা হয়। যুবকরা এই উৎসবের মাধ্যমে নিজেদের মানসিক, আবেগঘন, রুচিবোধ সংক্রান্ত সৃজনশীল ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পায়। নাটক আবৃত্তি, বাজনা, বিতর্ক, অঙ্কন, ফটোগ্রাফি, শিল্পকলা, লোকনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। তারপর থেকে নিয়মিত এরূপ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

(২) যুবকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

এরূপ কর্মসূচি শৃঙ্খলা, দক্ষতা অর্জন, ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা, জ্ঞান ও দেশপ্রেম বিকাশে সাহায্য করে। এরূপ ভ্রমণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বা ছাত্র সংস্থা সরাসরি আয়োজন করতে পারে। সঠিকভাবে আবেদন করলে রেলে ভ্রমণের সুবিধা এবং আর্থিক সহায়তাও পাওয়া যায়।

(৩) যুব হোস্টেল

দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু যুব হোস্টেল রয়েছে। যুব হোস্টেল এসোসিয়েশন্ এই হোস্টেলগুলি পরিচালনা করে। নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীতে কেন্দ্রীয় যুব হোস্টেল অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরে যুব হোস্টেল রয়েছে। যুবকদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে উৎসাহ দান এবং তার মাধ্যমে সংহতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরূপ হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪ বে-সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার যুব কল্যাণ প্রকল্প

বে-সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, চেম্বার অব্ কমার্স, শিল্প সংস্থা, লায়নস্ ক্লাব, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি সংস্থা যুব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনেক সংস্থা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তারা গ্রন্থাগার পরিচালনা, জিম বা ব্যায়ামাগার, কোচিং, মিউজিক ট্রেনিং, অঙ্কন, আবৃত্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করে।

বে-সরকারি সংস্থা যুবকদের জন্য সরাসরি শিক্ষা, সাক্ষরতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা শিবির, স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন, অর্থনৈতিক কর্মসূচি, পরামর্শদান এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তাছাড়া অন্ধ, মূক-বধির, বন্দী অপরাধী, যৌন কর্মী ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যও নানান কর্মসূচি রূপায়ণ করে।

শিল্প সংস্থাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় টাটা স্টিল গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষ করে যুবকদের উন্নয়নের কাজে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। টাটা গোষ্ঠী জামসেদপুরে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিভাবান যুবকরা ফুটবলের প্রশিক্ষণ পায়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকে দেশের নামী ক্লাবগুলিতে খেলছে।

চেম্বার অব্ কমার্সও যুবকদের উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মেড্রাস মানেজমেন্ট এসোশিয়েশন্ ম্যানেজারদের জন্য প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, প্রকল্প তৈরি, যুব নেতৃত্ব, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দিল্লীতে অবস্থিত পি.এইচ.ডি. চেম্বার অব্ কমার্স সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান যুবকদের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছে।

এইভাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেশ কিছু অন্যান্য সংস্থা যুবক যুবতীদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত।

৫.৫ যুবকল্যাণে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

যুব কল্যাণের কাজে সমাজ কর্মীরা নিম্নলিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে –

- যুবকদের নিজস্ব সংগঠন গড়া এবং তার মাধ্যমে যুবকদের ও এলাকার উন্নয়ন,
- যুবকদের সমস্যা নিরূপণ এবং তার সমাধানের পথ তৈরি,
- সাক্ষরতা ও প্রবহমান কর্মসূচি রূপায়ণ,
- জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি রূপায়ণ,
- পরামর্শদান,
- দক্ষতাবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত সংস্থা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান,
- পরিস্থিতির প্রয়োজনে উপদেশ প্রদান,
- ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাতে যুবকদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ডিভেলপিং ইউথ্ ওয়ার্ক – মার্ক স্মিথ

(২) ন্যাশন্যাল্ সার্ভিস স্কীম্ ম্যানিউয়্যাল্ – মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

(৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ইউথ্ কন্‌ভেন্‌শন্ সুভেনিয়ার

(৪) প্রিন্সিপ্‌লস্ এন্ড্ প্র্যাকটিস্ অব ইউথ ইন ডিভেলপমেন্ট ওয়ার্ক – কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট

(৫) এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ সোস্যাল্ ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া – সমাজ কল্যাণ দপ্তর, ভারত সরকার

৫.৭ অনুশীলনী

(১) সরকারি যুবনীতির মূল বিষয়গুলি কী কী? এই নীতি কারা কার্যকরী করছেন?

(২) যুব কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পগুলি আলোচনা করুন।

(৩) যুব কল্যাণে বে-সরকারি সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(৪) যুব কল্যাণে সমাজকর্মীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৬ অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

গঠন

৬.১ আদিবাসী কল্যাণ

৬.১.১ ভূমিকা

৬.১.২ ধারণা/সংজ্ঞা

৬.১.৩ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য

৬.১.৪ মূল সমস্যা

৬.১.৫ আদিবাসী কল্যাণে সরকারি প্রকল্প

৬.২ তপশিলি জাতির কল্যাণ

৬.২.১ ধারণা

৬.২.২ জনসংখ্যার চিত্র

৬.২.৩ তপশিলি জাতির সমস্যা

৬.২.৪ তপশিলি জাতি কল্যাণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রকল্প

৬.২.৫ দলিত আন্দোলন

৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

৬.৪ মন্তব্য / মতামত

৬.৪.১ তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির পরিবর্তন

৬.৪.২ বে-সরকারি সংস্থা ও সমাজকর্মীদের ভূমিকা

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৬.৬ অনুশীলনী

৬.১ আদিবাসী কল্যাণ

ভারত সহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। তাদের জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে বৈদিক এমন কি প্রাক্ বৈদিক সময় থেকে তারা আছে। রামায়ণেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে

এদের সংখ্যা বা বিন্যাস বিভিন্ন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীরে এদের সংখ্যা নগণ্য। আবার ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল এবং গুজরাটের মতো রাজ্যে এদের সংখ্যা খুব বেশি। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় এদের বিন্যাস আবার একই রকম নয়। কোথাও খুব বেশি আবার কোথাও খুব কম। কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত অভ্যাস, রীতিনীতি মেনে চলে আবার কিছু সম্প্রদায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তা সত্ত্বেও আদিবাসীরা ভাষা, সংস্কৃতি ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাসের দিক থেকে স্বতন্ত্র।

৬.১.২ ধারণা / সংজ্ঞা

নৃতত্ববিদরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি প্রয়োগ করে। আদিবাসী হল সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠী যাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। তারাই প্রকৃতপক্ষে আদি বাসিন্দা। তাদের প্রায় 'আদিম' জনগোষ্ঠী, 'সরল' জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয়। হোবেলের মতে 'আদিবাসী' হল এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এরা রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত হওয়া কোন গোষ্ঠী নয়। পেডিংটনের মতে আদিবাসী হল এমন জন সম্প্রদায় যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু 'আদিবাসী' শব্দটির নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। সেই জন্য তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে পরিচিত। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

- সম্পদের দিক থেকে তারা খুবই গরীব
- বিচ্ছিন্ন এলাকা বিশেষ করে পাহাড়-জঙ্গালে বসবাস করে
- নিজস্ব ভাষা রয়েছে
- সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আচ্ছাদিত (ছাউনিযুক্ত) বাড়ি
- বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে
- স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে ভালোবাসে
- নিজস্ব রীতি-নীতি বা নিয়ম কানুন রয়েছে
- নিজস্ব গোষ্ঠীর প্রতি গভীর অনুরাগ এবং চিরাচরিত নেতৃত্বের উপর আস্থা রয়েছে
- কুকুর সহ অন্যান্য পশুপাখি লালন পালন করতে ভালোবাসে
- একতা রয়েছে
- এরা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী
- নিজস্বতা রয়েছে

৬.১.৩ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে বেশ কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল –

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
০১.	চেঞ্চু	অন্ধ্রপ্রদেশ	খর্বাকৃতি, খুব কালো চামড়া, কোঁকড়ানো চুল, চওড়া মুখমণ্ডল, চ্যাপ্টা নাক, একক পরিবার, ছেলে বা মেয়ে নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন ব্যাপার নেই, মহিলাদের উপর অত্যাচার বা বল প্রয়োগ অনৈতিক, পূর্বে তারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত, অন্যান্য আদিবাসী থেকে স্বতন্ত্র।
০২.	আপা তানিস, টোডাস্	অরুণাচল প্রদেশ	বড় বড় ঘন বসতি গ্রাম, কৃষি মূল জীবিকা, প্রতিটি জমি যত্ন সহকারে ব্যবহার করে, ধানই প্রধান শস্য, বাজরা, ভুট্টা, আলু এবং সব্জি চাষও করে, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, পুরোহিত প্রথা বিদ্যমান জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।
০৩.	টোডাস্ কোটাস	তামিলনাডুর নীলগিরি পর্বত	বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস, স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহ প্রথা, এমন কি শ্বশুরের ছোট ছেলে যে পরে জন্মেছে সেও বড়ভাই এর স্ত্রীর স্বামী হতে পারে, ক্রস-কাজ্নদের মধ্যে বিবাহ, ব্যভিচার নিষেধ, সোরোরিটি প্রথা।
০৪.	নিশি	অরুণাচল প্রদেশ	'বন্য মানুষ' বলে পরিচিত, ৪০ হাজারের বেশি জনসংখ্যা, নিরাপত্তার কারণে একটি বাড়িতে অনেক পরিবারের বসবাস, জঙ্গাল পুড়িয়ে চাষবাস (স্লেস এন্ড্ বার্ণ), ঝুম, প্রথায় চাষ, লাঙ্গালের ব্যবহার নেই, বাল্য বিবাহ, বহু-বিবাহ, সভা করে শান্তি বজায় রাখা।
০৫.	আবর	অরুণাচল প্রদেশ	বিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তা, প্রেম করে বিবাহ একমাত্র পদ্ধতি।

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
০৬.	মোনপাস্	অরুণাচল প্রদেশ	বৌদ্ধ - প্রায় ৩০ হাজার জনসংখ্যা, ভুটান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, পাহাড়ের উচ্চ এলাকায় বসবাসকারী, বার্লি এবং গম মূল শস্য।
০৭.	খোভাস্	অরুণাচল প্রদেশ	ছোট্ট গোষ্ঠী, অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গো বিবাহ হয় না, বহু দেব-দেবীর পূজা, স্লেস এন্ড বার্ণ পদ্ধতিতে চাষ।
০৮.	চাকেসাং আও, সেমা	নাগাল্যান্ড	প্রত্যেকের মধ্যে কিছু শ্রেণি আছে, একই শ্রেণির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, মামার মেয়ের সঙ্গো বিবাহ চলতে পারে, একই গ্রামে বিবাহ, প্রেম ঘটিত বিবাহ নিষিদ্ধ।
০৯.	পুচুরী, আঙ্গামী	নাগাল্যান্ড	পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ঝুম প্রথায় চাষ।
১০.	লোথা চেং	নাগাল্যান্ড	নানা রঙের পোশাক, চাষের সময় এবং ফসল তোলার সময় নাগা নৃত্য, ধান, কলা, কমলা লেবু, পেয়ারা, সোয়াবীন, ওল, লঙ্কা, বেগুন চাষ, মহিলারা তাঁত, উলবোনা, চাষবাস এবং গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত, পুরুষেরা বাঁশ ও কাঠের কাজ, কামারের কাজ, চাষবাস করে।
১১.	সাঁওতাল	পশ্চিমবঙ্গা, বিহার, ঝাড়খন্ড	একতা, নাচ-গান প্রিয়, শিকার অবশ্যই করতে হবে, দেশী মদের ব্যবহার, অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৎ, পরিশ্রমী।
১২.	লোধা	পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গা, ঝাড়খণ্ড	সম্পূর্ণ আলাদা থাকে, ব্রিটিশরা ক্রিমিন্যাল ট্রাইব হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, ভূমিহীন, বর্তমানে কাজের সন্ধানে অন্য গ্রামে যাচ্ছে, তাদের সততার ব্যাপারে এখনো মানুষের সন্দেহ রয়েছে।
১৩.	বাঞ্জারা	অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র,	যাযাবর জাতি, স্থায়ী অর্থনীতি নেই এবং স্থায়ী সম্পত্তি নেই, কিছু হস্তশিল্পে পারদর্শী।
১৪.	গারো	মেঘালয়, আসাম	আসামের আদিবাসীদের ৬৬ শতাংশ। মেঘালয়েও এদের সংখ্যা অনেক, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ম্যারেজ বাই ক্যাপচার, বিয়ের পূর্বে একত্রে বসবাস

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
			এবং পরবর্তীকালে পলায়ন ও বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা, তাঁত, পোল্ট্রি, পশুপালন, ধান ও ভুট্টা চাষ, শুকনো মাছ, প্রায় সমস্ত পশু-পাখির মাংস, ভাত এবং রাইস্ বিয়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৫.	খাসা	উত্তরাঞ্চলের দেরাদুন, নীলগিরি পর্বত	লেভিয়েট প্রথা, বড়ভাই পরিচালনা করে, বিবাহের বাইরেও সম্পর্ক অনুমোদিত, পুরুষদের তুলনায় মহিলার সংখ্যা খুবই কম।
১৬.	নায়েক	হিমালয় সংলগ্ন	বিবাহ সংক্রান্ত কোন প্রথা নেই, মুক্ত যৌন মিলন, পণপ্রথা, মহিলাদের আয়ের উপর পুরুষরা নির্ভরশীল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক।
১৭.	নাইরস্		মহিলাদের বহুবিবাহ, ক্রস-কাজ্ন ম্যারেজ, পিতার মর্যাদা কম, মেয়েরা প্রাপ্তবয়স হলে অনুষ্ঠান করে ভোজন বিবাহিত জীবনের বন্ধন গভীর নয়।
১৮.	আহম্	আসাম	স্ত্রী বিনিময়
১৯.	ওয়ানচু	অরুণাচল প্রদেশ	নাগাল্যান্ড্ থেকে অনুপ্রবেশ, আসামের সমতলে বসবাসকারীদের সঙ্গো নিবিড় ব্যবসায়িক সম্পর্ক।
২০.	মিইটি	মণিপুর	মণিপুরের আদিবাসীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ, নৃত্যপ্রিয়, পৃথক ভাষা।
২১.	কোন্ডা, রেডিস	অন্ধ্রপ্রদেশ	পাহাড়ে বসবাস, ৪৩০০০ হাজার জনসংখ্যা, ঝুম প্রথায় চাষ, ভুট্টা ও বজরা চাষ।
২২.	গন্ড, মারিয়া গন্ড, হিল মারিয়া	মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা এবং ছত্রিশগড়	৪০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা, বলদ ও লাঙ্গালের ব্যবহার, অনেকে রোটেশান পদ্ধতিতে চাষ করে, প্রধানই অভিভাবক, এক বিশেষ দেবীর পূজা (পার্সা পেন)।
২৩.	সবর	অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গা, ঝাড়খণ্ড	পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গালে বাস করে। পাঁচ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা। লম্বা রাস্তার ধারে মুখোমুখি বাড়ি, স্লেস এন্ড্ বার্ণ পদ্ধতিতে চাষ, ধান ও অন্যান্য ফসল ফলায়।

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২৪.	সেদ্রুকপেন	অরুণাচল প্রদেশ	খুবই ছোট গোষ্ঠী, মাত্র দুটি এলাকায় বসবাস করে, আসামের সমতলে বসবাসকারীদের সঙ্গো ব্যবসায়িক সম্পর্ক, দু-ধরনের ধর্মাচরণ-প্রাচীন-চিরাচরিত এবং বৌদ্ধ স্থানান্তরিত এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চাষ।
২৫.	খাসি	আসামের পার্বত্য এলাকা, মেঘালয়	মাতৃতান্ত্রিক, রাস্তার দু-ধারে ঘর, মেয়েরা স্বামী নির্বাচন করে, বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, বিধবা বিবাহ অনুমোদিত, ভাত, শূকরের মাংস, গো-মাংস, শুকনো মাছ খুবই জনপ্রিয়, চাষবাস (ঝুম), পশুপালন, মৌমাছি পালন, বাঁশ ও বেতের কাজই প্রধান পেশা।
২৬.	বোরো	আসাম	আসামের জনসংখ্যার অনেকটাই বোরো জনগোষ্ঠী, ভিলেজ কাউন্সিল আছে, প্রধান ব্যক্তি গাঁ-বুড়া নামে পরিচিত, পিতৃতান্ত্রিক, যৌথ পরিবার, পাঁচ প্রকার বিবাহ রীতি – পণ নেই, বিবাহ বিচ্ছেদ খুব একটা দেখা যায় না। কৃষি, পশুপালন এবং বাঁশের কাজই মানুষের প্রধান পেশা।
২৭.	কারবি	আসাম	পিতৃতান্ত্রিক ভিলেজ কাউন্সিল, কৃষি প্রধান পেশা, প্রধানতঃ একবার বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত, ক্রস-কাজ্ন ম্যারেজ পছন্দ, ছোট্ট গ্রাম, খাদি শিল্প।
২৮.	কোন্ধা	উড়িষ্যা	বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তিনটি ভাগ রয়েছে, যুবকদের জন্য একত্রে বাসস্থান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, প্রচলিত কৃষি, পশুপালন এবং জঙ্গাল থেকে খাদ্য সংগ্রহ।
২৯.	ওরাঁও	উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড	ছেলেদের জন্য জনক্ষেপা এবং মেয়েদের জন্য প্লেডাপা বাসস্থান, কম বয়সে বিবাহ, ছোট ছোট বাড়ি, ভাত, বাজরা, ডাল প্রধান খাদ্য, স্থায়ী এবং স্থানান্তরিত দু-ভাবেই চাষ।

তাছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে যেমন–

- অন্ধ্রপ্রদেশের - কয়য়া
- মধ্যপ্রদেশ - বিসন্ হোরঁ মারিয়া
- ঝাড়খণ্ডে - মুন্ডা
- ত্রিপুরায় - চাকমা
- অরুণাচলে - আপাতানি
- নাগাল্যান্ডে - নাগা
- ঝাড়খন্ডে - বীরহোড়
- বিহার এবং ঝাড়খন্ডে - হো
- মিজোরামে - মিজো
- অরুণাচলে - আকাশ

ইত্যাদি।

জনসংখ্যার চিত্র

২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে আদিবাসী জনসংখ্যা ৮,৪৩,২৬০০০ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.২০ শতাংশ। তারা দেশের ১৫ শতাংশ জমিতে বসবাস করে। নিম্নলিখিত রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে তপঃউপজাতি মানুষের সংখ্যা অধিক–

১)	লাক্ষাদ্বীপ	৯৪.৫১%
২)	মিজোরাম	৯৪.৪৬%
৩)	নাগাল্যান্ড	৮৯.১৫%
৪)	মেঘালয়	৮৫.৯৪%
৫)	অরুণাচল প্রদেশ	৬৪.২২%
৬)	দাদরা নগর হাভেলি	৬২.২৪%

অন্যান্য কিছু রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলেও আদিবাসী জনসংখ্যা বেশি। মনিপুরে ৩৪.২০ শতাংশ, ত্রিপুরায় ৩১.৫, ছত্রিশগড়ে ৩১.৭৬, ঝাড়খন্ডে ২৬.৩০, উড়িষ্যায় ২২.১৩ এবং মধ্যপ্রদেশে ২০.২৭ শতাংশ। আবার পন্ডিচেরী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, চন্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম। ঐ সকল রাজ্যে মাত্র ০ থেকে ১.১৪ শতাংশ আদিবাসী। পশ্চিমবঙ্গে ৫.৫০ শতাংশ আদিবাসী।

৬.১.৪ মূল সমস্যা

আদিবাসীরা সর্বদা অনুন্নত সম্প্রদায় বলে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের মূল সমস্যাগুলি নিম্নরূপ –

(১) শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

শত শত বছর ধরে বিভিন্ন শক্তি আমাদের দেশকে শাসন করেছে। তারা শিক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে যত্নবান ছিল না। বিশেষ করে আদিবাসীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশরা মিশনারীদের সহায়তায় কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এর সুবিধা পায়। ফলস্বরূপ, তাদের বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর থেকে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি ঘটে। আদিবাসী এলাকায় স্কুল স্থাপন করা হয়, সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করা হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, বৃত্তি ইত্যাদি চালু করা হয়। এই সব পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু, বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে দেশের নিরক্ষর এবং স্কুল-ছুটদের অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। অপ্রতুল পরিকাঠামো, মানসিকতার অভাব, তাদের মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা না থাকা, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ইত্যাদির ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না।

(২) অর্থনৈতিক সমস্যা

অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে। শত শত বছর ধরে তারা এরূপ সমস্যায় ভুগছে। এর প্রতিফলন ঘটে তাদের বসতবাড়ি, পোশাক, খাদ্য এবং সম্পত্তিতে। ভারতে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীর ৬৩ শতাংশ আদিবাসী। স্থানান্তরিত ও ঝুম প্রথায় চাষই তাদের মূল পেশা। তারা শিকার, খাদ্য সংগ্রহ এবং দিন মজুর হিসাবেও কাজ করে। বর্তমানে অনেকে দিনমজুরের কাজ করছে। তাদের আর্থিক অবস্থা কখনই সচ্ছল নয়। তাদের সম্পত্তি বলে তেমন কিছুই নেই।

(৩) যোগাযোগের সমস্যা

আদিবাসীরা সাধারণত পাহাড়-জঙ্গালে বসবাস করে। ঐ সব জনবসতি প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। ফলে মূল এলাকার সঙ্গো যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। রেডিও, টিভি, খবর কাগজও তারা পায় না। ফলে বৃহৎ জগৎ সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ।

(৪) স্বাস্থ্য সমস্যা

আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। শিশুরা অপুষ্টি এবং চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন রোগের শিকার। অধিকাংশ মহিলা প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন। টি.বি. এবং ম্যালেরিয়া প্রায় দেখা যায়। যেহেতু তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না তাই তাদের মধ্যে অধিক শিশুমৃত্যু, স্বল্প আয়ু, বিভিন্ন রোগ পরিলক্ষিত হয়। হাতুড়ে চিকিৎসক বা 'জান বুড়া' থাকার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো সহজসাধ্য হচ্ছে না।

(৫) মাদকশক্তির সমস্যা

আদিবাসীদের জীবন দেশী মদের সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত নয়। নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি মদ পান করা তাদের চিরাচরিত প্রথা ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গো যুক্ত। যা নেশা ও অস্বাস্থ্যের কারণ। বস্তুতপক্ষে মাদকাশক্তি তাদের আয়ু কমিয়ে দেয়।

(৬) সচেতনতার অভাব

বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, নিরক্ষরতা এবং রেডিও-টিভি-খবর কাগজের সুযোগ না থাকায় আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে নানান ধরনের কুসংস্কার, প্রথা, ওঝা-গুনিন নির্ভর চিকিৎসা, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, পশুপালন, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার মানসিকতার অভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সচেতনতা যে কোন সমাজের শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শক্তির অভাব রয়েছে। এমন কি অনেকে তাদের সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন নয়।

(৭) শোষণ

সমাজের মূলস্রোতের সাথে যুক্ত মানুষরা আদিবাসীদের শোষণ করে। তারা দিন-মজুর হিসাবে কাজ করলে তাদের সঠিক মজুরি দেওয়া হয় না। তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করলে দোকানদার বা ব্যবসায়ী কম পয়সা দেয়। যেহেতু তারা নিরক্ষর এবং অজ্ঞ তাই মানুষ তাদের সহজেই শোষণ করে। ফলে শত শত বছর ধরে আদিবাসীরা শোষণের শিকার।

(৮) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা

আদিবাসীরা চিরাচরিতভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তারা জীবিকার জন্য জঙ্গাল ও বনজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। এখন দিনের পর দিন জঙ্গাল এলাকা কমছে। এর জন্য আদিবাসীরাও কিছুটা দায়ী। তারা কাঠ বিক্রি করে এবং চাষের জমির জন্য জঙ্গালে আগুন ধরিয়ে দেয়। যা তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের চাষবাসও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু বৃষ্টি অনিয়মিত, তাই উৎপাদনও অনিশ্চিত। এইভাবে প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরশীলতা তাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৯) মৌলিক সুযোগ সুবিধার অভাব

অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কিছু মৌলিক বিষয় যেমন – বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন। আদিবাসীরা এ সব থেকে বঞ্চিত। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের সুযোগের অভাব রয়েছে। এরূপ মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার অভাব তাদেরকে আরো পশ্চাদপদ্ করে রেখেছে।

(১০) স্বীকৃতির অভাব

আদিবাসীরা অন্যদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তারা তাদের নিজস্ব এলাকায়, নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। এমন কি অনেক জায়গায় স্কুলে তারা আলাদা বেঞ্চে বসে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থাগুলির নানান প্রচেষ্টার ফলে তাদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনো অনেক কিছু করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সমাজকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.৫ আদিবাসী কল্যাণে সরকারি প্রকল্প

আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি পদক্ষেপ এখানে দেওয়া হল–

(১) ১৯৯০ সালের জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

(২) অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের প্রোটেকশান অব্ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট সংশোধন করা হয় ১৯৭৬ সালে।

(৩) সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়নের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটি অব্ পার্লামেন্ট গঠন করা হয়েছিল।

(৪) ১৯৮৯ সালে তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি মানুষদের বিরুদ্ধে অত্যাচার রদ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়।

(৫) আদিবাসী ছাত্রদের মাধ্যমিকোত্তর পড়াশুনার জন্য স্কলারশিপ্।

(৬) আশ্রম স্কুল প্রকল্প।

(৭) আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল।

(৮) যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কম সেইসব স্থানে ১৯৯৩-৯৪ সালে আদিবাসী বালিকাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়। এরূপ ৮টি রাজ্যে অবস্থিত ৪৮টি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা শনাক্ত করে কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে যেখানে আদিবাসী মহিলা শিক্ষার হার ১০ শতাংশের মধ্যে এরূপ ১৪টি রাজ্যের ১৩৬টি জেলায় কর্মসূচিটি চালু আছে।

(৯) আদিবাসী যুবকরা যাতে স্ব-নির্ভর হতে পারে, ব্যবসা করতে পারে বা চাকুরি পেতে পারে তার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে। ২০০৩-০৪ সালে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ২০০টি এরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১০) বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় গ্রামীণ শস্য গোলা স্থাপন করার প্রকল্প চালু হয়েছে। ট্রাইব্যাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেল্যাপমেন্ট ফেডারেশান অব ইন্ডিয়া এর জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে অর্থ প্রদান করে।

(১১) ভারত সরকার আদিবাসীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়, হোস্টেল, চিকিৎসা কেন্দ্র, লাইব্রেরী, বালওয়ার্ডি কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য বে-সরকারি সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

(১২) ট্রাইব্যাল ডেভেল্যাপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশান, ফরেস্ট ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশান, মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্ট ফেডারেশান মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্ট সংগ্রহ, বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ অর্থ পায়।

(১৩) আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৯৯ সালে পৃথক আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

(১৪) ২০০১ সালে ন্যাশন্যাল সিডিউলড্ ট্রাইবস ফিনান্স ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশনে গঠন করা হয়। ভারত সরকারের অধীনস্থ এই সংস্থার অংশীদারত্ব প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

৬.২ তপশিলি জাতি কল্যাণ

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় তপশিলি জাতি সম্বন্ধে বলা আছে। তারা অনগ্রসর বলে সংবিধানে তাদের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। দেশের প্রায় সর্বত্র তপশিলি জাতির মানুষ বাস করে। এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। তাদের উন্নতির জন্য সরকার ও বে-সরকারি সংস্থা বেশ খিচু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে তপসিলি জাতির ধারণা, তাদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করা হল।

৬.২.১ ধারণা

অনগ্রসর শ্রেণি বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়েপড়া শ্রেণির মানুষকে বোঝায়। বিশেষ করে বললে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির মানুষরাই অনগ্রসর। তাছাড়া আরো এক ধরনের মানুষ আছেন যারা পিছিয়ে। তাদেরকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির সঠিক সংজ্ঞা নেই। এমনকি ১৯৫৩ সালে গঠিত এই সংক্রান্ত কমিশনও পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। বস্তুতপক্ষে নানান কারণে এই শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। যদিও নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় –

(ক) জাতিভেদ প্রথার স্তরবিন্যাস অনুসারে নিম্ন স্তরে অবস্থিত।

(খ) শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর।

(গ) সরকারি চাকুরিতে খুবই কম নিয়োগ।

(ঘ) ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে কম প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যারা শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে, সচেতন নয়, দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতার শিকার, ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন, মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এমন মানুষরাই অনগ্রসর শ্রেণি বলে পরিচিত।

৬.২.২ জনসংখ্যার চিত্র

কোন রাজ্যেই এরা অধিক সংখ্যায় নেই। তারা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬.২০ শতাংশ এবং আদিবাসী জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পাঞ্জাবে ২৮.৮৫, হিমাচল প্রদেশে ২৪.৭২, পশ্চিমবঙ্গো ২৩.৯২, উত্তরপ্রদেশে ২১.১৫, তামিলনাড়ুতে ১৯, উত্তরাঞ্চলে ১৭.৮৭, চণ্ডীগড়ে ১৭.৫০, রাজস্থানে ১৭.১৬, ত্রিপুরায় ১৭.৩৭, উড়িষ্যায় ১৬.৫৩, দিল্লীতে ১৬.৯২, কর্নাটকে ১৬.২০, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬.১৯, পন্ডিচেরীতে ১৬.১৯, বিহারে ১৫.৭২ এবং মধ্যপ্রদেশ ১৫.১৭ শতাংশ। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে এদের জনসংখ্যা খুবই কম যেমন– অরুণাচল প্রদেশে ০.৫৬, মেঘালয়ে ০.৪৮, গোয়াতে ১.৭৭, দাদরা ও নগর হাভেলিতে ১.৮৬,

দমন ও দিউতে ৩.০৬, মণিপুরে ২.৭৭ এবং সিকিমে ৫.০২ শতাংশ। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তপঃ জাতির মানুষ বাস করে না।

৬.২.৩ তপঃশিলি জাতির সমস্যা

তপঃশিলি উপজাতির সমস্যার সঙ্গে তপঃশিলি জাতির মানুষের সমস্যার অনেকটা মিল রয়েছে। এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এদের ভর্তির হার কম। অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান। একই গ্রামে বসবাস করলেও অন্যান্য জাতি থেকে সাধারণত দূরত্বে এরা বসবাস করে। এখনো দেশের অনেক গ্রাম আছে যেখানে তপঃজাতির মানুষরা নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে পারে না। পুকুরের ক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা ঘাট থাকে। বেকারত্ব খুবই প্রকট। যেহেতু তারা দক্ষ নয় তাই কাজের সুযোগ কম। চাষের ক্ষেত্রে কয়েকমাস ছাড়া আর কাজ পায় না। তারা শোষণের শিকার। ফলস্বরূপ তারা চরম দারিদ্রের শিকার। যার ভয়াবহ প্রভাব দেখা যায় তাদের বসবাসের গৃহে, খাদ্যাভ্যাসে, স্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায়। তারা অপুষ্টির শিকার। তাদের মধ্যে অনেক শিশুশ্রমিক রয়েছে। খোলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। সামাজিক পদমর্যাদায় নিম্নস্থানে। মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিশুমৃত্যুর হার অধিক। সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেকে আবার মাদকাশক্ত।

৬.২.৪. তপঃশিলি জাতির কল্যাণে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রকল্প

তপঃজাতি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হল–

(১) তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির সুরক্ষা, সমস্যা অনুধাবন, পরিকল্পনায় সাহায্য, সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য ন্যাশন্যাল কমিশন গঠন করা হয়েছে।

(২) ঝাড়ুদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ন্যাশন্যাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারী গঠন করা হয়েছে।

(৩) অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে প্রোটেকশান অব্ সিভিল রাইটস এক্ট্ চালু করা হয়েছে।

(৪) সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার রূপায়ণের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য প্যার্লামেন্টারী কমিটি বিভিন্ন সময়ে গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি নামে পরিচিত।

(৫) এদের বিরুদ্ধে অত্যাচার কমিয়ে আনার জন্য ১৯৮৯ সালে সিডিউলড্ কাস্ট ও সিডিউলড ট্রাইবস এক্ট্ চালু হয়েছে।

(৬) ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলি মাধ্যমিক ও পরবর্তী স্তরে শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ্ চালু করেছে।

(৭) কোচিং এবং ঐ সংক্রান্ত প্রকল্প চালু হয়েছে যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

(৮) আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের মেধা তথা সার্বিক বিকাশের চেষ্টা করা হয়।

(৯) তপঃ জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকারী ছাত্র-ছাত্রীরাও এরপ সুযোগ পায়।

(১০) তাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য স্পেশাল সেন্ট্রাল এডিস্ট্যান্স স্কিম চালু হয়েছে।

(১১) ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশান স্থাপন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে লাইব্রেরী, সামাজিক বিষয় অনুধাবনের জন্য পুরস্কার প্রদান এবং সংহতির উপর জোর দেওয়া হয়। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা আছে।

(১২) ১৯৯২ সালে নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রকের অধীনে স্কেভেঞ্জারদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্যও ১০০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

(১৩) ১৯৭৮-৭৯ সালে স্টেট্ সিডিউলড্ কাস্টস ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশন স্কিম চালু হয়েছে যার মাধ্যমে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের সহায়তা করা হয়। ২৬টি অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। ভারত সরকার ৪৯ শতাংশ ও রাজ্য সরকার ৫১ শতাংশ ব্যয় করে।

(১৪) বে-সরকারি সংস্থা যেমন—রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর, পুরী, শিলচর এবং পুরুলিয়া শাখা, হরিজন সেবক সংঘ– দিলি এবং সার্ভেন্টস অব্ সোসাইটি, পুনা ভারত সরকারের সহযোগিতায় তপঃজাতির উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। বর্তমানে ৩৫০টির বেশি বে-সরকারি সংস্থা তপঃজাতির কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করছে।

এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প রয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্যও বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে। তাদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ন্যাশন্যাল্ কমিশন্ ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস গঠন করা হয়। যাদের পরিবারে বাৎসরিক আয় ৪৪,৫০০ টাকার কম তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাক্-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান এবং ঐ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল চালু করার প্রকল্প শুরু করা হয়। ঐ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে চাকুরিতে নিয়োগের সুযোগবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু বে-সরকারি সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

৬.২.৫ দলিত আন্দোলন

অস্পৃশ্যতা অতীতকাল থেকেই রয়েছে। আর্য ও অনার্য (কৃষ্ণাঙ্গ) ভেদাভেদ করা হয়েছে। আর্যরা নিজেদের উচ্চ স্থানাধিকারী বলে মনে করে। বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রে গায়ের রং এবং চুলের রং অনুসারে স্তর বিন্যাস আমরা দেখতে পাই বেদ, পরাশর সংহিতা এবং ঋক্ বেদে। অনার্যরা অসুর বা অমানুষ ফলে পরিচিত।

পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম প্রথা শুরু হয়। চারটি বর্ণ আছে যেমন – (ক) ব্রাহ্মণ, (খ) ক্ষত্রিয়, (গ) বৈশ্য এবং (ঘ) শূদ্র।

শূদ্ররা দলিত বলে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই দলিত শব্দটি নতুন নয়। আপাতভাবে ১৯৩০ সালে মারাঠী ও হিন্দি অনুবাদে দলিত শ্রেণি কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। মিলিন্ড কলেজের মারাঠী অধ্যাপক পরবর্তীকালে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে এরা হল নিম্ন স্তরের মানুষ ফলে পরিচিত, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এবং হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি কথা দুটি ব্যবহার করে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে দলিত এবং অস্পৃশ্যরা অনেক সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ ও সামাজিক দিক দিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করতে পারে না যেমন – মন্দিরে প্রবেশ, কুঁয়ো বা পুকুর ব্যবহার ইত্যাদি। অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে আবার তথাকথিত উচ বর্ণের মানুষ দলিতদের ছায়া মাড়ায় না। সুতরাং দলিত – অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয়ভাবে হতে পারে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দলিতরা বিভিন্ন সময়ে সুপ্রাচীন কাল ধরে চলে আসা বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বর্তমানে দলিত বলতে সমান মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত এক সংগঠিত জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য বিভিন্ন সময় দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। জ্যোতিবা ফুলে, বি. আর. আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যে কোন ধরনের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বি. আর. আম্বেদকর দলিতদের মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জীবনের মান উন্নয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে সংবিধান তৈরিকারী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হিসাবে দলিতদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব ব্যবস্থা দলিতদের এগিয়ে আসতে খুবই সাহায্য করে। ভারতে দলিত আন্দোলনকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায় যেমন –

(১) দূষণ রেখা অতিক্রম করার আন্দোলন (দ্য পল্যুশান লাইন ক্রসিং মুভমেন্ট) সমাজে দলিতদের উপস্থিতি অন্যদের বসবাসের ক্ষেত্রে দূষণ সৃষ্টিকারী বলে পরিগণিত হত। তারা দূষণ রেখার নীচে বসবাস করে বলে ধরা হত। তাদের মান উন্নয়নের জন্য এবং দূষণরেখা অতিক্রমের জন্য বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয় যেমন–

(ক) নাদার আন্দোলন

নাদার কথার অর্থ হল জমির মালিক। তারা তামিলনাড়ুর তপঃজাতি সম্প্রদায়। তাদের পেশা এবং আয় স্থিতিশীল নয়। তাদের বসবাসের স্থান অপরিষ্কার। এই সব কারণে তারা অস্পৃশ্য রূপে পরিচিত ছিল। এই অপমানই তাদেরকে আন্দোলনমুখী করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার তাদের সাহায্য করে। এর ফলে অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা নতুন পেশায় যুক্ত হয়। তাদের একাংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, এবং নতুন জীবন ধারা অনুসরণ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে।

(খ) ইজাহাভাস আন্দোলন

কেরালার অত্যাচারিত শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলন শুরু করে। শ্রী গুরুস্বামী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি এক ঈশ্বর এর ধারণায় নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। মদ ব্যবসার সঙ্গো যুক্ত অনেক মানুষ এই ধর্মের সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল। নতুন ধর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত। পূর্বে তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। এমনকি উচ্চজাতের মানুষ তাদের ছায়া মাড়াত না। এই আন্দোলনের ফলে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি ঘটে।

(গ) জাঠাবাস আন্দোলন

আগ্রা শহরের চামার (জুতো তৈরির সঙ্গো যুক্ত) শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলন শুরু করে। শত শত বছর ধরে তারা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত ছিল। ঐ অপমানের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেছিল এবং নিজেদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পেশায়ও নিজেদের যুক্ত করেছিল।

(ঘ) সংস্কৃতায়ন আন্দোলন

দলিতরা ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত এবং ধুতি পরে এই আন্দোলন করেছিল। তারা যাতে উচ্চ জাতির সম্মান পায় সেইজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করেছিল। তারা ব্রাহ্মণদের মতো নিরামিষভোজী হয়েছিল এবং নমস্কার শব্দটি ব্যবহার করত। ব্রাহ্মণদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া এই আন্দোলন মহারাষ্ট্রের কয়েকটি ছোট এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল।

(২) ধর্মীয় আন্দোলন

তথাকথিত উচ্চজাতি দ্বারা অবমাননা ও আরোপিত সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তারা নতুন ধর্মের জন্য আন্দোলন শুরু করে। সাতনামী এই ধরনের একটি আন্দোলন। ১৮২০ দশকে জানসি দাস এই আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এমন একটি ধর্মের কথা বলেন যেখানে সব মানুষই সমান। এমনকি মিশনারীরাও এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

(৩) দ্য গ্লোরিফায়েড মুভমেন্ট

দলিতদের উপস্থিতিকে সম্মান জানানোর জন্য এই আন্দোলন। দ্রাবিড়িয়ান কাঝাঘাম পার্টি এই আন্দোলন শুরু করে। দলিতরা দ্রাবিড়দের অংশ বলে বুঝতে শুরু করে। ঐ পার্টি পরবর্তীকালে দ্রাবিড়িয়ান মুন্নেত্রা কাঝাঘাম পার্টি নামে পরিচিত হয়। এম. করুণানিধি এবং আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র তামিলনাড়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) আম্বেদকারের বহুমুখী প্রতিবাদী আন্দোলন

দলিতরা যাতে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পায় তার জন্য ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর দলিত আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এমন একটি আদর্শ সমাজ সৃষ্টির কথা ভাবতেন যেখানে জাতিভেদ প্রথা থাকবে না। তাঁর অনেক অনুগামী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গো যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা এখন নব বৌদ্ধ নামে পরিচিত। ডঃ বি. আর.

আম্বেদকর তাদের দলিতদের জন্য লোকসভা, বিধানসভা এবং সরকারি চাকুরিতে আসন সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পুরোহিততন্ত্রের বিরোধিতা করতেন। বস্তুতপক্ষে, ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের প্রচেষ্টার ফলে – স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দলিতদের সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়। ঐ সকল আন্দোলন অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে – তার কারণ তিনি সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও শিক্ষাকে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রণী দলিতদের সাহায্যে নতুন রূপে দলিত আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু সঠিকভাবে সংগঠিত না হওয়ার এবং সরকারি সহযোগিতা না থাকায় ঐ সকল আন্দোলন সফল হতে পারে নি।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে অন্ধ-প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং মিজোরামে সংগঠিত দলিত আন্দোলন ভিন্ন ধরনের। ঐ সব আন্দোলন কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও দলিতরা এখনও শোষিত। অস্পৃশ্যতা এখনো বিদ্যমান। স্বাধীনতার পরেও একই ধারা দেখা যাচ্ছে। এই কারণে অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এখনো দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং বর্তমানে এই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, দলিত আন্দোলন সমাপ্ত করতে হলে দলিতদের জন্য শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে এবং অন্যদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াস এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে।

৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ। ১৯৯২ সাল থেকে পৃথকভাবে এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে–

- ন্যাশন্যাল্ কমিশন্ ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস গঠন।
- প্রাক-মাধ্যমিক্ ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরে বৃত্তি প্রদান।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণে বে-সরকারি সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা।
- ন্যাশন্যাল্ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফিন্যান্স্ এন্ড্ ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন ইত্যাদি।

৬.৪ মন্তব্য / মতামত

৬.৪.১ তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির পরিবর্তন

বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সরকারি প্রচেষ্টার ফলে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল –

(১) তপঃ শিলি উপজাতি, তপঃশিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে। এমন কি মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার ও ভেটারিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সকল শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) সরকারি ও বে-সরকারি জায়গায় গত কয়েক বছরে তাদের নিযুক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) ইন্দিরা আবাস যোজনায় অনেকের গৃহ নির্মাণ হয়েছে।

(৫) ভূমি সংস্কারের জন্য অনেক রাজ্যে ভূমিহীনরা জমির মালিক হয়েছে।

(৬) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুখা মরসুমে তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পাচ্ছে এবং হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

(৮) আদিবাসীরা ক্ষুদ্র বনজ দ্রব্যের মালিকানা পেয়েছে।

(৯) আদিবাসীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

(১০) আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

(১১) ন্যাশন্যাল কমিশন ফর এস.সি এন্ড এস.টি এবং পার্ল্যাম্যান্টারী কমিটি গঠনের ফলে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প রূপায়ণ ত্বরান্বিত হয়েছে।

(১২) লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েতে তাদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পদমর্যাদা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে তপঃউপজাতি, তপঃজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও বহুমুখী সমস্যার গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। উন্নয়নের কাজে ব্রতী সমস্ত সংস্থাকে আরো গভীরভাবে বিষয়টি ভাবতে হবে। বে-সরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তাদের কাজকর্ম আরো সুনির্দিষ্ট হতে হবে। আর সমস্ত ক্ষেত্রে উপভোক্তা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪.২ বে-সরকারি সংস্থা ও সমাজকর্মীদের ভূমিকা

বর্তমানে বে-সরকারি সংস্থা উন্নয়নের অন্যতম কারিগর হিসাবে কাজ করছে। আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে

তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছে। বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ অনেক বে-সরকারি সংস্থা আছে। তারা নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে–

(১) যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা কাজ করা দরকার তা অনুধাবন করা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

(২) উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বে-সরকারি সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

(৩) যদিও সরকারি দপ্তর ও পঞ্চায়েত আদিবাসী উন্নয়নে কাজ করছে তবু অনেক ঘাটতি চোখে পড়ে। বে-সরকারি সংস্থা ঐ ঘাটতি পূরণের কাজ করতে পারে।

(৪) বে-সরকারি সংস্থাগুলি স্থানীয় এলাকার বা তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে যাতে তারা তাদের এলাকা এবং জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৫) মানুষ নিজেদের সমস্যার বিরুদ্ধে যাতে লড়াই করতে পারে তার জন্য বে-সরকারি সংস্থা তাদের পরামর্শ দান করতে পারে।

পেশাগত সমাজকর্মীদেরও আদিবাসী সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জীবন ও জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে আদিবাসীদের উন্নয়নের কাজে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে তা হতে পারে–

(১) জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন বিষয়ে আদিবাসীদের সচেতন করতে পারে।

(২) আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও তদের উন্নয়নের সরকারি নীতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান ও আলোচনা করতে পারে।

(৩) সমাজকর্মীরা আদিবাসীদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করতে পারে যাতে আদিবাসীরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

(৪) সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর, প্রবহমান শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ছুটদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

(৫) আদিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে যাতে তারা চিরচরিত ঝুম বা স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ ছেড়ে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হতে পারে। এইভাবে তাদের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

(৬) আদিবাসী নেতাদের শনাক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের কাজে লাগাতে হবে।

(৭) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।

(৮) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার।

(৯) স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(১০) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের সঠিক যত্নের জন্য টীকাকরণ সহ ঐ ধরনের সমস্ত পরিষেবা যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে তা দেখতে হবে।

(১১) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে তাদের যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(১২) তাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদ চিহ্নিত করার জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন।

(১৩) যুবকরা যাতে তাদের এলাকায় সংগঠন গড়ে উন্নয়নের কাজ করতে পারে তার জন্য আদিবাসী যুবকদের সাহায্য করা দরকার।

(১৪) উন্নয়নমুখী হওয়া এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আদিবাসীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

(১৫) অন্যান্য শ্রেণির মানুষের শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ইন্ডিয়ান সোস্যাল্ প্রবলেম্ (দ্বিতীয় খন্ড) - জি. আর. মদন।

(২) এ রেসপন্সিব্ল গভর্ণমেন্ট্ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

(৩) ইন্ডিয়া ২০০৬ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

৬.৬ অনুশীলনী

(১) আদিবাসী বলতে কি বোঝায়? তারা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করুন।

(২) আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

(৩) ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৪) তপঃশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৭ শ্রম কল্যাণ

গঠন

৭.১ আদিবাসী কল্যাণ

৭.২ শ্রম কল্যাণের ধারণা

৭.৩ শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব

৭.৪ জীবন ধারণের মান, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং শ্রমিকের দক্ষতা

৭.৫ ভারতের শ্রম আইন

৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৭ ট্রেড ইউনিয়ন

৭.৮ শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি

৭.৯ শিশু ও মহিলা শ্রমিক

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১১ অনুশীলনী

৭.১ শ্রম ও শ্রমিকের ধারণা

অর্থের বিনিময়ে যে কোন কাজই হল – শ্রম। 'শ্রম' কথাটি জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং শ্রমিক কথাটি থেকে একে আলাদা করা যায় না। শ্রম সর্বদা নশ্বর একে সংরক্ষণ করা যায় না। অন্যদিকে শ্রমিক হল মানুষ এবং তার সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্ত্বা রয়েছে। সুতরাং শ্রম হল – যে কাজ করা হল, আর শ্রমিক হল – যে ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে কাজটি করল। শ্রমিক হল কর্মী। শ্রম হল তার শরীর ও মনের সমন্বয় সাধনে কৃতকর্ম। যদিও সাধারণত শ্রম শব্দটি কর্ম ও কর্মী উভয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭.২ শ্রম কল্যাণের ধারণা

শ্রম কল্যাণ কথাটির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণে যে কোন ধরনের কর্মসূচি বা কাজকর্মকে বোঝানো হয়। যদিও শ্রম কল্যাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম তবু মৌলিক বিষয়গুলি একই রকম। শ্রম কল্যাণের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং অন্যান্য সাধারণ সুযোগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে শ্রম কল্যাণ হল – শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা। সোস্যাল্ সায়েন্স এনসাইক্লোপেডিয়া

অনুসারে শ্রম কল্যাণ হল – শিল্পক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র সাংস্কৃতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতি নিয়োগকারীর সুযোগ সুবিধা প্রদানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, যা – আইন, শিল্প ক্ষেত্রের রীতি এবং বাজার পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে। দ্যা রয়্যাল কমিশন্ অন্ লেবার ইন্ ইন্ডিয়া (১৯৩১) মতে – শিল্প শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ শব্দটি এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যা পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনশীল, যদিও বিভিন্ন দেশে প্রথা, শিল্পায়নের পরিস্থিতি, কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ করা হয় থাকে।

আর্থার জেমস্ টোড এর মতে – পারিশ্রমিক বাদে, শ্রমিকদের মানসিক ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে যা কিছু করা হয়, যদিও শিল্পে এর প্রয়োজন নেই – তাই শ্রম কল্যাণ।

ই.এস.প্রাউড বলেছেন – শিল্পের উন্নতির স্বার্থে এবং নিজেদের শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সুযোগ সুবিধার জন্য নিয়োগকারীর স্বেচ্ছায় করা কিছু কল্যাণমূলক কর্ম।

যদি উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে কোন সংজ্ঞাই সুসংহত বা ব্যাপক নয়। কিন্তু সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিষ্কার যে বিষয়টি সেটি হল – শ্রমিকের কল্যাণে কিছু কর্মসূচি বা প্রয়াস। এই প্রচেষ্টা তাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বসবাস, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত। এটি শ্রমিক শ্রেণির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত। ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ক্যান্টিন, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাথরুম, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াতের সংক্রান্ত পরিষেবার কথা বলা হয়েছে।

৭.৩ শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব

শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব দু-টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রধানত শ্রমিকের পরিমাণগত ও গুণগত শ্রমের উপর নির্ভরশীল। যদি তারা উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে, প্রফুল্ল থাকে এবং সৃজনশীল হয় তবে উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বাড়বে। অন্যদিকে তারা যদি দারিদ্র্য ও হতাশায় ভুগে, সুস্থাস্থ্যের অধিকারী না হয়, অদক্ষ হয়, কাজের পরিবেশ যদি ঠিক না থাকে বা মৌলিক পরিষেবা না থাকে তবে উৎপাদন ও গুণগত মান কমবে। তাই , রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে স্বভাবতই কল্যাণমূলক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণির সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় – তারা বিভিন্ন সমস্যার শিকার যেমন – শোষণ, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনুপযুক্ত বসবাসের অবস্থা, দারিদ্র্য, সুস্বাস্থ্যের অভাব, কু-সংস্কার ইত্যাদি। অধ্যাপক আর. সি. সাক্সেনা সঠিকভাবেই বলেছেন – ভারতীয় শ্রমিকরা শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্তিকে বোঝা বা অভিশাপ রূপে দেখে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেখান থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই তাদের জীবনের ও কর্মস্থলের অবস্থার উন্নতি না ঘটালে একটি সন্তুষ্ট, স্থায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকশ্রেণি গঠন সম্ভব নয়। তাই পশ্চিমি দেশ যেখানে শ্রমিকের অবস্থা এতখানি খারাপ নয় সেই সব দেশের তুলনায় ভারতে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৭.৪ জীবন ধারণের মান, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং শ্রমিকের দক্ষতা

ভারতীয় শ্রমিকদের জীবন ধারণের মান খুবই অনুন্নত। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ শিল্প শ্রমিক বস্তি এলাকায় বসবাস করে। গ্রামের কৃষি শ্রমিক মাটির কুঁড়ে ঘরে বাস করে। সাধারণত একটি ঘর থাকে এবং সেই ঘরটি রান্নাবান্না, ঘুমানো, ওঠাবসা সব কাজেই ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে জানালা থাকে না। উচ্চতাও খুব কম। মেঝে নীচু, কাঁচা তাই, প্রায়ই আর্দ্র থাকে। দু-টি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না কিংবা স্বল্প দূরত্ব থাকে। আলো, জল নিকাশী, নোংরা ফেলার জায়গা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে না। দ্যা রয়্যাল কমিশন্ অন্ লেবার সঠিকভাবে বলেছেন যে – এরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষ জন্মায়, ঘুমায়, খাদ্য গ্রহণ করে এবং জীবন ধারণ ও মৃত্যু বরণ করে। ফলস্বরূপ তাদের জীবন ধারণের মান অনুন্নত। তাদের চিরন্তন দারিদ্রতা জীবনের মানকে এতখানি প্রভাবিত করে যে – তারা কেবল বেঁচে থাকে মাত্র, সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না। তাদের দারিদ্র্যের কারণগুলি হল – কম পারিশ্রমিক, উচ্চ জন্মহার, মাদকাশক্তি এবং অ-স্বাস্থ্য। বসবাসের পরিবেশ এগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, অধিক সন্তান, অধিক শিশুমৃত্যু, নারীর নিম্ন সামাজিক পদ-মর্যাদা ইত্যাদি শ্রমিক শ্রেণির জীবনের অঙ্গ। কিছু কিছু শিল্প যেমন – চা-কফি বাগানের শ্রমিকদের পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ।

কর্মস্থলের পরিবেশও অধিকাংশক্ষেত্রে খারাপ। দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তাও যথেষ্ট নয়। মেসিন সঠিক অবস্থায় থাকে না, মেসিনের চারদিকে বেড়া রাখা হয় না, আলো ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকে না, মেঝে হয়তো বা অসমতল ও আর্দ্র, ধোঁয়া এবং ধুলো ভিতরে জমা হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল থাকে না, থুতু ফেলার জায়গা, শৌচাগার থাকে না বা থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। অনেক শিল্প, কল-কারখানায় ভোজনালয় ও বিশ্রামাগার থাকে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারখানার ছাউনির উচ্চতা কম, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা সঠিক থাকে না। নিয়মিত বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে পোশাকের নিয়ম থাকে না। কর্মস্থল জনবহুল। কাজ করতে করতে শেখা ছাড়া কর্মীদের জন্য অন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না।

যদিও শ্রমিক-কর্মীদের কল্যাণে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবু, ভারতের শিল্প, কলকারখানাগুলিতে নিয়মানুগ ব্যবস্থা নেই। দ্যা লেবার ইনভেস্টিগেশন্ কমিটি বিভিন্ন শিল্প পরিদর্শন করে বলেছে – বড় বড় শিল্প, কল-কারখানায় কাজের পরিবেশ উপযুক্ত রয়েছে কিন্তু ছোট, অনিয়ন্ত্রিত কল-কারখানায় বিশেষ করে যে সব শিল্প পুরাতন বাড়ির মধ্যে অবস্থিত সেখানে আলো, বাতাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উন্নতির প্রয়োজন।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা প্রশ্নাতীত নয়। কঠোর পরিশ্রম, অনুপযুক্ত কাজের পরিবেশ, কম পারিশ্রমিক, মাদকাশক্তি ইত্যাদি কারণে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজন অপুষ্টির শিকার। অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতির হার বেশি। পরিস্থিতি বিচার করে ভারত সরকার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্ল্যানিং কমিশনও স্বাস্থ্য পরিষেবা বর্ধিত করা এবং দক্ষতা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছেন।

৭.৫ ভারতের শ্রম আইন

শ্রমজীবী মানুষদের কল্যাণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন অনুমোদন করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি আলোচনা করা হল–

(ক) দ্যা ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনশেসন অ্যাক্ট, ১৯২৩

শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই কেন্দ্রীয় আইন ১৯২৩ সালে অনুমোদন করা হয়। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আইনটি কার্যকরী হয়। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে কর্মীরা ক্ষতিপুরণ পাবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দুর্ঘটনার ধরন ও প্রভাবের উপর নির্ভর করবে। আইন অনুসারে রাজ্য সরকার একজন কমিশনার নিয়োগ করবে। কমিশনারের কাজ হবে দুর্ঘটনার ধরন অনুসারে ক্ষতিপূরণ ঠিক করা। শিল্প কারখানার নিরাপত্তা যেমন মেসিনের ঘেরাটোপ, নিরপত্তা সংক্রান্ত পোস্টার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পাঁচটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যবস্থা কেমন কমিশনারের কার্যালয় থেকে তা তদারকি করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হতে পারে, অঙ্গহানি হতে পারে বা ক্ষণস্থায়ী সমস্যা হতে পারে। মৃত্যু হলে, নিয়োগকারী কমিশনারের কাছে ক্ষতিপূরণ জমা দেবে এবং কমিশনার তা মৃত কর্মীর উপযুক্ত নমিনিকে দেবে। নিয়োগকারী মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ জমা না দিলে সুদ সহ জরুরি ভিত্তিতে তা জমা দেওয়ার জন্য কমিশনার নির্দেশ দেবেন। স্থায়ীভাবে অঙ্গহানির ক্ষেত্রে কর্মী যাতে নিয়মিত ক্ষতিপূরণ পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য কমিশনারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সাময়িক বা আংশিক সমস্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় উভয়পক্ষ ও কমিশনারের সহমতে।

(খ) দ্যা এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিয়োরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৮

এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মীকে অসুস্থ বা মাতৃত্বকালীন অবস্থায় সহায়তা করা। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আইন পরিবর্তিত হয়েছে। যে সব কল-কারখানা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না এবং ২০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন কারখানার ক্ষেত্রে এই আইনটি প্রযোজ্য। যদিও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না এবং ২০ জনের কম কর্মী আছে এমন কারখানার ক্ষেত্রেও ক্রমশ আইনটির প্রয়োগ ঘটছে। দোকান, হোটেল, রেস্তঁরা, থিয়েটার পত্রিকা দপ্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আইনের প্রয়োগ হচ্ছে।

স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী, কারিগরি বা অন্যান্য সকল কর্মী এই আইনের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। একটি কর্পোরেট গোষ্ঠী আইনটির প্রায়োগিক দিকগুলি দেখে। শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ঐ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হবেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী ভাইস্ চেয়ারম্যান্ হবেন। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও নিয়োগকারী, কর্মী এবং চিকিৎসক ঐ গোষ্ঠীর সদস্য।

দেশের সর্বত্র স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে এই গোষ্ঠীর কার্যালয় রয়েছে। আঞ্চলিক ডাইরেক্টরের অধীনে আঞ্চলিক কার্যালয়ে কাজকর্ম হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা মূলত ই.এস.আই. হাসপাতালের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অন্যান্য কিছু হাসপাতালেও শয্যা সংরক্ষিত থাকে। বহির্বিভাগীয় পরিষেবাও দেওয়া হয়। তাছাড়া বেশ কিছু চিকিৎসক ই.এস.আই. হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী ও তাদের পরিবারের চিকিৎসার কাজে যুক্ত থাকে।

(গ) দ্যা এমপ্লয়িজ প্রোভিডেন্ট ফান্ডস এন্ড মিসেলেনিয়াস প্রোভিসনস্ অ্যাক্ট, ১৯৫২

এই আইনের মাধ্যম অবসরের পর কর্মীকে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ২০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন শিল্প ও অন্যান্য সংস্থার কর্মীরা ৩ বছর কাজ করলে এই সুযোগ পাবেন। সংস্থা কর্মীদের পৃথক পি.এফ. একাউন্ট রাখবে এবং বছরের শুরুতে গত বছরের আর্থিক পরিস্থিতি বিশদভাবে কর্মীকে জানাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রস্তাব অনুসারে সুদের হার স্থির করবে। অবসরকালে কর্মী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পি.এফ. এর টাকা পাবেন। মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত আত্মীয় যেমন ছেলে বা ভাইপো ওই টাকা পাবে। সারা দেশে পি.এফ. কার্যালয় রয়েছে। পি.এফ. সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা ছয় সপ্তাহের মধ্যে কমিশনারের গোচরে আনা যেতে পারে।

(ঘ) দ্যা পেমেন্ট অব্ গ্র্যাটুইটি অ্যাক্ট, ১৯৭২

এই আইনের মাধ্যমে অবসরের পরে আর একটি সুবিধা দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্মী কাজ করলে এই সুযোগ পাবেন। পূর্বে নিয়োগকারী স্বেচ্ছায় এই সুযোগ দিত। বর্তমানে এটি বাধ্যতামূলক। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ হবে কর্মী যত বছর কাজ করেছে তত মাসের অর্ধেক বেতন।

এই আইন, শিল্প, কলকারখানা, খনি, বন্দর, রেল বিভাগ এবং দশ কিংবা তার বেশি কর্মী কাজ করে এমন দোকান ও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মীর অবসরের তিন মাসের মধ্যে গ্রাচুইটির টাকা দিতে হবে। পি.এফ. এর নিয়মের মতোই কর্মীর মৃত্যু হলে স্ত্রী কিংবা উপযুক্ত প্রতিনিধি এই টাকা পাবে। গ্রাচুইটি দাবী করার সাধারণ নিয়ম হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগকারীর কাছে আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়োগকারী সঠিক পরিমাণ টাকা না দিলে নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে কন্ট্রোলিং অথরিটির কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। কন্ট্রোলিং অথরিটি কালেক্টরের মাধ্যমে ওই অর্থ সংগ্রহ করবে এবং আবেদনকারীকে দেবে।

(ঙ) দ্যা ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, ১৯৬১

মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে

● গর্ভবতী মহিলা প্রসবের পূর্বে এবং পরে তিনমাস ছুটি পাবেন। বর্তমানে চার মাস ছুটি দেওয়া হয়।

● সময় নিয়োগকারীর কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধাও পাবে।

● গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ছয় মাসের ছুটি পাবে।

● প্রসব কিংবা গর্ভপাত উভয় ক্ষেত্রে কর্মীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ আবেদন করতে হবে।

● গর্ভাবস্থা, প্রসব বা গর্ভপাতের ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে আরো চার সপ্তাহ ছুটি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

● ছুটির পরে কাজে যোগদান করলে তাঁকে একমাস হালকা কাজ দিতে হবে।

● সাধারণ বিশ্রাম ছাড়াও তাঁকে দু-বার বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে যতদিন না শিশুর এক বছর তিন মাস বয়স হয়।

● এই ধরনের বিশ্রামের সময়সীমা রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুসারে ঠিক করা হয়।

● কর্মী এই আইনের সুযোগ তখনি পাবে যদি সে সম্ভাব্য প্রসবের তারিখের পরে বারো মাসের মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে ৮০ দিন কাজ করে থাকে।

● যদি মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগের সময় কর্মী অন্য কোন সংস্থায় কাজ করে কিংবা কোন খারাপ কাজের জন্য বহিষ্কৃত হলে মাতৃত্বকালীন সহায়তা পাবে না।

(চ) দ্যা মিনিমাম ওয়েজস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৮

শান্তি, সম্মান ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই আইন। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে মানুষের দাবী করার ক্ষমতা কম যেখানে এই আইন অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ সাল থেকে স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটিতে এই সংক্রান্ত আলোচনা হত এবং ১৯৪৮ সালে গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের পর আইনটি গৃহীত হয়। জম্মু কাশ্মীর ছাড়া দেশের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য। এই আইননের সহায়তায় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা হয়। এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা রয়েছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা–

● শাল, উলের বস্ত্র তৈরি,

● ডাল, তেল, চাল, মিল, আটা-ময়দা মিল,

● বিড়ি তৈরি,

● নির্মাণ কাজ, সারনো, পাথর কাটা,

● লাক্ষা উৎপাদন, প্রোসেসিং,

● চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

কৃষি কাজ, ডেয়ারি, পোল্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মীরাও এই আইনের সুবিধা পাবে।

এই আইনের ভিত্তিতে সরকার কাজের স্বাভাবিক সময়সীমা এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঠিক করবেন। যদি কেউ কম মজুরি দেয় তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আইন ১৯৫৭ সালে সংশোধিত হয়। সরকার কিছু নীতি তৈরি করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল – মজুরি এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে কর্মীরা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দিক থেকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। ১৯৫৭ সালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেনসে নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার কথা বলা হয় –

১। খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা নির্ধারণ,

২। মজুরির ২০ শতাংশ জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচ। অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি হবে জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচের পাঁচ গুণ।

(ছ) দ্যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৭

ভারতবর্ষে প্রায়ই শিল্প বিরোধ দেখা যায়। এই ধরনের বিরোধ সমাধানের জন্য ১৯৪৭ সালে আইনটি গৃহীত হয়। ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। ১৯২৯ সালের ট্রেড

ডিসপিউট আইনের পরিবর্তে এই আইন গৃহীত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল শিল্পক্ষেত্রে বিরোধ প্রতিরোধ এবং সমাধান করা। এই আইনের অধীনে বিভিন্ন আধিকারিক রয়েছে যেমন –

ওয়ার্কস্ কমিটি

যে সব শিল্পে ১০০ বা বেশি কর্মী রয়েছে সেখানে নিয়োগকারী ও কর্মীদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির কাজ হবে কর্মী ও নিয়োগকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কমিটি বিরোধের কারণগুলি কমিয়ে আনার চেষ্টা করে।

কনসিলেশন অফিসার

সরকার কনসিলেশন অফিসার নিয়োগ করবেন যার কাজ হবে শিল্প বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতা করা। এরূপ অফিসার নির্দিষ্ট জায়গায় বা শিল্পে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

বোর্ড অব কনসিলেশন

পরিস্থিতির জটিলতা অনুসারে সরকার এই বোর্ড গঠন করতে পারে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর চেয়ারম্যান হবে এবং কর্মী ও নিয়োগকারীর মধ্য থেকে দুই চার জন প্রতিনিধি থাকবে। বোর্ড সরকারকে অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত করবে। কোরাম হলে বোর্ড মিটিং হবে। সেখানে চেয়ারম্যান নাও থাকতে পারে।

কোর্ট অব এনকোয়ারী

যদি শিল্প বিরোধ কনসিলেশন অফিসার বা বোর্ড অব কনসিলেশনের মাধ্যমে সমাধান না করা যায় তবে বিষয়টি কোর্ট অব এনকোয়ারিতে পাঠাতে হয়। বিশদ অনুসন্ধানের পর কোর্ট সরকারকে রিপোর্ট দেবে যা পরবর্তীকালে ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল ফর এডজুডিকেশনে পাঠানো হয়।

লেবার কোর্ট

এই আইন অনুসারে সরকার শিল্প বিরোধ সমাধানের জন্য লেবার কোর্ট গঠন করতে পারে। লেবার কোর্ট শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দেবে।

ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল

সরকার শিল্প বিরোধ সমাধানের জন্য এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করবে এবং সরকার কেবল একজন ব্যক্তি নিয়োগ করবে। ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারপতির সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে। জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ সমাধানের জন্য জাতীয় স্তরে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা যেতে পারে।

(জ) দ্যা ফ্যাক্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৪৮

১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকরী হয়। এর উদ্দেশ্য হল, সমস্ত ধরনের শিল্পে কাজের পরিবেশ উন্নত করা। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রয়েছে–

(ক) **পরিচ্ছন্নতা ঃ** কর্মীদের যাতে স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য সমস্ত কারখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অপরিচ্ছন্ন নর্দমা বা নর্দমা গর্ত বাসস্থানে যেন না থাকে।

(খ) **আবর্জনা ও উদগত পদার্থ অপসারণ ব্যবস্থা ঃ** আইন অনুসারে সব ধরনের শিল্প কারখানাকে আবর্জনা ও উদ্গাত পদার্থ অপসারণ করতে বাধ্য করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(গ) **কৃত্রিম আর্দ্রতা ঃ** এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে আর্দ্রতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি করা। এবং এর জন্য ব্যবহৃত জল যেন পরিশুদ্ধ হয় তা দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) তাপমাত্রা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ঃ সমস্ত কল কারখানায় যাতে উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে এবং তাপমাত্রা যেন স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণ না হয় এবং কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে তা দেখার দায়িত্ব সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) জনবহুল অবস্থা ঃ আইন অনুসারে কোন কর্ম পরিবেশ এমন জনবহুল হবে না যাতে কর্মীদের কাজের অসুবিধা হয়। আইন অনুমোদনের পূর্বে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেখানে প্রতি কর্মীর জন্য অন্তত ৩৫০ কিউবিক ফুট জায়গা থাকে। আইন গৃহীত হওয়ার পরে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রতি কর্মীপিছু ৫০০ কিউবিক ফুট জায়গা রাখতে হবে।

(চ) ধুলো ও ধোঁয়া ঃ কারখানা থেকে ধুলো ও ধোঁয়া নির্গত হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিপর। এই আইনের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সেগুলি না জমা হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কর্মীর শরীরে না প্রবেশ করে।

(ছ) পানীয় জল ঃ আইন অনুসারে রাজ্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা থাকে তা সুনিশ্চিত করা। জলের কল এমন জায়গায় থাকবে যেখানে অতি সহজে কর্মীরা তা ব্যবহার করতে পারে। রাজ্য সরকার জলের ব্যবস্থা এবং জলের গুণগত মান খতিয়ে দেখবে।

(জ) বাথরুম ঃ প্রতিটি কল কারখানায় মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় পৃথক পৃথক বাথরুম থাকবে। সেগুলি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যাতে কর্মীরা কর্মরত অবস্থায় সহজে ব্যবহার করতে পারে। সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সব শিল্প কারখানায় যাতে সঠিক ভাবে এই আইন রূপায়িত হয় তা সরকার দেখবে।

(ঝ) আলোর ব্যবস্থা ঃ রাজ্য সরকার এই আইন অনুসারে বাথরুম, ক্যানটিন, গেট, রাস্তা ইত্যাদি স্থানে উপযুক্ত আলো সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি করবে যাতে দুর্ঘটনা ও কর্মীর চোখের অসুবিধা না হয়।

(ঞ) থুথু ফেলার জায়গা ঃ আইন অনুসারে উপযুক্ত স্থানে থুতু ফেলার জায়গা রাখতে হবে। সেগুলি সঠিকভাবে রাখতে হবে যাতে নোংরা না হয়।

৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে – সদস্যরা সমস্যার সম্মুখীন হলে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানকে বোঝায়। স্যার ইউলিয়ম বেভারেজের মতে, সামাজিক নিরাপত্তা চাহিদা, রোগ, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা এবং অসুস্থতা এই পাঁচটি বিষয় সংক্রান্ত প্রচেষ্টা। আই.এ.ও মতে, সদস্যরা সমস্যার সম্মুখীন হলে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ যে পরিষেবা প্রদান করে তাই সামাজিক নিরাপত্তা। অসুস্থতা, মাতৃত্ব, অক্ষমতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই বিষয়গুলি দেখা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কথটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়

– যার মধ্যে রয়েছে বীমা প্রকল্প এবং সামাজিক সহায়তা। তবে, এর অর্থ এবং পরিধি প্রথা ও আইন অনুসারে দেশে দেশে কিছুটা হলেও ভিন্ন।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিষেবার মধ্যে রয়েছে বীমা, সামাজিক ও জনহিতকর পরিষেবা। বিষয়গুলি শ্রম কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সারা বিশ্বে শ্রমিকদের জীবন যাপন ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে আই.এল.ও. স্থাপিত হয় এবং এই সংস্থার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়–

(ক) সামাজিক নিরাপত্তা কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ – যা আন্তর্জাতিক মানের হবে।

(খ) বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প একত্রিত করা এবং বিনিময় করা।

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প তৈরির জন্য কারিগরী জ্ঞান এবং সহায়তা প্রদান।

১৯৫২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আই.এল.ও সম্মেলনে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে ৯টি উপাদানে ভাগ করা হয় যেমন – চিকিৎসা পরিষেবা, অসুস্থতার সময় সহায়তা, বেকারদের সহায়তা, বার্ধক্যকালে সহায়তা, পারিবারিক সহায়তা, মাতৃত্ব জনিত সহায়তা, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে সহায়তা, ব্যক্তিগত এবং জীবিতদের জন্য সহায়তা ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

(ক) এগুলি বাধ্যতামূলক হবে,

(খ) এগুলি অধিকার বলে ধরা হবে,

(গ) প্রাসঙ্গিক আইনানুগ পরিস্থিতি অনুসারে সহায়তা প্রদান করা হবে,

(ঘ) সহায়তা কর্মীর প্রদেয় অংশের তুলনায় বেশি হবে,

(ঙ) কর্মীর প্রয়োজন ও আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবারই ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ধর্মীয় সংগঠন, ধনী পরিবার, ষোলআনার বিষয়, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিরও ভূমিকা রয়েছে। অতীতের সামাজিক নিরাপত্তা ছিল অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলি এই ভূমিকা পালন করত। পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ সমস্ত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র অধিকাংশ দায়িত্ব গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ করে, শ্রমিক শ্রেণির জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন – ফ্যাকট্রি অ্যাক্ট, ওয়ার্ক ম্যানস্ কমপেনশেসন অ্যাক্ট, ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট, স্টেট ইনসিওরেন্স অ্যাক্ট, কোল মাইনস্ প্রোভিডেন্ট ফান্ড্ এন্ড বোনাস স্কিমস্ অ্যাক্ট, প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট, ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, সিমেনস প্রোভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট, এমপ্লোইজ ফ্যামিলি পেনশন স্কিম এবং গ্রাচুইটি অ্যাক্ট ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় – এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, অ্যাক্টগুলি সমস্ত শিল্পে সঠিকভাবে যেন রূপায়ণ করা হয় তা দেখতে

হবে। গত শতকের শেষের দিকে বিষয়টি আশাপ্রদভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু শুরু করাটাই শেষ কথা নয়। বর্তমান পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে সমস্ত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের লোকজন সুবিধা পেতে পারে। কোন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নয়, ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের পরিবারের সামগ্রিক উন্নতি হয়।

৭.৭ ট্রেড ইউনিয়ন

সিডনি এবং ওয়েব এর মতে ট্রেড ইউনিয়ন হল – শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে গঠিত শ্রমিকদের সংগঠন। এ মঞ্চ তৈরি করে শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুতরাং, এই ইউনিয়ন গঠনের মূল কারণ হল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রের অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা। ট্রেড ইউনিয়ন হল শ্রমিকদের মঞ্চ। তারাই গঠন করে, দেশের আইন অনুসারে রেজিস্ট্রেইশন্ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, নেতা নির্বাচন করে, কার্যালয় স্থাপন করে, শাখা অফিস স্থাপন করে এবং নিজেদের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের কাজকর্ম সাধারণত তিন ধরনের।

(ক) চত্বরের মধ্যে কাজকর্ম

এই ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, ভালো কাজের পরিবেশ, কাজের সময়সীমা, নিয়োগকারীর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার, লভ্যাংশের অংশ ইত্যাদি সংক্রান্ত। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেমন – দর কষাকষি, মধ্যস্থতা, ধর্মঘট ইত্যাদি। এরূপ কাজকর্ম আক্রমণাত্মক কাজ বলে পরিচিত।

(খ) চত্বরের বাহিরে কাজকর্ম

এরূপ কাজকর্ম হল কর্মীদের প্রয়োজনে তাকে সাহায্যে করা। ইউনিয়ন তাদের বহুমখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সহযোগিতার মনোভাব, শিক্ষা, সুন্দর সম্পর্ক, এবং কর্মীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে। ইউনিয়ন চিকিৎসা ও দুর্ঘটনা জনিত সুযোগ সুবিধা এবং ধর্মঘট বা লক আউটের সময় প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে। প্রয়োজন হলে তারা আইনি সহায়তাও দেয়। ইউনিয়ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক কর্মসূচি, গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরিচালনা করে। কিছু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিও গ্রহণ করে। এইসব কর্মসূচি সহোদর বা ভ্রাতৃত্বমূলক।

(গ) রাজনৈতিক কাজকর্ম

বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের কেউ কেউ পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এইভাবে তারা সরকারের শ্রম নীতিকে প্রভাবিত করেন।

ভারতের প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল – আই.এন.টি.ইউ.সি., এ.আই.টি.ইউ.সি., এইচ.এম.এস., ইউ.টি.ইউ.সি., বি.এম.এস., ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (লেনিন সরনি), সি.আই.টি.ইউ., এন.এফ.আই.টি.ইউ. ইত্যাদি।

৭.৮ শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি

কল্যাণ কথাটির অর্থ মানুষ ও জনগোষ্ঠীর মঙ্গালসাধন। এই ধারণা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গো সঙ্গো পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি আলাদা তাই কল্যাণ কর্মসূচিও কিছুটা ভিন্ন। তবে বলা যায় আর্থ-সামাজিক প্রচেস্টার মাধ্যমে জনগণের জীবনধারার উন্নতি ঘটানোর প্রয়াসই হল কল্যাণ। শ্রম কল্যাণ কথাটি ৭.২ অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু কিছু শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি সংবিধান স্বীকৃত। ওই সকল কর্মসূচি বূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিষয়গুলি কর্ম-পরিবেশ সংক্রান্ত যেমন—কাজের সময়, উপযুক্ত আলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৌচালয় ইত্যাদি। কিছু কিছু কাজ স্বেচ্ছায় করা হয়। সেগুলি করতে সাধারণত কোন সামাজিক সংগঠন যেমন – ওয়াই.এম.সি.এ., ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ., লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি সাহায্য করে। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু কল্যাণ করা হয়।

শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণ দু-ভাবে হয়। অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয়। অন্তর্বিভাগীয় পরিষেবা ফ্যাক্টরির চত্বরে যেমন – বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাথরুম, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভোজনালয়, উপযুক্ত আলো, নিরাপত্তা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, যন্ত্র ও কারখানার সঠিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। বহির্বিভাগীয় পরিষেবা বা ফ্যাক্টরির চত্বরের বাইরে দেওয়া হয় যেমন – বসবাস, ক্লিনিক ও অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবা, বিনোদন, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং খেলাধূলা ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রম কল্যাণ কিছুটা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক। এই প্রচেষ্টা শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকজনদের সুন্দরভাবে সামাজিক জীবনযাপনে সহায়ক।

৭.৯ শিশু ও মহিলা শ্রমিক

আমাদের দেশে শিশু ও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিশেষ করে শিল্প, চাল তৈরি এবং কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে দোকান, কার্পেট শিল্প, বিড়ি শিল্প, চুড়ি শিল্প, মাইকা শিল্প, চর্ম শিল্প, ইঁট ভাটা এবং বাড়ির কাজে শিশু শ্রমিক বেশি। ১৫ বছরের নীচে যে কোন ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে কাজ করলে তাকে ‘শিশু শ্রমিক’ বলা হয়। লেবার ইনভেস্টিগেশন্ কমিটি এক সময় দেখেছিল – ডুয়ার্স অঞ্চলে ২৫.৭ শতাংশ, দার্জিলিং এ ২১ শতাংশ এবং আসাম উপত্যকায় ১৪.৫ শতাংশ শিশু শ্রমিক কাজ করে। ব্যক্তিগত কারখানায়ও শিশু শ্রমিকরা কাজ করে। এবং তামিলনাড়ুতে এটা খুব বেশি। কল-কারখানায় কাজ করা শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ছেলেরাই বেশি।

সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশু শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কম। এবং তা প্রাপ্তবয়স্কদের মজুরীর প্রায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাজের সময়ও বেশি। সব ধরনের শোষণ বিদ্যমান। তবে, নৈশ কাজ বন্ধ।

রয়্যাল্ কমিশন্ অন লেবার এর প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার দু-টি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যথা – ১৯৩৩ সালে চিলড্রেন অ্যাক্ট এবং ১৯৩৮ সালে এমপ্লয়মেন্ট অব্ চিলড্রেন অ্যাক্ট। দু-টি আইনই শিশুদের স্বাস্থ্যহানিকর শিল্প কর্মে নিয়োগ, তাদের কাজের সময় এবং মজুরী সংক্রান্ত। কিন্তু এই আইনগুলি বাস্তবে

সঠিকভাবে রূপায়িত হয় নি। আর একটি আইন – চাইল্ড্ লেবার অ্যাক্ট ও ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয়েছে। এই আইন অনুসারে ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যেমন – গৃহকর্ম, ধারা, হোটেল, রেস্তঁরা, চা দোকান, লজে কাজ নিষিদ্ধ। নিয়োগকারীদের ২০,০০০ টাকা জরিমানা বা এক বছরের জেল কিংবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

মহিলা শ্রমিকরাও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কম মজুরী পায়। যদিও ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরী আইনে সমান মজুরীর কথা বলা হয়েছে। সাধারণত পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার থাকে না। পাট, তুলো, চাল শিল্পে এই সুবিধা হয় আদৌ নেই অথবা অপ্রতুল। মহিলাদের ভূগর্ভে কাজ করা নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা ১৯৪৩ সালে তুলে নেওয়া হলেও ১৯৮৬ সালে আবার চালু হয়। নিয়োগকারীরা মাতৃত্বজনিত সুযোগ সুবিধা দিলেও শিশু যত্নের পরিষেবা নেই বললে হয়।

মহিলা শ্রমিকদের মর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে। আরও দেখা গেছে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগকারী, সহকর্মী, তদারককারী ও অন্যরা মহিলাকর্মীদের অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের বাড়ির কাজ করতে হয় বলে তারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না। মহিলা শ্রমিকরা অধিকাংশ নিরক্ষর এবং নিজে থেকেই কাজ শিখেছে।

পরিশেষে বলা যায় মহিলারা কৃষি ও শিল্প কর্মে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা উপযুক্ত কাজের পরিবেশ পায়। এবং একই কাজের জন্য পুরুষদের সমান পারিশ্রমিক দিতে হবে।

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রমিক সমস্যা এবং সমাজ কল্যাণ – আর. সি. সাক্সেনা

২। ইন্ডিয়ান সোস্যাল প্রোবলেমস্ – জি.আর.মদন

৩। লেবার প্রোবলেমস্ এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার – এস.আর.সাক্সেনা

৪। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ ইন ইন্ডিয়া – অপর্ণা রাজ

৫। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্য – পি. এল. মল্লিক

৭.১১ অনুশীলনী

১। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নীতি ও কাজকর্ম বিশ্লেষণ করুন।

২। শিল্পবিরোধের মূল কারণগুলি আলোচনা করুন।

৩। শিল্পবিরোধ অবসানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়াস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। শ্রম কল্যাণ কী? এর বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

৫। মাতৃত্বকালীন সহায়তা বলতে কী বোঝেন? এর মাধমে কি শর্তে কী কী সুযোগ দেওয়া হয়?

৬। ভারতীয় শিল্প শ্রমিকদের কর্মস্থলের পরিবেশ আলোচনা করুন।

৭। শিশু শ্রমিক বলিতে কী বোঝেন? এর কারণ কী? শিশু শ্রমিকদের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

একক ঃ ৮ কাউন্সেলিং পরিষেবা – গুরুত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল

গঠন

৮.১ ভূমিকা

৮.২ ধারণা

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর শ্রেণি বিভাগ

৮.৪ নীতি

৮.৫ কাউন্সেলিং-এর বিষয়

৮.৬ পদ্ধতি

৮.৭ কৌশল

৮.৮ উপসংহার

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১০ অনুশীলনী

৮.১ ভূমিকা

কাউন্সেলিং কথাটি বর্তমানে সারা বিশ্বে বহুল প্রচলিত। শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা কাউন্সেলিং বিষয়টিকে আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করেন। ভারতে পেশাগত পরিষেবা হিসাবে কাউন্সেলিং অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়। (হাল-আমলে শুরু হয়েছে)। বিগত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে কাউন্সেলিং খুবই জনপ্রিয় পেশায় পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে কাউন্সেলিং খুবই বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে। বর্তমানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সার্বিকভাবে সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং শত শত বে-সরকারি সংস্থা এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের সংস্থা দিনের পর দিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, ব্যক্তিগত স্তরে – অসহায় ব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিকভাবে সাহায্য করার পদ্ধতি।

৮.২ ধারণা

যেহেতু, ভারতে কাউন্সেলিং পরিষেবা বহুল প্রচলিত নয়, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আমাদের ভুল ধারণা নতুবা অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। অনেক সময় আমরা মনে করি উপদেশ দেওয়াই কাউন্সেলিং। এই ভুল ধারণার প্রেক্ষাপটে বলা যায় উপদেশ কিংবা প্রশ্নোত্তর কিন্তু কাউন্সেলিং নয়।

বিজ্ঞানী পার্জ্ এর মতে কাউন্সেলিং হল কাউন্সেলি (পরামর্শগ্রহণকারী) এবং কাউন্সেলর (পরামর্শপ্রদানকারী) যিনি সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের পদ্ধতি। স্মিথ্ এর মতে কাউন্সেলিং হল – এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাউন্সেলর কাউন্সেলিকে তার পছন্দ, পরিকল্পনা বা খাপখাইয়ে নেওয়া ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। প্যাটারসনের মতে বিশেষজ্ঞ এবং এক বা একাধিক ক্লাইয়েনট্ এর পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পদ্ধতি যেখানে বিশেষজ্ঞ ক্লাইয়েনটের মানসিক অবস্থার উন্নতির জন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক গঠন জ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। ওয়েব্ স্টার অভিধানে বলা হয়েছে কাউন্সেলিং হল পরামর্শপ্রদান, মতামত বিনিময় এবং একত্রে বিবেচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণেমর পদ্ধতি। রোচারের মতে এটি হচ্ছে ব্যক্তিকে সাহায্য করা যেখানে সে নিজের সম্বন্ধে এবং তার পরিবেশে সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে সে সম্বন্ধে জানবে। এই পদ্ধতি আরো তাকে ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় বসতে এবং ভবিষ্যতে কেমন ব্যবহার হবে সে সম্বন্ধীয় কিছু লক্ষ্য এবং নৈতিকমান স্থির করতে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে বলা যায় কাউন্সেলিং হচ্ছে একটি পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুতপক্ষে, কাউন্সেলিং – একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিচার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক যাতে সে ভবিষ্যতে ঐরূপ সম্ভাব্য ঘটনার মোকাবিলা করতে পারে। এটা কোন সাহায্যের পরিষেবা নয়, বরং সহায়তাকল্পে পরিচালিত। কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশের জন্য সহায়তা করার পূর্বে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে। যদিও গাইডেন্স, সাইকোথেরাপী এবং কাউন্সেলিং সমার্থক শব্দ এবং তিনটি ধারণারই ভিত্তি – একটি সহায়তা প্রদানকারী সম্পর্ক যাতে ব্যক্তি নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবু এই তিনটি ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। কাউন্সেলিং হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা করা হয়। গাইডেন্স্ এর মাধ্যমে, ব্যক্তি যাতে নিজেকে বুঝতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। এবং সাইকোথেরাপী এক ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা যা মানসিক রোগে ভুগছে এমন ব্যক্তির জন্য। গাইড্, কাউন্সেলর এবং সাইকোথেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করার জন্য প্রায় একই ধরনের জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন। আবার প্রত্যেকের কিছু পৃথক পৃথক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার।

কাউন্সেলিং এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে খাপখাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া। এবং মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে নিজেকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যাতে চরম দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সক্ষম করা। সুতরাং, মানসিক প্রতিবন্ধী ও ভারসাম্যহীন এবং হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্য কাউন্সেলিং প্রয়োজন। আবার সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম, আত্মবিশ্বাসহীন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি এমন মানুষের জন্যেও কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্ব

চিরাচরিতভাবে সমাজে এটা দেখা গেছে যে কিছু মানুষ সমস্যার সৃষ্টি করছে আবার কিছু মানুষ তা সমাধান করছে। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সেলিং পরিষেবার গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে। বর্তমান সমাজে যা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানের সমাজের বুনন অতীতের মতো এত গভীর নয় যেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব সুন্দর ছিল এবং সমস্যার সমাধানে একে অপরকে সাহায্য করত। এখন হাজার হাজার মানুষ একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। এমনকি প্রত্যন্ত এলাকাতেও এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে অন্তর্নিহিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে একটি ভাসাভাসা সম্পর্ক বজায় রাখা। এমনকি পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও ঐ ধরনের সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সমাজ ক্রমশ জটিল হচ্ছে এবং ব্যক্তি মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করছে। এই কারণে আচরণগত সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামো মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই, পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামো মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য কাউন্সেলিং এর মতো বিশেষ পরিষেবা প্রয়োজন হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা, অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, ধর্মীয় আনুগত্যহীনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতি আমাদের জীবন ও জীবিকায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কাউন্সেলিং-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং এরূপ কিছু বিষয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে খুবই প্রভাবিত করছে। মানুষ নিজে থেকে কিছু কিছু সমস্যা সমাধান করতে কিংবা সমস্যার গভীরতা কমিয়ে আনতে সক্ষম। অনেক সময় পরিবারের সদস্য-সদস্যা, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধান ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য শহর এবং গ্রাম উভয় ক্ষেত্রে মানুষ কাউন্সেলিং এর মতো পেশাগত পরিষেবার গুরুত্ব অনুভব করছে।

অতীতে, সমাজ অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল ছিল এবং মানুষের চাহিদা কম বা সীমায়িত ছিল। যার ফলে সমস্যাও কম ছিল। আর বর্তমানে, জীবন জটিলতায় ভরপুর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষা ও সুকুমার প্রবৃত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি কাউসেলিং এর মতো বিশেষ, পেশাগত পরিষেবা আবশ্যিক করে তুলছে। যে সকল ব্যক্তি দৈনন্দিন কাজকর্মে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারছে না তাদের জন্য এই কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রয়োজন।

মানুষকে সারা জীবনে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারা মানসিক চাপ এবং ঝুঁকি এগিয়ে যেতে পারে না। আবার স্বেচ্ছায় উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। বরং নানা কারণে এই পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ব্যক্তি নিজে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এরূপ পরিস্থিতিকে ব্যক্তিগত-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা হিসাবে দেখা হয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সক্ষম করার জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবার দরকার।

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর শ্রেণি বিভাগ

কাউন্সেলিং দু-ধরনের হতে পারে (১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং (২) গোষ্ঠীভিত্তিক।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং ইন্টারভিউ (প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে। ইন্টারভিউ আবার নানা ধরনের হতে পারে যেমন ঃ ইনট্রোডাক্টরী ইন্টারভিউ, ফ্যাক্ট্ ফাইন্ডিং ইন্টারভিউ, ইনফরমেটিভ্ ইন্টারভিউ এবং থেরাপিউটিক্ ইন্টারভিউ।

ইনোডাক্টরী ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হয় যাতে পরবর্তী ধাপগুলি সহজে অনুসরণ করা যায়। প্রথমে কাউন্সেলর নিজের পরিচয়, ইন্টারভিউ এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে ধারণা দেন।

ফ্যাক্ট্ ফাইন্ডিং ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রতি কাউন্সেলির আচরণ কেমন যা লিখিত আকারে প্রকাশ পায় নি তা অনুধাবন করার চেস্টা করেন। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ কাউন্সেলি ও অপরের সঙ্গে সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানে ব্যবহার করা হয়।

ইনফরমেটিভ্ ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ইন্টারভিউই (ক্লাইয়েনট্) এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। থেরাপিউটিক্ ইন্টারভিউ থেরাপিউটিক্ উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ক্লাইয়েনট্ তার সমস্যা, স্বপ্ন, উচ্চাশা ইত্যাদি কাউন্সেলররের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পায়। তার অতীত – বর্তমান, আশা-আশঙ্কা ইত্যাদিও আলোচনা করতে পারে।

অন্যদিকে গ্রুপ কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে কাউন্সেলি সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কাউন্সেলি তার সহপাঠী বা সহকর্মীদের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা শুনবার সুযোগ পায়। এরূপ আলোচনা তাকে তার নিজস্ব সমস্যা অনুধাবন করতে বা বুঝতে সাহায্য করে। সীম্যানের মতে গ্রুপ কাউন্সেলিং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী।

৮.৪ নীতি

কাউন্সেলিং কয়েকটি নীতি দ্বারা পরিচালিত যেমন–

(ক) প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র

এটা স্বাভাবিক যে প্রতিটি মানুষ অন্যদের তুলনায় নানা দিক থেকেই আলাদা। সুতরাং, কাউন্সেলর যদি সবার সমস্যার কারণ এবং সমস্যা সমাধানের ধাপ একই রকম মনে করে কাউন্সেলিং করতে যায় তাহলে ভুল হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে একের সমস্যা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং আলাদাভাবে তা সমাধান করতে হবে।

(খ) সিদ্ধান্ত এবং অনুভূতি যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়

কাউন্সেলর কখনই নিজের অনুভূতি কাউন্সেলির উপর চাপিয়ে দেবে না কারণ তা পরিস্থিতির উন্নতিতে সাহায্য করে না। বস্তুতপক্ষে চাপিয়ে দেওয়া হলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে তাই তা বর্জনীয়। যেহেতু

চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা তাই কাউন্সেলরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

(গ) ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। সুতরাং কাউন্সেলর কখনই যেন মনে না করে যে এদের দ্বারা কিছু হবে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ভরসা রেখে কাউন্সেলরকে কাউন্সেলিং শুরু করতে হবে। এখানে তার ভূমিকা হবে – কাউন্সেলি যাতে তার স্বভাব-প্রকৃতি, ক্ষমতা ও সৃজনশীল শক্তি অনুধাবন করে নিজেরে মানসিক সমস্যার সমাধান করতে পারে – সে ব্যাপারে সাহায্য করা। কাউন্সেলর সফল হওয়ার প্যাপারে সবসময় আশাবাদী থাকবে। তার কাজ হবে ক্লাইয়েন্ট্ কে বিশ্বাস করানো যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা তার রয়েছে।

(ঘ) সঠিকভাবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ

কাউন্সেলিং এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাউন্সেলিং সমস্যা সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং বিশ্লেষণ ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে শোনা। এটি সমস্যার উৎস অনুধাবন করতে এবং কাউন্সেলির বিষয়টি যে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে সেই ধারণা সৃষ্টির জন্য আবশ্যিক। সঠিকভাবে মনোযোগ সহকারে না শুনলে কাউন্সেলির মনস্তাত্ত্বিক জগতে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মনোযোগ সহকারে শোনা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। কাউন্সেলি কি বলছে এবং ঠিক কি ঘটেছে তা বুঝবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হল এই পদ্ধতি। মনোযোগ সহকারে শোনবার সাথে সাথে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে।

(ঙ) গোপনীয়তা বজায় রাখা

কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং আস্থা অর্জন করা খুবই জরুরি। কাউন্সিলরের উচিত কাউন্সিলির কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য গোপন রাখা। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কারো কাছেই ঐ সব তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয় না। যেহেতু কাউন্সেলিং একটি পেশায় পরিণত হয়েছে তাই কিছু পেশাগত নৈতিকতা মেনে চলা উচিত। গোপনীয়তা বজায় রাখা এই ধরনের একটি ব্যাপার যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(চ) কাউন্সেলিং এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন

যেহেতু কাউন্সেলিং একটি পেশাগত পরিষেবা তাই উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই কাজে নিযুক্ত হওয়া দরকার। অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হাতুড়ে চিকিৎসকের মতো। তাদের প্রদেয় পরিষেবা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে না বরং পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। সুতরাং কেবল উপযুক্তভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই কাজে যুক্ত থাকবে।

(ছ) কাউন্সেলিং-এর অর্থ উপদেশ দেওয়া নয়

কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সহায়তা করা হয় উপদেশ দেওয়া হয় না। কাউন্সিলরের কাজ হচ্ছে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে কাউন্সেলি তার সমস্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতি

স্বভাবতই ক্লায়েনটকে তার সমস্যা লাঘবের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সরাসরি সমস্যার সমাধান নয়, কাউন্সেলরের প্রবণতা হওয়া উচিত ক্লায়েনট্ যেন তার সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

(জ) গ্রহণ করার রীতি

কাউন্সেলিং পরিষেবার অপরিহার্য উপাদান হল গ্রহণ করা। কাউন্সেলি যেমনই হোক না কেন কাউন্সেলর তাকে সহজভাবে গ্রহণ করবে। এরূপ আচরণ না করলে ক্লায়েনটের আস্থা অর্জন করা খুবই কঠিন। এবং ক্লায়েনটের সঙ্গে অর্থবহভাবে আস্থা অর্জন করতে না পারলে প্রচেষ্টা সফল হবে এমন আশা কাউন্সেলর করতে পারে না। রোজার এই বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রহণ করার ব্যাপারটি শর্তবিহীন হবে। শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করার ব্যাপারটি কাম্য নয়।

(ঝ) আচরণে নমনীয়তা

ক্লায়েনটের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাউন্সেলর প্রয়োজন অনুসারে নমনীয় হবে। অনমনীয় মনোভাব কাউন্সেলিং পদ্ধতির সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করে। যেহেতু কাউন্সেলিং চিরকালের শিক্ষার বিষয় তাই কাউন্সেলর বিভিন্ন মতামত, ধারণা ও পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব দেখাবে। বস্তুতপক্ষে, একজন সফল কাউন্সেলর হতে হলে যুক্তিযুক্তভাবে নমনীয় থাকতে হবে।

উপরোল্লিখিত মৌলিক নীতিগুলি ছাড়াও বেশ কিছু বিষয় যেমন পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া, সম-অনুভূতি ও সমবেদনা, সামঞ্জস্য, অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৫ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র

আর্থ-সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহবধূ, চাকুরিজীবী, সামরিক কর্মী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, বেকার যুবক, বয়স্ক ব্যক্তি, একাকীত্বের শিকার এমন মানুষের কোন না কোন সময়ে কাউন্সেলিং পরিষেবার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও কাউন্সেলিং এর মূল ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ–

(ক) ফ্যামিলি কাউন্সেলিং

পরিবারের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব, ঝগড়াঝাটি, শারীরিক ও মানসিক পীড়ন – অত্যাচার, অবহেলা এবং সংশ্লিষ্ট মানসিক চাপ দেখা যায়, যা সুস্থ পারিবারিক জীবনের অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং দক্ষতা ছাড়াও কাউন্সেলরকে পরিবারের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়।

(খ) ম্যারিট্যাল্ কাউন্সেলিং

বিভিন্ন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পণ প্রথা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, জীবনধারা, বদ অভ্যাস, যৌন অতৃপ্তি, অর্থাভাব, কন্যাসন্তানের জন্ম, স্ত্রীর পিত্রালয়ের অত্যধিক নাক গলানো ইত্যাদি নানা কারণে সচরাচর স্বামী-স্ত্রী বিবাদ হয়ে থাকে। ম্যারিট্যাল্ কাউন্সেলিং বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরে হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গ্রুপ কাউন্সেলিং উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(গ) ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং

জীবিকানির্বাহের উপায় এবং জীবনের উন্নতির জন্য বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা, স্বাভাবিক ক্ষমতা, সমন্বয়, শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। আচরণের দিকটিও জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারভিউর সম্মুখীন হওয়ার জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উপরোল্লিখিত তিনটি ছাড়াও ভোকেশনাল কাউন্সেলিং, হেলথ্ কাউন্সেলিং, এডুকেশন্যাল, কাউন্সেলিং, মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সেলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

৮.৬ পদ্ধতি

কাউন্সেলিং এর জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে

(ক) ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতি বা রীতি কাউন্সেলর কেন্দ্রিক। এটি অথরিটেরিয়্যান্ এপ্রোচ নামেও পরিচিত। এখানে কাউন্সেলর মনে করে যে ক্লায়েনটের সমস্যা যে তার জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সমাধান করবে। অর্থাৎ, ক্লায়েনট অসহায় এবং কেবলমাত্র কাউন্সেলরই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি ইনটিলেকটিউয়্যাল্ প্রোসেস্ বলে ধরা যেতে পারে।

ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্ এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কাউন্সেলরের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানসূত্র অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নাও হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, প্রতিটি ক্লায়েনটের পটভূমি এবং সমস্যা ভিন্ন। সুতরাং কাউন্সেলর যদি কেবলমাত্র এই পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সমস্যা বাড়তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কাউন্সেলর একজন মানুষ মাত্র। সে কখনই দাবি করতে পারে না যে ক্লায়েনটের সব সমস্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছে। এবং তা হয়ে থাকলে কাউন্সেলিং প্রচেস্টার মাধ্যমে কাউন্সেলি খুব বেশি উপকৃত হবে না। তৃতীয়তঃ এই ডিরেকটিভ্ কাউন্সেলিং কাউন্সেলরের কাছে অনেক সময় বোঝা স্বরূপ। একদিকে কাউন্সেলিং এর জন্য তাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় অন্যদিকে যদি সমস্যা না কমে তবে সম্পূর্ণ দোষ, দায়িত্ব কাউন্সেলরকে নিতে হয়।

(খ) নন-ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতিতে কাউন্সেলর কাউন্সেলিকে সাহায্য করে যাতে সে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে। এখানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেখানে নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কাউন্সেলি সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। দক্ষ পরিষেবার দ্বারা কাউন্সেলর কাউন্সেলির আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যা সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক শর্ত।

এই পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, একজন হতাশাগ্রস্ত, দিশেহারা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলি সমসময় আশা করে যে কাউন্সেলর তার জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। কিন্তু এখানে কাউন্সেলর নিজে সমাধান না করে বিষয়টি কাউন্সেলির দিকে ঠেলে দেয় যা কাউন্সেলির মনে আবার হতাশা সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) ইলেকটিক্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতি খুবই নমনীয়। এখানে ক্লায়েনটের জন্য প্রযোজ্য যেকোন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। বিশেষ কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী নেই। কাউন্সেলর প্রয়োজন মতো ডিরেকটিভ্ বা নন-ডিরেকটিভ্ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাউন্সেলর যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পারে তবে তা খুব বেশি কার্যকরী হবে না। তবে বলা যায়, ইলেকটিক্ এপ্রোচ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বাস্তবোচিত এবং উপযুক্ত পদ্ধতি।

৮.৭ কৌশল

কাউন্সেলিং পরিষেবা মূলত এক এক জনকে স্বতন্ত্র্যভাবে দেওয়া হয়। এটি কাউন্সেলর ও কাউন্সেলির ব্যাপার। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রুপ কাউন্সেলিং করা হয়। যেহেতু গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করা তুলনামূলকভাবে কঠিন তাই কেবল দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের গ্রুপ কাউন্সেলিং করা উচিত। কাউন্সেলিং যা একটি পেশায় পরিণত হয়েছে তা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে–

(ক) কাউন্সেলর ও কাউন্সেলির মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে আলোচনা।

(খ) কাউন্সেলরের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দরকার যাতে সে সমস্যার উৎস অনুসন্ধান করতে পারে, গভীরতা অনুভব করতে পারে এবং উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কাউন্সেলিকে তার সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে।

(গ) কাউন্সেলিকে সক্ষম করা যাতে সে উপযুক্তভাবে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। যেহেতু, ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথ হল কাউন্সেলিং তাই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল অবলম্বন করা হয়–

(১) রিলেশান টেকনিক্

কাউন্সেলিং এমন একটি পরিষেবা যা ক্লাইয়েনটের আস্থা অর্জন ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না। এই সম্পর্ক ভাসাভাসা নয় এটি হার্দিক, সমবেদনাপূর্ণ এবং বোঝাপড়া সম্পন্ন হবে। হার্দিক সম্পর্ক নানাভাবে কাজে লাগে। প্রথমত কাউন্সেলি তার অনুভূতি, মতামত এবং আচরণে ইতস্তত বোধ করে না। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলর সমস্যার গভীরতা এবং তার কারণ অনুধাবন করতে পারে। যেহেতু, কাউন্সেলিং পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কাউন্সেলর এবং কাউন্সেলির সম্পর্ক তাই সম্পর্ক তৈরির জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। অন্যথায়, অনুভূতির বহির্প্রকাশ এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় যা কাউন্সেলিং এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা সম্ভবপর নয়। ফলে কাউন্সেলিং পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(২) ইন্টারভিউ টেকনিক্

কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাউন্সেলরকে ইন্টারভিউ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ক্লায়েনটের মন বুঝতে হলে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভালো কৌশল নেই। ডিরেকটিভ, নন-ডিরেকটিভ্

বা ইলেকটিক্ পদ্ধতি যাই অনুসরণ করা হোক না কেন, ইন্টারভিউ আবশ্যিক। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে সমস্যার কারণ সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়।

(৩) নন-টেস্ট্ ক্লায়েনট্ এপ্রাইজাল টেকনিক্

এখানে দিন পঞ্জী, জীবনপঞ্জী, রেটিং স্কেল, কোন বিশেষ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য সঞ্চিত তথ্য ব্যবহার করা হয়। দিনপঞ্জী এবং জীবন পঞ্জী হল অর্ন্তদর্শন সংক্রান্ত তথ্য। কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের প্রয়োজন কারণ এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পরিমাপ করার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য সঞ্চিত তথ্য ক্লায়েনটকে সুসংহতভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

(৪) সাইকোডায়্যাগ্নোসিস্

কাউন্সেলিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল সাইকোডায়্যাগ্নোসিস্। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউন্সেলিকে এবং তার সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে বোঝা। এই কথাটির অর্থ হল কাউন্সেলির প্রকাশিত লক্ষণ, উপসর্গ এবং বৈশিষ্ট্য শ্রেণিবিভাগ করে তার অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা। উইলিয়মসন্ যিনি বলেছিলেন উপসর্গ দেখে নির্ণয় হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সারমর্ম, তিনি রোগ নির্ণয়কে (ডায়্যাগনৌসিস) তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন। তা হল – ব্যক্তির ডায়্যাগনোসিস্ এবং কাউন্সেলির আরোগ্যলাভের আশা সংক্রান্ত ডায়্যাগনোসিস্।

ইগান্ কাউন্সেলিং শুরুর পাঁচটি প্রণালীর কথা বলেন। তাঁর প্রণালী এস.ও.এল.ই.আর. নামে পরিচিত। যা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে–

(S) এস. – স্কোয়্যারলি (Squarely) - ক্লায়েনটের ঠিক সামনাসামনি বসা এর অর্থ হল আমি তোমার জন্য প্রস্তুত।

(O) ও. - ওপেন পশ্চার (Open posture) - যার অর্থ কাউন্সেলিকে ইঙ্গিত দেওয়া যে কাউন্সেলর তার কথা খোলা মনে শুনবার জন্য আগ্রহী।

(L) এল. - লীন (Lean toward the client) - কাউন্সেলর কাউন্সেলির দিকে অল্প ঝুঁকে থাকবে অর্থাৎ সে ক্লায়েনটের সঙ্গে আছে এবং সে যা বলছে তা আগ্রহ সহকারে শুনছে।

(E) ই. - আই কন্ট্যাক্ট (Eye contact) - চোখে চোখ রাখা অর্থাৎ বোঝানো যে মনোযোগ ও আগ্রহ রয়েছে এবং ক্লায়েনট যেন অনুভব করে যে তাকে বুঝবার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(R) আর. - রিল্যাক্সড্ (Relaxed) - অপেক্ষাকৃত সহজ থাকা - এর ফলে কাউন্সেলর এবং কাউন্সেলি উভয়ে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, যদিও কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করা দরকার, তবু কাউন্সেলর যেন বেশি মাত্রায় কৌশল সম্বন্ধে সচেতন না হয়। দ্বিতীয়ত, কৌশলগুলি অন্ধের মতো যেন ব্যবহার না করা হয়। সেক্ষেত্রে কাউন্সেলরের ভূমিকা উপহাসযোগ্য হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট নীতি ও তত্ত্ব চাড়া কৌশল অর্থহীন। সুতরাং, কাউন্সেলর কৌশলকে যেন তার তত্ত্ব থেকে পৃথক না করে।

৮.৮ উপসংহার

এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষে কাউন্সেলিং পরিষেবা ব্যাপকভাবে শুরু হয় নি। বিষয়টি মূলত শহর কেন্দ্রিক আছে। সাধারণ মানুষেরা সচেতন নয় আবার সামাজিক সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে সক্রিয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবক, পিতামাতা, প্রশাসক ও শিক্ষক কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না এবং এই পরিষেবার জন্য সময় দেন না, চেষ্টাও করেন না। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকলের এই পরিষেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে যত্নবান হয় তবে নেশা, মাদকাশক্তি, নারী নির্যাতন, স্কুল-ছুট, অশিক্ষা, অনৈতিক ব্যবসা এবং আত্মহত্যার মতো সমস্যা অনেকটাই কমবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে

(ক) কাউন্সেলিং একটি স্বতন্ত্র্য পরিষেবা।

(খ) উপযুক্তভাবে বৃহত্তর এলাকায় এই পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(গ) বিদ্যালয়, কার্যালয় এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে এই পরিষেবা আবশ্যিক করা প্রয়োজন।

(ঘ) কাউন্সেলিং এর অনুকূলে কিছু পরিষেবা ও কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

(১) কাউন্সেলিং স্যুপারভিসন্ - এম. ক্যারোল্

(২) ডিভেল্যাপমেন্ট কাউন্সেলিং - ব্লোচার

(৩) ইনট্রোডাকশন্ টু কাউন্সেলিং - ই. এল. টুলবার্ট

(৪) টুওয়ার্ডস্ ইফেক্টিভ্ কাউন্সেলিং এন্ড্ সাইকোথেরাপী - ট্রুএক্স সিবি এবং কারখাফ

(৫) দ্য বেসিক্ ইসেনশিয়্যালস্ অব্ কাউন্সেলিং - আই. দেব

৮.১০ অনুশীলনী

(১) কাউন্সেলিং কী এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(২) কাউন্সেলিং এর মৌলিক নীতিগুলি আলোচনা করুন।

(৩) কাউন্সেলিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি (এপ্রোচ্) আলোচনা করুন।

(৪) কাউন্সেলিং পরিষেবার বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।